ক্রান্তদর্শী

চতুর্থ পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : প্রণবেশ মাইতি

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
রমা প্রিণ্টার্স
৬৩এ/৩, হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসু

স্মরণে

ভূমিকা

'ক্রান্তদর্শী' শেষ হলো। এ বই কিন্তু আমার পরিকল্পিত 'রিনিউয়াল' বা পুনর্নবায়ন নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী থীসিস লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমারোহ। তারা বলে, "আমরা কি তোমার হাতের পুতুল যে তোমার খুশিমতো নড়ব চড়ব নাচব? আমাদের খুশিমতো আমরা বাঁচব।" এমন অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। উপন্যাস একবার আরম্ভ করলে তার পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। চরিত্ররা মঞ্চে নেমে শেখানো কথা বলে না. এক বলতে গিয়ে আর বলে। এক করতে গিয়ে আর করে। আমার লেখনীও কি আমার বাধ্য? শিকলটা আমার হাতে তবু বিন্দি কুকুর আমাকেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেত, আমিই তার খেয়ালমতো চলতুম বা চালিত হতুম। এটাও সেইরকম একটা ব্যাপার।

তার পর, অন্তরে একজন আছেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলতেন 'কৌতুকময়ী' আর গ্যেটে বলতেন ডাইমন বা ডেমন, তিনিও আমার কলম ধরে আমাকে লেখান। আগেও এ রকম হয়েছে। উপন্যাস একজনের সৃষ্টি একথা যেমন ঠিক তেমনি একথাও ঠিক যে উপন্যাস একজনের সৃষ্টি নয়। আর এইখানেই তার বিশেষত্ব। 'নতুন করে বাঁচা' নামে আমি প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যে প্রবন্ধ লিখেছিলুম আমার পরিকল্পিত উপন্যাস সেই রচনার রূপান্তর হতো। এটাই ছিল আমার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। কিন্তু কার্যত তা হয়নি, কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ভাবনাচিন্তা নয়, অনেকগুলি মানুষের বহমান জীবনধারা। জীবন বলতে অন্তর্জীবনও বোঝায়। আমার এ উপন্যাসে অন্তর্জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। একে নভেল অভ্ আইডিয়াজ্ বললে আমি আপত্তি করব না। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস। তাঁর এতে অনাস্থা ছিল, অথচ তাঁর 'গোরা' সেই বর্গের নয় কি?

এই উপন্যাস আমার অন্য একটি বাসনার পরিপূরণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার আনুষঙ্গিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিয়ে একটা এপিক উপন্যাস লেখা যায়। 'ঘরে বাইরে'তেও এর অবতারণা লক্ষণীয়। কিন্তু নতুন যুগের মহাভারত লেখা আমার সাধ্য নয় বলেই সেটি আমি অন্যান্যদের উপর ছেড়ে দিই। অথচ একজনকেও সে কাজে হাত দিতে দেখা যায় না। ব্রিটিশ

শাসনকালে সেনসরের বা পুলিশের ভয়ে সে উপন্যাস লেখা যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও দেখা গেল যাঁরা লিখতে পারতেন তাঁদের আগ্রহ বা উদ্যম নেই। অবশেষে আমাকেই ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অঙ্ক তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের শেষ পরিণাম নিয়ে এপিক না হোক বৃহৎ উপন্যাসে হাত দিতে হলো। এর একটি গোপন কারণ ছিল। 'সত্যাসত্য' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হলে কেউ কেউ আমাকে আরো একখণ্ড লিখতে অনুরোধ করেন। একজন বলেন বাদলকে বাঁচিয়ে দিতে। আরেকজন বলেন উজ্জয়িনীকে আমি অপাত্রে সম্প্রদান না করে যেন সুপাত্রে সম্প্রদান করি. দে সরকারের হাতে না দিয়ে সুধীর হাতে দিই। কিন্তু বারো বছর ধরে ওই উপন্যাস লিখে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। সপ্তম খণ্ড লিখতে সাধ বা সাধ্য কোনোটাই আমার ছিল না। তা ছাড়া বাদলের মৃত্যুতেই ও কাহিনীর যথার্থ সমাপ্তি। সেটা একটা প্রতীকী ঘটনা। ঝড়ঝাপটার যুগে বুদ্ধিজীবীর অপসরণ।

আমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমার কাছে জীবন্ত মানুষ। 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সময় সুধী কি নিষ্ক্রিয় ছিল? না, সে বাদলের মতো বুদ্ধিজীবী নয়। তার পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তার কী ভূমিকা? আরো পরে গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের সময় তার কী অনুভূতি? সুধীর ভূমিকাকে ঘিরেই নতুন উপন্যাস দানা বাঁধে। বাদলকে আমি বাঁচিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারিনে। কোনান ডয়েল যেমন শার্লক হোমসকে বাঁচিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সুধীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপরতার বাইরে নয়। কিন্তু 'সত্যাসত্যে'র সুধী যেমনটি 'ক্রান্তদর্শীর সুধী তেমনটি হতে পারে না। হলে পদে পদে জবাবদিহির দায় থাকে। না, সুধীকে আমি স্মরণ করলেও নিজের মতো করে বাঁচবার ও বাড়বার স্বাধীনতা দিয়েছি। সেইজন্যে নাম পালটে দিয়ে 'সৌম্য' করেছি। সৌম্য সুধীই, তবু সুধী নয়। ঘটনার আবর্তে পড়ে সে তার স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পারেনি। সে বিনোবার মতো স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। সৌম্য সৌম্যই। সে সুধী নয়।

সৌম্যকে ফিরিয়ে আনলে উজ্জয়িনীকেও ফিরিয়ে আনতে হয়। সে এসেছে অদৃশ্য এক টানে। তাকে আমি দে সরকারের হাতে ছেড়ে দিলেও তাদের বিয়ে দিইনি। সে বিধবা হয়েছে, এই পর্যন্ত নিশ্চিত। এর পরবর্তীটা অনিশ্চিত। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে থাকতেও পারে, না করে থাকতেও

পারে। ওকে নিয়ে আসি মঞ্জুলিকা নামে। ডাক নাম জুলি। সৌম্য যদি অবিবাহিত থাকে তবে ওকেও তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। তা বলে ওদের রাজনৈতিক মতবাদ একই রকম হবে কেন? যার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেটাই তো হবে। ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদের এক দুর্বার আকর্ষণ ছিল। জুলির পক্ষে সৌম্যর মতো একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যতদিন না সে সৌম্যর পত্নী হয়।

উজ্জয়িনীকে নিয়ে এলে দে সরকারকেও নিয়ে আসতে হয়। সে আসে সুকুমার দত্তবিশ্বাস নামে। বার বার প্রত্যাখ্যাত হবার পর সে জুলির বান্ধবীকে বিয়ে করে ক্ষান্ত হয়। তবে সেইখানে তার ভূমিকা ফুরিয়ে যায় না। এই কাহিনীর শেষদিনটিপর্যন্ত সে আছে। আর আছে জুলির বান্ধবী মিলি, যার ভালো নাম মধুমালতী। তিনটি পুরনো চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই নতুন। মানস বাদল নয়, যদিও সৌম্যর পুরাতন বন্ধু। 'সত্যাসত্যে' তার উল্লেখ ছিল না। বর্তমান উপন্যাসে তারও একটি মুখ্য ভূমিকা। তারই মতো তার অপর বন্ধু স্বপনদারও। সৌম্য, মানস, স্বপন কোন্ জন যে এই কাহিনীর নায়ক তা আমিও জানিনে। অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্বপনদাকে তথা মানসকে। একটা কথা বলে রাখি, মানসের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি মানস নই বা মানস আমি নয়। তার যূথিকাও আমার স্ত্রী লীলা নয়।

অনেকগুলি চরিত্রই জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আস্তভাবে নয়। তারা যে যার নিজের মতো করে বেঁচেছে ও বেড়েছে। আমার শাসন মানেনি। নায়িকা যে কোন্ জন তাও আমি জানিনে। জুলি ও যূথিকার মতো দীপিকাদিও তিনজনের একজন। তিনটি পরিবারকেই এই উপন্যাসে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটিকে বিশেষ গুরুত্ব নয়। কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটনাস্থল কখনো কলকাতা, কখনো পূর্ববঙ্গ, কখনো পশ্চিমবঙ্গ। শেষে দিল্লী।

স্থান কাল পাত্র। এই তিন নিয়েই উপন্যাস। পাত্রের কথা বলেছি, স্থানের কথাও বললুম। এবার কালের কথা। এই কাহিনীর কালসীমা ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণে যার শুরু মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণে তার শেষ। 'সত্যাসত্যে'র কালসীমা ছিল মাত্র দুটি বছর, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯। তার জন্যে লিখতে

হলো ছয় খণ্ড। লাগল বারো বছর। সেই আন্দাজে এ গ্রন্থ লিখতে কত সময় লাগা সম্ভবপর, কয় খণ্ডে লেখা সমীচীন? অনেক বেশী। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার যৌবন বিগত হয়েছে, বার্ধক্য দিন দিন বেড়েছে। সময়মতো শেষ না করলে অসমাপ্ত গ্রন্থ পড়বেই বা কে? লিখব কি লিখব না করতে করতে পঁচাত্তর বছর বয়স পার হয়। আশির মধ্যে কি সব কথা বলে উঠতে পারব? আশি পর্যন্ত কি আমাকে বাঁচতে দেওয়া হবে? এক জ্যোতিষীর মতে চুয়াত্তর বছর বয়সেই আমার পরকাল।

কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই আরম্ভ করে দিই। শুনেছি তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শুরু করেন অতি বৃদ্ধ বয়সে। শেষ করতে নাকি সাত বছর লেগেছিল। মোটামুটি চার বছরের পাথেয় নিয়েই আমার যাত্রারম্ভ। লিখতে ও সংশোধন করতে লেগে গেল সাত বছর। সম্প্রতি বিরাশি পূর্ণ হয়েছে। অবাক হচ্ছি দেখে যে এখনো বেঁচে আছি। আমার মা বেঁচেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর, আমার বাবা একষট্টি বছর। আমার ধারণা ছিল আমিও তাঁদের অনুবর্তন করব। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। যে কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারত না সে কাজ আমাকে দিয়ে তিনি করাবেনই। অন্তরে আমি এই আশ্বাস পাই যে আমি যা জানি আর কেউ তা জানে না, সুতরাং আমাকেই জানিয়ে যেতে হবে ও তার জন্যে বাঁচতে হবে। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

তৃপ্ত হতুম যদি পাঁচ পর্বে লিখতে পারতুম। তেতাল্লিশের শেষ অংশ, চুয়াল্লিশের সবটা, পঁয়তাল্লিশের প্রথম অংশ ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে। প্রায় দু'বছর। ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম বেঁচে থাকতে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে তৃতীয় পর্ব লিখতে। কে জানে কেমন থাকি বলা তো যায় না। তাই মাঝখানে একটা ফাঁক রয়ে গেল। যাক, আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। ইতিহাস যাঁরা লিখবেন তাঁরা সে ফাঁক পূরণ করবেন। আমার এটা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা উপাখ্যান। যেমন ডিকেন্সের 'আ টেল অভ্ ট্ সিটিজ্'। যার পটভূমিকাটা ফরাসী বিপ্লবের। কাহিনীটা কিন্তু দুই মহানগরীর ইতিহাসে অখ্যাত কাল্পনিক নায়ক নায়িকার।

ডিকেন্স যখন স্থির করেন যে ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় একখানি উপন্যাস লিখবেন তখন তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কার্লাইলকে চিঠি লিখে

পরামর্শ চান কোন্ কোন্ বই পড়বেন। কার্লাইল তার উত্তরে এক গাড়ী বই পাঠিয়ে দেন। ফরাসী বিপ্লবের উপর লেখা বই ততদিনে এক গাড়ী ওজনের হয়েছে। এতদিনে তিন গাড়ী কি চার গাড়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ, ব্রিটিশ অপসরণ তথা ভারতবর্ষের বিভাজন একত্র করলে এটিও কি একটি বিপ্লবাত্মক বিষয় নয়? বিশ্বের ইতিহাসে সেই আট নয় বছরের মধ্যে যা ঘটে গেল তা ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে কি কম বিপ্লবাত্মক? এক গাড়ী না হোক, বেশ কিছু বই আমাকেও পড়তে হয়েছে। ডিকেন্স অবশ্য অত পড়েননি।

'ক্রান্তদর্শী' ইতিহাসভিত্তিক হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। রাজনীতি-নির্ভর হলেও রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। বলতে পারা যায় বিশ্লেষণধর্মী মানবিক স্টেটমেণ্ট। বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসের, ভারতের ইতিহাসের, বাংলার ইতিহাসের একটা যুগসন্ধিকে। সে রকম যুগসন্ধি আগেও আসেনি, পরেও আসবে না! ওই একবারই এল আর গেল। দেশ দেশান্তরে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেল! সমস্তটাকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা কি একপ্রকার বিনিউয়াল নয়? আমার পরিকল্পনামতো নয় যদিও। আমার মানসে ছিল টলস্টয় থোরো, রাস্কিন, গান্ধী প্রভৃতির ধ্যানের জগৎ, ধ্যানের দেশ। এঁদের কেউ স্বদেশে সিদ্ধিলাভ করেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধী। সেই গান্ধীকেও ঘটনাচক্রে আপাতব্যর্থ হতে হলো। দেশ আর প্রদেশ গেল ভেঙে। শুধু এই দিক দিয়ে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও গান্ধীপন্থীদের পক্ষে এটা একটা সেট-ব্যাক। তা সত্ত্বেও আমরা লাভ করলুম রাজন্যদের সম্মতিসহ নতুন এক রাষ্ট্র, যার শাসনতন্ত্র সেকুলার। একজন নাগরিক যদি নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী হয় তবু সেও উচ্চপদারূঢ় হতে পারে। এই যে পরিবর্তন এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না, যদি মুসলিম লীগ অখণ্ড ভারতের কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে বসত। তার সঙ্গে মিটমাট করতে গিয়ে ধর্ম অনুসারে চাকরি, ধর্ম অনুসারে প্রমোশন, ধর্ম অনুসারে নির্বাচন ইত্যাদি মেনে নিতে হতো। নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদীদের কোথাও স্থান হতো না। না পার্লামেণ্টে, না গভর্নমেণ্টে। সেকুলারিজমের জন্যে দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট না হলে, এক কোটি মানুষ ছিন্নমূল না হলে তার জন্যে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো না। ইউরোপেও প্রস্তুত হয় বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্মঘটিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে।

এক হিসাবে সেট-ব্যাক, আরেক হিসাবে ফরওয়ার্ড স্টেপ। পদ্মা এককুল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো যাঁরা লিখবেন তাঁরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তাঁরা এক গাড়ী কি দু'গাড়ী বই পড়ে লিখবেন। তাঁদের লেখা হবে অবজেকটিভ। যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য। নভেল লিখলে তার আদল হবে টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি'। কিন্তু তাঁরা আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শী হবেন না। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমি ভুগেছি, আমি শিখেছি, আমি যে আদৌ অংশ নিইনি তা নয়। এমন সুযোগ ও দুর্ভোগ আমার উত্তরসূরীদের হবে না। আমার মধ্যে প্যাশন প্রবল, আমার বিচার ডিস্‌প্যাশনেট নয়। আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেইসঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেইসঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক! আমার উপন্যাস সাবজেকটিভ। এর আড়ালে একটা দৃষ্টি আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে vision. তাই এর নাম 'ক্রান্তদর্শী'।

আরো একটি কথা। গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতাদের উক্তি এই গ্রন্থে কাল্পনিক। তবে তাঁদের চরিত্রবিরুদ্ধ নয়। সেই ধরনের বক্তব্য তাঁদের মুখে যদি কেউ কেউ শুনে থাকেন তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রদের একেবারে অনুপস্থিত রাখা যায় না। টলস্টয়ও কি নেপোলিয়নকে তাঁর 'সমর ও শান্তি'র মধ্যে উপস্থাপিত করেননি? নেপোলিয়নের উক্তিগুলিও কি সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক? কোনো অংশই কল্পিত নয়? উপন্যাসের অনুরোধে আমাকেও কিছু কিছু বানাতে হয়েছে। তা না হলে সেই সেই বিষয়কে বোধগম্য করা যেত না। যেখানে যেখানে পেরেছি সেখানে সেখানে লিপিবদ্ধ উক্তি উদ্ধার করেছি। যাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়। আরো বেশী করলে উপন্যাস হতো না, ইতিহাস হতো। ইতিহাস না লিখলেও কোথাও আমি ইতিহাসের অমর্যাদা করিনি। যথাসম্ভব ইতিহাসের অনুসরণ করেছি। ইতিহাসের সমূহ তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' গ্রন্থের কতকগুলি পৃষ্ঠা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যা কেউ পড়তে পারেনি তা আমি পড়ব কী করে?

আরো অনেক কথা বলার ছিল, আরো অনেক চরিত্রকে জানার ছিল। কিন্তু সে প্রলোভন সংবরণ করতে হলো। বহুদর্শী হলেও আমি আর্টের সীমা

মানি। এখন বিদায় নিতে হচ্ছে। সৌম্য, জুলি, মানস, যূথিকা, স্বপনদা, দীপিকাদি, সুকুমার, মধুমালতী, মীর সাহেব, বাবলী প্রভৃতিকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার কাছে ওরা জীবন্ত মানুষ ও আপনজন। বিদায়ের দুঃখে আমি কাতর। সাত বছর ধরে আমি ওদের নিয়ে ছিলুম। এখন সব শূন্য মনে হচ্ছে।

ডি. এম লাইব্রেরীর সঙ্গে আমার ছাপান্ন বছরের সম্পর্ক। শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার ও শ্রীআশিসগোপাল মজুমদারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। স্বর্গীয় গোপালদাস মজুমদারের কাছেও। তাঁরই আগ্রহে এই উপন্যাসের সূচনা। রূপা প্রেসের শ্রীতুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রণ ব্যাপারে আমাকে আগাগোড়া সাহায্য করেছেন। তাঁকে বহু ধন্যবাদ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ক্রান্তদর্শী

(চতুর্থ পর্ব

॥ এক ॥

স্বপনদা তাঁর শোবার ঘরের বেডল্যাম্পের আলোয় আঁদ্রে জীদের 'জুর্নাল' পাঠে তন্ময় ছিলেন। চমকে উঠে সুধান, "ও কে? তুমি?"

"না গো, আমি নই। বাঁশরি।" দীপিকাদি বিছানার একপাশে বসে হাসতে হাসতে উত্তর দেন।

"বাঁশরির ছেলেমেয়েরা বিভাসকে তাদের বাবা বলে। 'The children of Alice call Bartrum their father.' চার্লস ল্যামের 'ড্রীম চিলড্রেন' পড়েছ নিশ্চয়।" স্বপনদা মনে করিয়ে দেন।

দীপিকাদি তাঁর বালিশে মাথা রেখে বলেন, "পরকীয়ার ধ্যান করছ কেন? পাশেই তোমার পরকীয়া। স্ত্রীকে পরকীয়া ভেবে উল্লাস বোধ হয় না? মানছি আমার ঘাট হয়েছে। চার মাস অন্য ঘরে শুয়েছি তোমার উপর রাগ করে। মাই পুঅর নেগলেকটেড হাজব্যাণ্ড। আমি না করলে তোমাকে আদর করবে কে?"

"কিন্তু হঠাৎ এত অনুরাগ কেন, আর্যে? দাঙ্গাই বাধুক আর হাঙ্গামাই বাধুক আমি যা ছিলুম আমি তাই আছি। তোমার মতে প্রচ্ছন্ন ইংরেজ আর প্রচ্ছন্ন মুসলমান। আমার সঙ্গে শুলে তোমার পাপ হয়। তুমি ভারতের আর্য নারী। সীতা কি সাবিত্রী।" স্বপনদা বই মুড়ে রাখেন।

"এ অনুরাগ হঠাৎ নয়। রাতের পর রাত তোমার জন্যে জেগে রয়েছি। কখন তুমি আসবে আর আমার পাশে শোবে।" দীপিকাদি অভিমানভরে বলেন।

"এদিকে আমিও তো রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি। কখন ফিরবে আমার উর্বশী? কখন আসবে তার মেষ? মেষটি অবশ্য মাঝে মাঝে এসে ঘুরে যায়। কুঁই কুঁই করে সমবেদনা জানায়। অবোলা প্রাণী সব বোঝে। কই, তোমার মেষটি কোথায়?" স্বপনদা খোঁজ করেন।

এল্‌ফ ইতিমধ্যে কখন এক সময় এসে খাটের তলায় আসন করে নিয়েছে। ঘেউ ঘেউ করে জানান দেয় সে সব শুনছে।

"মানছি আমি বলেছি আমি তোমার সঙ্গে শোব না। কিন্তু এমন কথা কি বলেছি যে তুমি আমার সঙ্গে শোবে না? অনায়াসেই আমার ঘরে গিয়ে আমার বিছানায় শুতে পারতে। তুমি এমন কাপুরুষ কেন?" দীপিকাদি সুধান।

"পোর্শিয়ার সওয়াল। তুমি আইন পড়লে না কেন? আজকাল মহিলারাও তো উকীল ব্যারিস্টার হচ্ছেন।" স্বপনদা খোঁচান।

"বেশ তো। তোমাকে নিয়ে আমি লণ্ডনে যেতে রাজী। তোমার চিকিৎসা, আমার পড়া দুই একসঙ্গে চলবে।" দীপিকাদি সীরিয়াস।

"আমার চিকিৎসা? আমার রোগটা কী তা তুমি জানো না? এই যে ইংরেজরা, এদের সঙ্গে আমাদের সাত পুরুষের সম্পর্ক। এরা কি শুধুই মন্দ, ভালো একটুকুও নয়। এরা চলে যাচ্ছে, আমার কি একটুও ব্যথা বোধ হচ্ছে না? তেমনি, এই যে মুসলমানরা, এদের সঙ্গেও আমাদের চব্বিশ পুরুষের সম্পর্ক। এরাও কি কেবলি খারাপ, ভালো একটুকুও নয়? এরাও চলে যাবে মনে হচ্ছে। আমার কি একটুও বেদনা বোধ হবে না? বিয়োগান্ত নাটক দেখছি আমি। ঘটনার পর ঘটনা চলেছে লৌহশলাকার মতো অদৃশ্য এক চুম্বকের অভিমুখে। সেটা বোধহয় একটা মহা ট্র্যাজেডী। মহাভারতের মতো। না দেখলে আমি লিখব কেমন করে? আমি যে একজন লেখক।" স্বপনদা স্মরণ করিয়ে দেন।

"তুমি যে একজন লেখক তার প্রমাণ যা ছিল তামাদি হয়ে গেছে। নতুন লেখা কোথায়? কতরকম আকাশছোঁয়া পরিকল্পনা, কতরকম লম্বাচওড়া বুলি, কাজের বেলা কূর্মাবতার। চল, তোমাকে আমি বিলেত নিয়ে যাই। সেখানে হয়তো তোমার কর্মপ্রেরণা ফিরে পাবে। সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো তোমার ছোটগল্পের ইংরেজী তর্জমা। তুমি না করলে আমি করব। ইংরেজীতে একখানা বই বেরিয়ে গেলে হয়তো তোমার উৎসাহ বাড়বে। তার থেকে ফরাসীতেও হবে, জার্মানতেও হবে।" দীপিকাদি প্রেরণা দেন।

"রানু, তুমি এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও আমাকে চিনতে পারলে না। আমি একজন হিউমানিস্ট। হিউমানিজম আমার ফাণ্ডামেণ্টাল ফেথ। আমার সেই গভীরতম প্রত্যয়ে ধাক্কা লেগেছে। আক্ষরিকভাবেও শিরদাঁড়া বেয়ে তুষারস্রোত বয়ে গেছে। পর পর দু' দু'টো মহাযুদ্ধ দেখে আমার মনে হচ্ছে মানুষ আর হিউম্যান নয়, ইনহিউমান। তা না হলে জার্মানদের মতো অমন

সভ্য জাতি গ্যাস চেম্বারে পুরে ষাট লক্ষ ইহুদী বধ করত না। আর আমেরিকানদের মতো অমন প্রগতিশীল জাতি হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলে এক লক্ষ জাপানী হত্যা করত না। যারা বেঁচে গেল তারাও সারা জীবন অসুস্থ হয়ে জীবনের বোঝা বইবে। ভেবেছিলুম ভারত কখনো অমন ইনহিউমান হবে না। এখন দেখছি এ দেশ স্বাধীন না হতেই এই! স্বাধীন হলে কী না করবে! তিনদিনের দাঙ্গায় দেখা গেল ও শোনা গেল এদেশের হিন্দু মুসলমান কলকাতা মহানগরীর প্রকাশ্য রাস্তায় নিরীহ পথিকদের বিবস্ত্র করে পরীক্ষা করেছে কে হিন্দু কে মুসলমান। ভিন্নধর্মী হয়ে থাকলে বিনা অপরাধে পিটিয়ে বা কুপিয়ে মেরেছে ও তার পরে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে। ডোম আসতে সাহস পায়নি, শকুনেরা আসমান থেকে নেমে এসে ছিঁড়ে খেয়েছে। তাই সব নয়। লাটসাহেব জওয়ানদের পাঠিয়েছেন মাথাপিছু পাঁচ টাকা বকসিসের বিনিময়ে রাস্তা থেকে শবদেহ সরাতে। তারা বাইরে নিয়ে গিয়ে গণ কবর দিয়েছে বা গণ চিতায় চড়িয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়েছে। যারা গেল তাদের আত্মীয়রা জানতেই পেল না তারা চিরকালের মতো গেছে। তাদের ধর্মীয় আচারও পালন করা হলো না, হবেও না, কারণ তাদের আত্মীয়দের চোখে তারা জীবিত। আমি ধর্মপ্রাণ হিন্দু নই। তবু আমারও সংস্কারে ঘা লাগে। কাকে দোষ দেব? হিন্দু মুসলমান কেউ কম দোষী নয়। হিন্দু মুসলিম সিভিল ওয়ার বলতে কী বোঝায় তার নমুনা তো দেখলে। এটা যখন দেশব্যাপী হবে তখন কোথায় থাকবে হিন্দু মুসলমানের ধর্মের বড়াই! সব ঝুটা হ্যায়। দুটিই বর্বর সম্প্রদায়। একদিন মধ্যযুগের জার্মানদের মতো ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময় শকুনের কাজ মানুষে করবে।” স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

“ওঃ স্টপ ইট!” দীপিকাদি চেঁচিয়ে ওঠেন।

“মাফ করো, বৌ। তবু তো আসল কথাটা বলিনি।” স্বপনদা চুপ করেন।

“তা হলে বলেই ফেল যা বলতে চাও।” অনুমতি দেন দীপিকাদি।

“তুমি যেদিন বন্দুক ধরে ফায়ার করতে গেলে সেদিন আমার মেরুদণ্ড বেয়ে তুষারস্রোত বয়ে যায়। ভাবি, এ কী! আমরাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লুম নাকি! যে যুদ্ধের সূত্রপাত আজ হলো তার অবসান হবে কবে তা কি আমরা জানি? না জেনে যাত্রারম্ভ করব? কে বলতে পারে যুদ্ধের প্রয়োজনে কী অমানবিক

কাণ্ড হবে! মহাভারতের যুদ্ধ যদি সত্য হয়ে থাকে তাতে কী অমানবিকতা না হয়েছে! পাণ্ডবে আর কৌরবে পার্থক্য কী। মানুষে আর রাক্ষসে কী প্রভেদ! আর আমার নিরীহ বৌ সেও নরহত্যা করবে! যাদের মারবে বা জখম করবে তারা আমার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। একই রক্ত, একই মাংস।" স্বপনদার গলা ধরে আসে।

"এটা তুমি বানিয়ে বলছ।" দীপিকাদি বিশ্বাস করেন না।

"তুমি কি জান না যে আমার মাতুলবংশ মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের রইস? উচ্চ পদাধিকারী। আর পাঁচজন অভিজাত পুরুষের মতো তাঁদেরও জলসাঘর ছিল। সেখানে লখনউয়ের বা বেনারসের বাঈজীরা নাচতেন ও গাইতেন। সঙ্গীত সুধাপানের পরে সঙ্গসুধাপানও চলত। ফলে যাদের আবির্ভাব হতো তারা বাবুজীদের মুসলিম প্রজাদের অন্দরে লালিত পালিত হতো। বড়ো হলে পিতার দেওয়া জায়গির ভোগ করত। এটা ছিল ওপেন সীক্রেট। মুসলিম সমাজের লাভ। সংখ্যাবৃদ্ধি, সম্পত্তিবৃদ্ধি। হিন্দু সমাজের শুচিতা বজায়। সুতরাং স্বস্তি। শুচিতা বজায় থাকাটাই তো ধর্ম।" স্বপনদা কটাক্ষ করেন।

দীপিকাদি থ হয়ে যান। "তা হলে এই ব্যাপার! ভাগ্যিস্ আমি তোমার জ্ঞাতিভাইদের একজনকেও মারিনি। মারলে তো তুমি আমার মুখদর্শন করতে না। তা বলে কি আমি ওদের কলকাতা ছেড়ে দেব?"

"তা কখন বললুম? কলকাতা তোমার আমার ওদের সকলের। বাংলাদেশও তোমার আমার ওদের সকলের। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ্ আ লস্ট কজ, বাট বেঙ্গলী ইউনিটি ইজ নট। তবে ওরকম দাঙ্গা আরো কয়েকটা বাধলে সেটাও থাকবে না, বৌ। নিবারণ করো, নিবারণ করাই শ্রেয়। বাঙালীর আজ জীবন মরণ সমস্যা। সে যদি ভাগ হয়ে যায় তো মরবে। তিলে তিলে মরবে। স্লো ডেথ। টের পাবে না যে মরছে। হৃদয় হিংসায় বিদ্বেষে ভরপুর। সত্য কি নজরে পড়বে?" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

"কার্জনী আমলেও তো বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। কী এমন ক্ষতি হয়েছিল? আবার হলে কী এমন ক্ষতি হবে?" দীপিকাদি সুধান।

"সেবারকার বিভাজন দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে হয়নি। তাই সেবার লোকজন ঘরবাড়ী মন্দির মসজিদ জায়গাজমি গোরুমোষ ছেড়ে পালায়নি। এবার সম্পূর্ণ লক্ষ্মীছাড়া হবে। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণান্ত। মানুষকে এত ভয়!

যেন বাঘ সিংহ কি সাপ কুমীর। বাঙালীর নামে কত বড়ো কলঙ্ক! সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকারের সময় ফরাসীদের নামে যেমন হয়েছিল। হাজার হাজার প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকদের হাতে নিহত হয়। যারা বাঁচে তারা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পালায়। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ ফ্রান্সের রাজমাতা ক্যাথারিন দ্য মেদিসিকে লেখেন, দিদি, তুমি তোমার প্রটেস্টাণ্টদের মারলে কেন, খেদালে কেন? ক্যাথারিন লেখেন, বোন, তোর মনে যদি এত লেগে থাকে তুইও তোর ক্যাথলিকদের মেরে খেদিয়ে দে না? তাই হয়। ফ্রান্স হয় প্রটেস্টাণ্টবর্জিত, ইংলণ্ড হয় ক্যাথলিকবর্জিত। তেমনি, পূর্ববঙ্গও হিন্দুবর্জিত আর পশ্চিমবঙ্গও মুসলিমবর্জিত হবে।" স্বপনদার আশঙ্কা।

"দাঙ্গাহাঙ্গামা যারা শুরু করেছে তারা জেনেশুনেই করেছে যে এর ফল হবে ভারতভাগ। যেটা জানে না সেটা হচ্ছে প্রদেশভাগ। তারা তোমার জ্ঞাতি হলে সেকথা স্বীকার করত। তারা বলে হিন্দুরা স্বজাতি নয়, ভিন্ন জাতি। তাদের স্বজাতি আরব, ইরানী, আফগান, তুর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন নেশন। সেইরকম তারাও একটি নেশন। তাদের পাকিস্তানের সামিল হবে সারা বাংলা মায় কলকাতা। কলকাতার দাঙ্গা হচ্ছে ব্যাটল ফর ক্যালকাটা। সে ব্যাটল মুসলিম লীগ জেতেনি। কাজেই আরেক দফা লড়বে। সতর্ক থাকতে হবে। আমি তো একটা স্টেন গান কিনব ভাবছিলুম। কিন্তু তোমার শিরদাঁড়া দিয়ে আবার তুষারস্রোত বইবে সেটা কি আমি সইতে পারব? তার চেয়ে বিলেত চলে যাওয়াই শ্রেয়।" দীপিকাদি আবার সেই কথা পাড়েন।

"স্টেন গান নিয়ে লড়বার জন্যে বিস্তর লোক রয়েছে। তোমাকে লড়তে হবে না। লড়াইতে তুমি যদি দশটা মারো ওরা একটাও তো মারবে। সেই একটা যদি তুমি হও তো আমি আর বাঁচব না, বৌ। তুমি আমার সাত রাজার ধন মানিক। তোমাকে হারালে আমি ফতুর হয়ে যাব। তুমি কি আমার দিকে একবারও ফিরে তাকাবে না, মানিক?" স্বপনদা বিহ্বল হয়ে বলেন।

দীপিকাদি তাঁর দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে তাঁর মুখে চোখে ঘন ঘন চুম্বন করেন। "আর তুমি আমার কী? আমার জীবনসর্বস্ব। তুমি যদি যাও আমি কি থাকব মনে করেছ? কিন্তু তোমাকে আমি যেতে দেব কেন? সাবিত্রীর মতো ফিরিয়ে আনব। তুমি যা চেয়েছ তা পাবে। কিন্তু আমার যা ভয় করে! যদি প্রসবযন্ত্রণায় মরে যাই?" দীপিকাদি থর থর করে কাঁপেন।

"আজকাল চিকিৎসার অশেষ উন্নতি হয়েছে। কোনো ভয় নেই। তুমিও বাঁচবে, যে আসবে সেও বাঁচবে।" স্বপনদা আশ্বাস দেন।

"তোমার কী! তুমি পুরুষমানুষ। তুমি আবার বিয়ে করবে। আমাকে মনে রাখবে তো?" দীপিকাদি তাঁর বুকে মাথা গোঁজেন।

"তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তোমার মতো আর কেউ নয়। উর্বশী, আমার উর্বশী! তুমি যেয়ো না, তোমার পুরূরবাকে ছেড়ে স্বর্গে যেয়ো না। বলে যেয়ো না, স্বর্গে আবার দেখা হবে। উর্বশী পুরূরবা উপাখ্যান আমার কাছে এমন করুণ লাগে! বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।" স্বপনদার কান্না পায়।

দীপিকাদিও কাঁদেন। "তোমার জন্যে নয় তো কার জন্যে আমি বেদেনীর মতো ঘুরছি। এখানে সেখানে ওখানে তাঁবু গাড়ছি। বালীগঞ্জ পার্কের নিজের বাড়ী ছেড়ে হিন্দুস্থান পার্কে তালুকদারদের বাড়ী, সেখানে একমাস থেকে অশ্বিনী দত্ত রোডে বর্মণদের বাড়ী, সেখানে একমাস থেকে ল্যান্সডাউন রোডে ভাড়াটে ফ্ল্যাট। এখানেও প্রায় দু'মাস কাটল। কে জানে আরো ক'মাস কাটবে। আবার দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকতে আপাতত বালীগঞ্জে আর নয়। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।" দীপিকাদি চোখ মুছে বলেন।

"কোনো রকমে কেন? ভালো রকমে। উর্বশী আমার বক্ষে। মেঘও আমার কক্ষে। শুধু আলোটা নেবানো হয়নি। এই যা।" তিনি বেড ল্যাম্পের সুইচে হাত দিতে যান।

দীপিকাদি তাঁর হাত চেপে ধরেন। "আলোটা থাক। আমি তোমার মুখ দেখব। তুমি আমার মুখ দেখবে।"

পরের দিন মীর সাহেবের আগমন। স্বপনদা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বলেন, "আইয়ে হুজরত, তশরিফ লাইয়ে।"

"ও কী, গুপ্তসাহেব, আপনি কবে থেকে মুসলমান হলেন?" মীর সাহেব বিস্মিত।

"মুসলমান কেন বলচেন, পারসিয়ান। ইরানিয়ান। আমার মাতৃকুলের কালচার পারসিয়ান। আমার পিতৃকুলের ইউরোপীয়ান। দুটোই আমার হেরিটেজ। অবশ্য মূলত আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলের গুপ্ত। আপনাদের আসার আগে অবধি আমরা বৌদ্ধ ছিলুম। আমাদের সংস্কৃতি ছিল ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি। যার নাম পরে হয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি। আমরা ইসলাম গ্রহণ

করিনি কিন্তু পারসিয়ান কালচার বরণ করেছি। ফারসী শিখেছি, তার দৌলতে বড়ো বড়ো পদ পেয়েছি, জমিদার বা তালুকদার বনেছি। আনুষঙ্গিক উপসর্গও এসে জুটেছে। সোজা রাস্তায় না হলেও বাঁকা রাস্তায় আপনাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধনও স্থাপিত হয়েছে। পরে আপনাদের আমল গেছে, ব্রিটিশ আমল এসেছে। আমরা ইংরেজী শিখেছি, তার কল্যাণে বড়ো বড়ো পদ পেয়েছি। উকীল ব্যারিস্টার হয়েছি। সেই সূত্রে ইউরোপীয় কালচার আয়ত্ত করেছি। ইংলণ্ডে আমেরিকায় গেছি। আধুনিক হয়েছি। আমাদেরই প্রবর্তনায় এদেশে রেনেসাঁস হয়েছে। রেফরমেশন হয়েছে। হতে পারত এর পরে একদিন ফরাসীবিপ্লব। মাটি করেছেন কায়দে আজম জিন্না। যারা বিপ্লব ঘটাতে পারত তারা ঘটাচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ। চারশো বছর আগেকার ফ্রান্সের ইতিহাসের সেই সেণ্ট বারথোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। যা ষোলই আগস্ট দেখলুম। সেই সময় থেকেই আমি অসুস্থ। হাত পা সমানে কাঁপছে। কাঁপতেই থাকবে যতদিন গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, মীর সাহেব।” স্বপনদা একনিঃশ্বাসে বলে যান।

“আঁতে ঘা তো আমারও লেগেছিল, গুপ্ত সাহেব। আমি কিন্তু দু'দিনের মধ্যে সামলে নিই। আমি আপনার মতো হিউমানিস্ট নই। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম। সবকো সন্মতি দে, ভগবান। অন্যায়কে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণা করিনে, ভালোবাসি। সেটা তারা জানে ও বোঝে। যেদিন আপনি আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে এলেন সেদিন একদল লীগওয়ালা মুসলমান আমার বাড়ী চড়াও হয়। তেমনি মাঝ রাত্রে। উর্দুতে বলে, আপনার এখানে হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছেন কেন? ওরা সবাই দুশমন। ওদের সবাইকে পাড়াছাড়া করতে হবে। নইলে ইসলাম বিপন্ন। পাড়াটাকেই আমরা পাকিস্তান বানাতে চাই। আপনি ওদের আমাদের হাতে সঁপে দিন। আমরা ওদের শিয়ালদার কাছে রেখে আসব। আমি তো হাঁ। বন্দুক আমারও ছিল। আমিও দেখাতে পারতুন। কিন্তু তা হলে মস্ত বড়ো ভুল হতো। হিন্দুদের আমি বাঁচাতে পারতুম না। নিজেও সপরিবারে খুন হতুম। ওরা আধ ঘণ্টার মধ্যে হাতিয়ার নিয়ে ফিরে আসত। অত কম সময়ের মধ্যে পুলিশকে টেলিফোনে খবর দিয়ে আনিয়ে নিতে পারা যেত না। পুলিশ তো টেলিফোনেও সাড়া দিত না।” মীর সাহেব বিবৃত করেন।

"তার পর?" দীপিকাদি কৌতূহল চাপতে পারেন না।

"বিপদের সময় সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা। জানেন তো ইংরেজদের উপদেশ, কীপ ইয়োর হেড কুল অ্যাণ্ড ইরোর হার্ট ওয়ার্ম। তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, তোমার হৃদয় উষ্ণ। আমি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলি, হাদিসে আমাদের প্রিয় রসুল কী বলেছেন? দুশমন যদি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করে তবে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে। এই হিন্দুরা তোমাদেরই পুরনো পড়শী। এরা দুশমনি করেছে বলে তোমরা আমাকে আগে কথনো জানাওনি। আজকের রাতটা তোমরা এদের এখানে মাথা গুঁজতে দাও। কাল ভোরে এরা আপনি চলে যাবে। না গেলে তোমরা ধরে নিয়ে যেয়ো। ওরা বলে, আমরা বরং সাপকে বিশ্বাস করব, তবু হিন্দুকে বিশ্বাস করব না। ওরা উত্তর কলকাতা থেকে মুসলমানদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে অপমান করবে। আমি বলি, ওঃ তাই তোমরা এদের দক্ষিণ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শোধবোধ করবে? কিন্তু দেশ ভাগাভাগির সময় যদি প্রদেশ ভাগাভাগি হয় আর কলকাতা পড়ে ওদের ভাগে তা হলে তোমাদেরও তামাম কলকত্তা থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হবে, মিঞা ভাইগণ। ওরা সুধায়, প্রদেশ ভাগ কেন হবে? এ প্রদেশে মুসলমানদের তো সংখ্যা বেশী। আমি বলি সেকথা ঠিক। কিন্তু ইংরেজরা এখন কংগ্রেসের মিতা, লীগের মিতা নয়। সেই জন্যেই তো জিন্না সাহেব বিদ্রোহ করেছেন। ইংরেজ আর কংগ্রেস দুই মিতা মিলে যা স্থির করবে তাই তো হবে। হিন্দু মুসলমান যদি দুই নেশন হয়ে থাকে তবে একই প্রদেশে থাকবে কী করে? একই শহরেই বা থাকবে কী করে? হিন্দুদের তোমরা সারে বঙ্গাল থেকে খেদাবে আর ওরা সারে বঙ্গাল তোমাদের ভাগে তুলে দেবে? ইংরেজরাই বা ওদের চটাবে কেন? দেখছ না আটটা প্রদেশে এখন কংগ্রেস সরকার? কেন্দ্রেও আর একটা কংগ্রেস-প্রধান সরকার হবে। তাদের হাতেই ফৌজ। তাদের পছন্দসই সদস্যদের হাতে। তোমরা যদি এদের রাখ এরাও তোমাদের রাখবে। এদের তাড়ালে এরাও তাড়াবে। এদের মারলে এরাও মারবে।" মীর সাহেব সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

"তার পর?" দীপিকাদি সুধান।

"তার পর আর কী? ওষুধ ধরে। ওরা ফিরে যায়। পরের দিন হিন্দুরা উত্তর মুখে রওনা হয়ে যায়। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দাঙ্গাহাঙ্গামা

থেমে যাবার পর একটা কমিটি গঠন করি। আমাদের কাজ হয় পলাতকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে স্বস্থানে পুনর্বাসন করা। হিন্দু ফিরবে হিন্দুর বাড়ী, মুসলমান ফিরবে মুসলমানের বাড়ী। একই পাড়ায় আগের মতো শান্তিতে বসবাস করবে। একটা পাড়া হিন্দুস্থান, আর একটা পাড়া পাকিস্তান এরকম ভেদবুদ্ধি থাকবে না। মাঝখানে ভেদরেখাও থাকবে না। কিন্তু ভাবা যত সহজ করা তত সহজ নয়। কেউ বিশ্বাস করে না যে এ সরকার আবার দাঙ্গা বাধতে দেবে না। এদের পলিসিই যখন ডাইরেক্ট অ্যাকশন। যার অন্য অর্থ হিন্দুবিরোধী সংগ্রাম। যার স্লোগান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়কে নেওয়া মানে খুন জখম, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ। ইংরেজ থাকতে এসব অপরাধ করা চলতে পারে কখনো? শহীদকে ডেকে বারোজ বলেছেন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে। তা যদি না করেন, যদি ফের দাঙ্গা বাধতে দেন, তা হলে গভর্নরস রুল। লীগ সরকারের পতন। শহীদ নিজেই বুঝতে পারেন যে বর্ণ হিন্দুরা যে সরকারে নেই সে সরকার বাংলাদেশে অচল। তারাই এ প্রদেশের সব চেয়ে প্রভাবশালী অংশ। তারাও ডাইরেক্ট অ্যাকশন চালাতে পারে। তবে তাদের দাবী সারা বাংলা নয়, তার জন্যে তারা লড়বে না। লড়লে লড়বে কলকাতার জন্যে, পশ্চিমবঙ্গের জন্যে। তাদের খুঁচিয়ে কার কী লাভ? শহীদ যান জিন্না সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের অনুমতি চাইতে। জিন্না অনুমতি দেন না। দিলে অন্যান্য প্রদেশের লীগপন্থীরাও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের অনুমতি চাইবে। তাদেরও অনুমতি দিতে হবে। সবাইকে অনুমতি দিতে হবে। সবাইকে অনুমতি দিলে পাকিস্তানের জন্যে লড়বে কে? তিনি স্বয়ং ইন্টারিম গভর্নমেণ্টে যাননি, কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতেও যাবেন না, আর কাউকেও যেতে দেবেন না। ইন্টারিম গভর্নমেণ্টে যাঁদের যেতে দিয়েছেন তাঁদের উপর বরাত ভিতর থেকে লড়াই করা। শহীদ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তাঁর উপদলের কয়েকজন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের প্রস্তাব তোলেন। মহাত্মা বলেন তিনি কোয়ালিশন সরকারে বিশ্বাসই করেন না। সরকার যাঁরা চালাবেন তাঁরা একক দায়িত্বেই চালাবেন। তবে কংগ্রেসের পলিসি তা নয়। কংগ্রেস যেখানে ভালো মনে করে কোয়ালিশন সরকারে অংশ নেবে। তবে অংশীদারদের প্রোগ্রাম এক হওয়া চাই।" মীর সাহেব ব্যাখ্যা করেন।

"তা হলে পার্টনারশিপের কোন আশা নেই? পার্টিশনের কথা ভাবতে হবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিবেকের বিরুদ্ধে?" স্বপনদার জিজ্ঞাসা।

"না, আরো একটা বিকল্প আছে, গুপ্ত সাহেব। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বঙ্গ। শরৎ বোস ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন। শহীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। জামান বলে এক ছোকরা ব্যারিস্টার দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ করছে। জামান তো বলছে আশা আছে। হয়তো যথাকালে দেখতে পাব বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান একমত হয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বঙ্গ চাইবে ও পাবে। তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। দাঙ্গাহাঙ্গামা একেবারে বন্ধ করতে হবে। যার হাতে যে অস্ত্র আছে সে অস্ত্র সে ত্যাগ করবে। অন্যায়কে ঘৃণা করতে পারে, অন্যায়কারীকে ঘৃণা করবে না। আর বদলা নয়, আর শোধবোধ নয়। এখন থেকে মিলে মিশে কাজ করা। ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।" মীর সাহেব সকলের হয়ে মাফ চান।

দীপিকাদি ইতিমধ্যে খাবার তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। সামনে রেখে বলেন, "আপনার দৌলতখানার এলাহি বন্দোবস্ত নয়। আমাদের গরিবখানার দীন আয়োজন।"

"কী যে বলেন, দিদি! গুপ্তর গুপ্তধন কত তা কি কারো জানতে বাকী আছে? টুকটুক আসবে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে। সে এখন আমার কমিটির একজন উৎসাহী সভ্য। সে যা করেছে তা আর কেউ করতে পারত না। অবশ্য উপস্থিত মহিলাটিকে বাদ দিয়ে।" মীর সাহেব আহারে মন দেন।

"কী করেছে ও মেয়ে? আবার বিয়ে? এবার কাকে? জাপানী বৌদ্ধকে? না পার্সীকে?" দীপিকা এর চেয়ে বেশী কল্পনা করতে পারেন না।

"পলায়নকালে তিনটি মুসলিম কন্যা ও সাতটি হিন্দু কন্যা নিখোঁজ হয়। গুরুজন সন্ধান পান না, পুলিশ সন্ধান পায় না। টুকটুক তাদের সন্ধান পায়। একদিন দেখি ও কোথা থেকে তিনটি মুসলিম কন্যাকে এনে হাজির করেছে। কেউ একটি কথাও ফাঁস করে না। টুকটুককে আড়ালে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করি। কোথায় ওরা ছিল? কেমন করে উদ্ধার করলে? ও বলে, আস্ক নো কোয়েশ্চেনস। অ্যাণ্ড ইউ উইল বি টোল্ড নো

লাইজ। অদ্ভুত মেয়ে। তার পরে সাতটি হিন্দু কন্যাকেও উদ্ধার করে আনে। কেউ কোনো কথা ফাঁস করে না। প্রশ্ন করলে সেই একই উত্তর। তার পর তাদের গুরুজনদের খবর দেওয়া হয়। তাঁরা আসেন। হিন্দু পিতারা ও হিন্দু স্বামীরা সাফ শুনিয়ে দেন, ওদের ডাক্তারি পরীক্ষা না করে ঘরে তুলব না। মেয়েরা ডাক্তারি পরীক্ষায় নারাজ। বলে, যেখান থেকে নিয়ে এলেন সেখানে ফিরিয়ে দিন। আমাদের মুখ চুপ। টুকটাক ওদের গুরুজনদের গলাধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।" মীর সাহেব হাসেন।

"তারপর মুসলিম কন্যাদের কী হলো?" দীপিকা জানতে চায়।

"ওদের গুরুজনেরা ডাক্তারির কথা বলেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সুধান, আপনি কি ঠিক জানেন যে এরা পোয়াতী নয়? আমি উত্তর দিই, সেটা এত কম সময়ের মধ্যে মালুম হবে না। তখন তাঁরা বলেন, আমরা মাস দুই বাদে আবার আসব। টুকটুক তাঁদের মুখের উপর শাসিয়ে দেয়, আপনাদের ফের আসতে দেওয়া হবে না। আপনারা মনঃস্থির করুন। বিবিদের যদি না নেন তবে তালাকনামা লিখে দিন। আমরা ওদের দোসরা জায়গায় নিকা দেব। ওঁরাও অনড়, টুকটুকও অনড়। এ এক দুরূহ সমস্যা। কমিটি এই অবস্থায় ওই দশটি মেয়ের দায়িত্ব নিতে রাজী নন। তাঁরা হাত ধুয়ে ফেলেছেন। সব ক'টির দায়িত্ব এখন টুকটুক একাই নিয়েছে। ও একটা হোম খুলেছে। আমরা হলে বলতুম 'রেসকিউ হোম'। টুকটুক বলে, না, সেটা অপমানকর। আমি নাম রেখেছি 'হস্‌পিস্‌'। যেমন খ্রীস্টানদের হয়। ওরা অতিথি। তফাতের মধ্যে এই খরচটা টুকটুক আর ওর বন্ধুরা বহন করেন। কিন্তু ডিসিপ্লিন পুরোপুরি টুকটুকের হাতে। কড়া ডিসিপ্লিন। মেয়েরাও ওকে খুব মানে। ও গোড়া থেকেই জানিয়ে রেখেছে যে ওর চোখে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়। কারো জন্যে হিন্দু পানি বা মুসলমান পানি জোগানো হবে না। খানাপিনা একই ছাঁদের হবে। একই সঙ্গে রান্না হবে। সবাই হাত লাগাবে। সবাই পরিবেশন করবে। কোনো বাছবিচার করবে না। যার ইচ্ছে সে নামাজ পড়তে পারে, পূজোআর্চা করতে পারে। তার জন্যে সময়ও নির্দিষ্ট, স্থানও নির্দিষ্ট। সঙ্গীতের জন্যেও অন্য সময়। গোমাংস বা শূকরমাংস হস্‌পিসে ঢুকবে না। ও ছাড়া মাছমাংসের ব্যবস্থা হবে। যার রুচি সে খাবে। সাধারণত নিরামিষই হবে। হোম একদিন দেখে আসুন না। কিছু দিয়েও আসুন। নাম গোপন থাকবে। আমি সপ্তাহে একদিন

যাই। ফী বার কিছু দিয়ে আসি। টুকটুক বলছে এই হোম ততদিন চালাব যতদিন একটিও মেয়ে সেখানে থাকবে। ওদের প্রত্যেককে ও তালিম দিয়ে ওয়ার্কিং উওম্যান তৈরি করবে। তখন এটাই হবে ওদের হস্টেল। তবে ওর বিশ্বাস ওদের কারো কারো বিয়ে হয়ে যাবে। ভাবনা কেবল বাচ্চাদের নিয়ে। যদি হয়। বলা যায় না। আপনারা কী বলেন?"

দীপিকাদি স্বপনদার দিকে তাকান। স্বপনদা ছাদের দিকে। মীর সাহেব বলেন, "সবই টাকার খেলা। পণ দিন, যৌতুক দিন, বিয়ে হয়ে যাবে।"

॥ দুই ॥

এবার স্বপনদা মুখ খোলেন। "হস্‌পিস? হুঁ। হস্‌পিসের ভিতর একটা হস্‌পিটালিটির ভাব আছে বটে। সেইজন্যে আমি হোটেলে না উঠে পারতপক্ষে হস্‌পিসেই উঠতুম। অবশ্য যেখানে যেখানে হস্‌পিস্ ছিল সেখানে সেখানে। তাতে খরচও বাঁচত। কিন্তু তার জন্যে চাই নিবেদিত কর্মী। সাধারণত ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী। টুকটুক তো ক্যাথলিকও নয়, সন্ন্যাসিনীও নয়। ওর না ভারতনাট্যম্ শিখতে রুক্মিণী দেবী অ্যারাণ্ডেলের ওখানে যাবার কথা? ওর কি ক্ষণে ক্ষণে মত বদলায়? আজ যাকে বিয়ে করে কাল তাকে ছাড়ে। কাল যাকে বিয়ে করে পরশু তাকে ছাড়ে। ভাগ্যিস্ আমি ওকে বিয়ে করিনি। দু'বছরের মধ্যে ওর মন উঠে যেত। তখন আমাকে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করত। দেখবেন, ওই হস্‌পিসও বছর খানেক পরে ছাড়বে।"

মীর সাহেব টুকটুকের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেন। "গুপ্ত সাহেব, ওর মা তো বলেন, স্বপনের জন্যেই আজ ওর এ হাল। যেন নোঙর ছেঁড়া নৌকো। কিন্তু সেকথা যাক। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে টুকটুক মাদ্রাজের টিকিট কেটে বার্থ রিজার্ভ করে কলকাতা ছাড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় বেধে যায় যোলই আগস্টের দাঙ্গা। নিজের বাপ মাকে আর আপনাদের দু'জনকে নিয়ে ও টালিগঞ্জে আর হিন্দুস্থান পার্কে রেখে আসে! কিন্তু সানি পার্কের বাড়ী ছাড়ে না। কী দারুণ সাহস ও মেয়ের! আমাকে বলে, আপনাদেরও যদি কোথাও পৌছে দিতে হয় তো আদেশ করুন। আমি আশ্চর্য হয়ে বলি,

আমাদের পাড়াটা তো মুসলমানদের পাড়া। আমাদের আবার কী বিপদ হতে পারে? তা ছাড়া আমাদের লীগপন্থী ভাইদেরই তো সরকার। সেই রাত্রেই গরিবখানার উপর হামলা। পরে আমি যখন কমিটি গঠন করি তখন ওকে বলি, তোমার মতো একজনকে কমিটির চাই যে হিন্দু হয়েও মুসলমানের আত্মীয় আর খ্রীস্টানদের মতো নিরপেক্ষ। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন। তোমার কি মাদ্রাজ না গেলেই নয়? ওদিকে ওর মা বাবাও বাড়ী ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চেম্বার তো সানি পার্কে, লাইব্রেরিও তো সেখানে। টালিগঞ্জে বসে কাকে কী আইনের পরামর্শ দেবেন? মক্কেলরাও কেউ ততদূর যেতে রাজী নয়। আমাকে বলেন, লতিফ, আই মাস্ট আর্ন মাই ডেলী ব্রেড বাই দ্য সোয়েট অভ্ মাই ব্রাউ। আমি ফিরে যাচ্ছি, শহীদকে বোলো আমার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করতে। বাড়ীতেই জায়গা দেব। খোরাকীও জোগাব। আমি বলি পাহারা ইতিমধ্যেই বসেছে। টুকটুক কি আমার মেয়ে নয়? আমি কি ওর জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করিনি? একলা মেয়েমানুষ বলে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে ওর সঙ্গিনী নিযুক্ত করেছি। কমিটি দিচ্ছে তার মাসোহারা। খানা আসছে আপনাদের বাবুর্চিখানা থেকে। আপনারা ফিরে গেলে ওকে রাখতেও পারেন, তাতে কমিটির কিছু সুরাহা হয়। এমনি করে ও মেয়ে জড়িয়ে পড়েছে সমাজসেবায়। আমরা ওর কাজ দেখে মুগ্ধ। ও কিন্তু আমাদের এক পয়সাও নেবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে। বলে, এটাও ওর একটা অ্যাডভেঞ্চার। বলা বাহুল্য ওর মা বাবা বাড়ী ফিরে গেছেন। ওর সঙ্গিনীটিও থেকে গেছে। পাহারা আর লাগছে না।"

স্বপনদা শুনে সুখী হন না! বলেন, "অ্যাডভেঞ্চার! ওর কাছে সবকিছু অ্যাডভেঞ্চার! বাপ রে, কী ডানপিটে মেয়ে! আমার জীবনটাকে তছনছ করেছিল আর কী। ওকে নিয়ে নভেল লেখা যায়, নাটক লেখা যায়, কিন্তু ঘর করা যায় না, মীর সাহেব। ঘর করতে হলে করতে হয় এই দীপিকার সঙ্গে। বলতে গেলে এই বীরাঙ্গনাই সে রাত্রে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। বন্দুকটা তো এঁর ব্যবহারের জন্যে কেনা হয়নি, হয়েছিল রামদীন বেহারার ব্যবহারের জন্যে। রামদীন ব্যবহার করত ঠিক, কিন্তু ফায়ার করে আমার হার্ট ফেল করিয়ে ছাড়ত। তার পর বন্দুকটা কেনা হয়েছিল চোর ডাকাতকে ভয় দেখানোর জন্যে। প্রতিবেশী মুসলমানকে নয়। কী যে হলো এদেশের! প্রতিবেশী

প্রতিবেশীর বাড়ীতে এসে হামলা করে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে গুলী করবে বলে বন্দুক ধরে। গৃহযুদ্ধ একদিন না একদিন বাধবে, এটা আমার জানা ছিল, কিন্তু সেটা তো হতো সৈনিকে সৈনিকে। এ যা হলো তা মোটামুটি মিলে যাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্সের সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকারের সঙ্গে। পুরোপুরি বলছিনে, কারণ ওটা ছিল একতরফা আর এটা হচ্ছে দোতরফা। ফলাফল একইরকম হবে। হিন্দুরা পালাবে মুসলিম এলাকা থেকে, মুসলমানরা পালাবে হিন্দু এলাকা থেকে। কেউ কারো প্রতিবেশী হবে না, হতে সাহস পাবে না। আস্থা ফিরে আসতে ফ্রান্সের মতো বা ইংলণ্ডের মতো দুই শতাব্দী লাগবে। তার জন্যেও দরকার হবে একটা ফরাসী বিপ্লবের, যা ধর্মের দিক থেকে মানুষের মনকে হিউমানিজমের দিকে ঘোরাবে। হিউমানিজম যে ধর্মকে খারিজ করে তা নয়, কিন্তু মানব জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপকে খারিজ করে। যাবতীয় তথ্যের বা বস্তুর ধর্মীয় ব্যাখ্যাকেও অস্বীকার করে। দর্শন এখন স্বরাট। বিজ্ঞান এখন স্বরাট। ইতিহাস এখন স্বরাট। রাজনীতি এখন স্বরাট। অর্থনীতি এখন স্বরাট। ভারতে কবে সে সুদিন আসবে?"

কথাবার্তারও মোড় ঘুরে যায়। দুই ব্যারিস্টারে সওয়াল ও পাণ্টা সওয়াল। দীপিকাদি উঠে যান। তিনি তখন টুকটুকের কথাই চিন্তা করছিলেন। একটু পরে একখানা চেক বই নিয়ে এসে জানতে চান স্বপনদার কাছে, "কত লিখব?"

"কেন লিখবে, কার নামে লিখবে?" স্বপনদা সুধান।

"টুকটুকের নামে। ও যে গুরুভার বহন করছে সেটা কি আমরা একটু হালকা করতে পারিনে? তুমি যদি অনুমতি দিতে আমিও ওর মতো অ্যাডভেঞ্চারে বেরোতুম।" দীপিকাদি ভেঙে বলেন।

"তুমি পতিপ্রাণা নারী, তোমার অ্যাডভেঞ্চার পতিগৃহে ও কলেজে। পুলিশ পর্যন্ত যাদের হদিস পায়নি তারা যে কেমন দুর্গম স্থানে ছিল সেটা কি তুমি অনুমান করতে পারছ না, রানু?" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

"ওই তোমার এক কথা। বিয়ে করেছি বলে আমার যেন কোনো স্বাধীনতা নেই। এইজন্যেই টুকটুক তালাক নিয়ে স্বাধীনা হয়েছে। কাজটা ভালো করেনি, কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে মানুষ কী না করতে পারে! মেয়েরাও মানুষ। তুমি হিউমানিস্ট, ওদেরকেও সমান অধিকার দাও।" দীপিকাদি নিবেদন করেন।

"তার মানে কি এই যে তুমিও টুকটুকের মতো বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে হিন্দু ও মুসলিম কন্যা উদ্ধার করবে? তুমি কি মনে করেছ এক মাঘে শীত যাবে, দাঙ্গা আর বাধবে না?" স্বপনদা তা মনে করেন না।

"না, না, সেরকম অভিপ্রায় আমার নেই। তবে আমি একদিন গিয়ে দেখব ওই মেয়েরা কেমন আছে, কোথায় আছে। আর কার কী দরকার। নিউ মার্কেটে গিয়ে কিনে এনে দেব। দিয়ে আসব বড়দিনের উপহার। আহা, বেচারি ধরে নিয়ে যাওয়া মেয়েরা! তারপর তো বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো। কী তাদের অপরাধ? মীর সাহেব, আপনি টুকটুককে বলবেন যে আমি তার কাজের অন্ধ সমর্থক। তারও ভক্ত। সত্যি, সে আমাদের দেশের নারীশক্তির প্রতীক। আমার ধারণা ছিল ও একটি ফুরফুরে প্রজাপতি। আমার আশঙ্কা ছিল যে ও একদিন আমার বাগানের ফুলটিতেও এসে বসবে। যেমন চেয়েছিল বাগানটি আমার হওয়ার আগে। সেটা দেখছি ভুল। ওর মন এখন সমাজকল্যাণের কাজে। ওর জয় হোক। ওর জন্যে আজ আপনার হাতে ছোট্ট একখানা চেক দিচ্ছি। এর বেশী এখন পারছিনে, ত্রুটো এস্টাব্লিশমেণ্ট চালাতে হয়। আর কর্তাও তো কোর্টে বেরোতে পারছেন না। ওঁর কাছে পরামর্শের জন্যেও কেউ আসে না। ল কলেজ থেকেও ছুটি নিয়েছেন। চেকটা উনিই লিখতেন। ওঁর হাত কাঁপবে। তাই আমি লিখছি। জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট। আমারও সমান অধিকার। যদিও সমান কনট্রিবিউশন নয়।" দীপিকাদি চেক লিখে দেন।

মীর সাহেব চেকখানা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, "পাঁচশো টাকা। এ তো রাজকীয় অনুগ্রহ। টুকটুক উল্লাসে নাচবে। আমারই নাচতে সাধ যাচ্ছে। কী, গুপ্ত সাহেব, আপনার সাধ যাচ্ছে না?"

"হুঁ! কোথায় কে কাকে ধরে নিয়ে যাবে, কে কাকে ফিরিয়ে আনবে, আর আমাকে ও আমার বৌকে তার খেসারৎ দিতে হবে। ভবিষ্যতেও যে অমন হবে না তা নয়। আমি কি তবে দেউলে হব? আমার আয়ের চেয়ে ব্যয় ঢের বেশী।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

"ধরে নাও যে ওটা আমার শেয়ারের থেকে দেওয়া। টুকটুক এত করছে, আমি কি তার একাংশও করব না? টাকা না দিয়ে আমি যদি গতর খাটিয়ে সাহায্য করতুম তুমি কিছু মনে করতে না?" দীপিকাদির চোখা প্রশ্ন।

"গতর খাটিয়ে তুমি কী করতে শুনি?" স্বপনদা থতমত খান।

"রোজ বাজার করে দিতুম।" দীপিকা না ভেবেচিন্তে বলেন।

"গাঁটের কড়ি খরচ করে তো? তা হলেই হয়েছে। তুমি কলেজও করবে, বাজারও করবে, আমার কাছে থাকবে কখন? তার চেয়ে কিছু টাকা ধরে দিয়ে খালাস হওয়াই ভালো।" স্বপনদা পরামর্শ দেন।

"তাই তো আমি করেছি। তবে খালাস আমি হতে পারব না। এ তোমার এ আমার পাপ। এর প্রায়শ্চিত্ত অত সহজ নয়। আহা, ওই মেয়েদের ভবিষ্যৎ কী হবে? যেমন হিন্দু সমাজ তেমনি মুসলিম সমাজ। কেউ তো ওদের নেবে না। টুকটুক ওদের স্বাবলম্বী করে দেবে, কিন্তু ঘর দিতে পারবে না, বর দিতে পারবে না। মীর সাহেব, আপনি যদি বিয়ে দিতে পারতেন!" দীপিকাদি বলেন।

"মুসলিম কন্যা তিনটির বিয়ে আমি অনায়াসেই দিতে পারি। যদি তাদের স্বামীরা তালাক দেয়। বাঙালী মুসলমানদের পাঞ্জাবী বিয়ে করতে আপত্তি নেই। অবশ্য বর যদি মুসলমান হয়ে থাকে। সতীনেও আপত্তি নেই। সতীনের সঙ্গে যদি ঘর করতে না হয়। তবে আমার আপত্তি আছে। আমি অবাঙালীর সঙ্গে বিয়ে দেব না, যার বিবি আছে তার সঙ্গেও বিয়ে দেব না। তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে নিক্ষেপ করা, সেটাও একটা পাপ। হিন্দু কন্যাদের বিয়ে দেওয়া আমার মাথাব্যথা নয়। হিন্দুরাই তা নিয়ে ভাবুন ও তৎপর হোন। কিছু টাকা ধরে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা মানবিকবাদ নয়। গুপ্ত সাহেব, আপনার বিবেক কী বলে? মানুষকে আপনি গুলী করবেন না। বেশ! কিন্তু আপনি অকূলে ভাসিয়ে দেবেন কী করে?" মীর সাহেব জেরা করেন।

"দেখুন, মীর সাহেব, হিন্দুরা একশোটা বিষয়ে এগিয়ে থাকলেও একটা বিষয়ে পেছিয়ে রয়েছে। নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাদের সংস্কার পাঁচ হাজার বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে। ওরা স্বাধীন হবে, গণতন্ত্রী হবে, সমাজতন্ত্রী হবে, সর্বোদয় করবে, অতিমানসের অধিকারী হবে। কিন্তু নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে ত্রেতাযুগের অযোধ্যার লোকের যে সংস্কার তাদেরও সেই সংস্কার আবাহমানকাল অচল অটল থাকবে। আমি প্রচ্ছন্ন মুসলমানই হই আর প্রচ্ছন্ন ইংরেজই হই আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি। এটা আমার সহজাত সংস্কার। ওই মেয়েদের মধ্যেও সেই সংস্কার সমানে কাজ করছে। ওরাও বিয়ে করলে নিজেদের সতীত্বভ্রষ্ট মনে করে আজীবন কষ্ট পাবে। হৃৎপিণ্ড

ালান সন্ন্যাসিনীরা। হস্‌পিসে যখন ওরা আছে তখন সন্ন্যাসিনী হোক। তা হলেই অযোধ্যার লোক সম্মান করবে। খুঁটিয়ে দেখবে না কার কী অতীত। মহামানব বুদ্ধও তাদের জন্যে সেই মার্গই নির্দেশ করেছিলেন। 'থেরীগাথা' পড়েছেন? সন্ন্যাস নিয়ে তাদের কী আনন্দ! আমার মনে হয় টুকটুক সন্ন্যাসিনী হবার পথে।" স্বপনদা অনুমান করেন।

মীর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "কী দিদি, আপনার কী মত? না আপনিও একমত?"

"আমি!" দীপিকাদি রাগ চেপে রাখতে পারেন না। বলেন, "আপনি যদি মালাবারে যান, কোচিনে যান, ত্রিবাঙ্কুড়ে যান তা হলে দেখবেন সেখানকার হিন্দুরাও কম ধার্মিক নয়। কিন্তু তাদের সমাজ মাতৃতন্ত্রী। তাই মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি পায়। সম্পত্তি যার স্বাধীনতাও তার। সে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করে, বনিবনা না হলে একজনকে ত্যাজ্যপতি করে আরেকজনকে বিয়ে করে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সতীত্বের অভাব নেই, কিন্তু তার সংজ্ঞা অন্যরূপ। পুরুষের সতীত্বেরই অনুরূপ। নারী যখন তার স্বাধিকার অর্জন করবে তখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার থেকেও মুক্ত হবে। নারীর মুক্তি না হলে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সর্বোদয়, অতিমানস ইত্যাদি শুধু পুরুষদেরই জন্যে, নারীদের জন্যেও নয়। টুকটুক নিজে এদেশের নিউ উওম্যান। সে কখনো ওর অতিথি মেয়েদের সেকেলে সতীসাধ্বী হতে বলবে না। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ওদের অন্য শিক্ষা দেব।"

"ফলে ওই সপ্তকন্যা পুরাণের পঞ্চকন্যা হবে। অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তী, মন্দোদরী তথা।' স্বপনদা কটাক্ষ করেন।

দিনকয়েক পরে টুকটুক আসে ধন্যবাদ জানাতে ও রসিদ দিতে। বলে, "বেশ তো উৎফুল্ল দেখছি তোমাদের দু'জনকেই। মেরি ক্রিস্‌মাস অ্যাণ্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। দাদার অসুখ সেরে গেছে আশা করি।"

"তোমার দাদাকেই জিজ্ঞাসা করো।" দীপিকাদি বলেন।

"আমার অসুখ তো শারীরিক নয়, মানসিক। না, মানসিকও নয়, আরো গভীর স্তরের। কী করে সারবে যদি হিন্দু মুসলমান মানুষ না হয়ে শকুন হয়? তাও না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু মেয়েদের কী দোষ? কেন তাদের এই সর্বনাশ?" স্বপনদা সন্ত্রস্ত স্বরে বলেন।

টুকটুক একটু ভেবে নিয়ে বলে, "সর্বনাশ কেন বলছ, স্বপনদা? মেয়েরা কি কাচের বাসন? তুমি যাকে অমূল্য মনে করো আমি তাকে অমূল্য মনে করিনে। মানুষের প্রাণ অমূল্য। মেয়েদের প্রাণনাশ করা হয়নি। সতীত্ব যে নাশ করা হয়েছে তার কোনো প্রমাণ নেই। ওরা কারো নামে নালিশও করছে না। আর নারীর সতীত্ব পুরুষের সতীত্বের চেয়ে কোনো অংশে বেশী মূল্যবান নয়। পুরুষেরা তো যা করেছে তার জন্যে বড়াই করে। লজ্জিত হয় আর ক'জন? এতগুলো ব্রদেল চলছে কাদের বাহাদুরির জন্যে? ওই ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড আধুনিক নারী আর মানতে চায় না। পুরুষ বাহাদুর হলে নারীই বা হবে না কেন? পুরুষ একনিষ্ঠ হলে নারীও একনিষ্ঠ হবে। কতকগুলো বুনো জানোয়ার আমার দশটি মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। বুনো জানোয়ারের কবলে পড়লে শারীরিক জখম অসম্ভব নয়, কিন্তু চারিত্রিক বিকৃতি অসম্ভব। আমি আমার মেয়েদের বলেছি, তোমরা যেমন নিষ্পাপ ছিলে তেমনি নিষ্পাপ রয়েছ। পাপ তখনি হয় যখন নারীর সক্রিয় সম্মতি থাকে। ওদের পাপবোধ থেকে মুক্ত করাই আমার প্রকৃত কাজ। সেইজন্যে তাদের আমি সরকারের রেস্কিউ হোমে দিইনি। সেখানে ওরা আর সব পাবে, কিন্তু নৈতিক সমর্থন পাবে না। সেটা অত্যাবশ্যক।"

স্বপনদা হকচকিয়ে যান। হাত পায়ের কাঁপুনি মুখেও সংক্রামিত হয়। "তু-তুমি সর্বনাশ বলে মা-মানো না! তু-তুমি কি সমাজের কল্যাণ করছ না অ-অকল্যাণ করছ?"

একথা শুনে টুকটুকও হকচকিয়ে যায়। দীপিকাদি ত্রস্ত হয়ে বলেন, "ওর হাত পা কাঁপছিল, এখন দেখছি ঠোঁটও কাঁপছে। লক্ষণ শুভ নয়। চল, আমরা ওঘরে যাই।"

পাশের ঘরে গিয়ে দীপিকাদি বলেন, "মেয়েরা নির্দোষ, কিন্তু যারা তাদের ধরে নিয়ে গেছে তারা তো দোষী। তুমিও স্বীকার করবে যে তারা পাপ করেছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুকেও করতে হবে, মুসলমানকেও করতে হবে। হিন্দু সাধারণকেও, মুসলমান সাধারণকেও। এ তোমার এ আমার পাপ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন। এটাও একপ্রকার যুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন আজ আবার সেই কথাই বলতেন। তোমার দাদাকে তাই আমি বলেছি, এ তোমার এ আমার পাপ। তোমার নামে যে চেক দেওয়া হলো

সেটা বিবেককে শান্ত করার জন্যে দেওয়া। যাকে বলে conscience money."

টুকটুক অভিভূত হয়। "বৌদি, তুমি কি মানুষ না এন্‌জেল? এমন মন প্রাণ দিয়ে স্বামীর শুশ্রূষা করতে তো আমি কখনো পারতুম না। সেটা আমার মাতৃকুলের ধারা নয়। আমরা রুগীর ঘরে যাইনে, তার শুশ্রূষা করিনে। বাইরের নার্সের হাতে ছেড়ে দিই। তা না হলে আমাদের রূপযৌবন আমাদের চার্ম নষ্ট হয়ে যায়। তখন কর্তারা আমাদের ফেলে যত্র তত্র চরে বেড়ান।"

দীপিকাদি রঙ্গ করেন। "সেইজন্যেই বুঝি তুমি এই বয়সেও নবযুবতী। আর তোমার সমবয়সী হয়েও আমি যা হয়েছি তা আয়নায় দেখে আঁতকে উঠি। তবে আমার কর্তাকে আমি ঘরে আটক করে রাখতে পেরেছি, বোন। নিজেও আটকা পড়েছি। তোমার কী! তুমি তো এবেলা ওবেলা কাপড় ছাড়ার মতো স্বামী ছাড়ো। এবার বোধহয় সময় হয়েছে আর একটি পুরুষকে ধন্য করার। এমন রাঙা টুকটুকে বৌ কে না চায়।"

"কেউ যে প্রস্তাব করেনি তা নয়, কিন্তু আমি ওই অ্যাডভেঞ্চার আর করব না। আমি আমার দশটি মেয়েকে নিয়ে নতুন এক অ্যাডভেঞ্চারে মশগুল রয়েছি। এদের নিয়েই এখন আমার সুখ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমিও সুখী। জানতে পারি কি তোমার সীক্রেটটা কী?" টুকটুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়।

"তোমাকে বলব কেন, তুমিও যদি আমাকে তোমার সীক্রেটটা না বলো?" দীপিকাদিও কৌতূহলী।

"আমার সীক্রেট কাকে বলছ, বৌদি?" টুকটুক ভেবে পায় না।

"তোমার মেয়েদের তুমি পেলে কোথায়? কেমন করে? বস্তিতে বস্তিতে তল্লাস করে?" দীপিকাদি যতদূর অনুমান করেন।

"বলতে রাজী নই কাউকে। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি আমাকে মরাল সাপোর্ট দিয়েছ। কিন্তু খবরদার আর কাউকে বলতে যেয়ো না। তোমার উনবিংশ শতাব্দীর ফসিল স্বামীটিকেও না। তুমি আর আমি বিংশ শতাব্দীর জীবন্ত নারী। ভাগ্যিস্ ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। খুব বেঁচে গেছি। উনি কি আমাকে ছাড়তেন? আমাকে আঁকড়ে ধরতেন। অক্টোপাসের মতো। আর আমিও তেমনি দুর্বল, তাঁর বেলা। যাক্, তুমি কী জানতে চাও? আমার মেয়েদের আমি কোথায় পেলুম ও কেমন করে?

বলছি, কিন্তু বিনিময়ে তোমাকেও বলতে হবে তোমার সীক্রেট।" টুকটুক দর কষে।

"আচ্ছা, বলব।" দীপিকাদির মুখে দুষ্টু হাসি।

"তা হলে শোন। মীর সাহেব আমাকে ডেকে একটা ভার দেন। দশটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, তারা সতেরোই আগস্ট থেকে নিখোঁজ। তারা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় পালাবার সময় গুণ্ডাদের আক্রমণে কোথায় ছিটকে পড়ে। যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। তাদের জন্যে অপেক্ষা করে না। তাদের তিনজন মুসলমান। তারা যাচ্ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে। সাতটি হিন্দু। তারা যাচ্ছিল দুই দলে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণপূর্ব থেকে উত্তরে। তাদের গুরুজন পুলিশে খবর দেন, কিন্তু পুলিশের হাতে তখন এন্তার কেস। পুলিশ সময় নেয়, অবশেষে জানায় ওরা কলকাতায় নেই, থাকলে পাওয়া যেত। বোধহয় চালান গেছে পাঞ্জাবে। সেখানে মেয়ে বিক্রী হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কাগজে কাগজে। উত্তরও মেলে। কিন্তু গিয়ে দেখা যায় ভুল মানুষ। হতাশ হয়ে গুরুজন মীর সাহেবের কমিটির দ্বারস্থ হন। আমি ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলমান পরিবারের পুনর্বাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি। চোস্ত উর্দু ও হিন্দী বলতে পারি। যে কোন অন্দরে প্রবেশ অবাধ। কিন্তু কোথাও কোনো হদিস না পেয়ে এক ডিটেকটিভ এজেন্সীর শরণ নিই। তারা গোয়েন্দা লাগিয়ে গোপন অনুসন্ধানে জানতে পায় যে মুসলিম তিন কন্যাকে রাখা হয়েছে হিন্দু সাজিয়ে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে এক নিষিদ্ধ পল্লীতে মাসীর বাড়ী। আর হিন্দু সাত কন্যাকে মুসলিম সাজিয়ে শাঁখা সিঁদুর খুলে বা মুছে নাম ভাঁড়িয়ে তিনজন আমীর আদমির হারেমে। সম্ভ্রান্ত এলাকায়।

খবর শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়। কার কাছেই বা এসব তথ্য ফাঁস করব? ফাঁস হয়ে গেলে মেয়েগুলো অন্যত্র চালান যাবে। দুটো কি তিনটে গ্যাং গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে এইসব কাণ্ড করছে। তারা ভয়ানক জীব। যুদ্ধের সময় সরকার থেকে দু'হাজার গুণ্ডাকে বন্দী করা হয়েছিল। যুদ্ধের পরে তাদের খালাস দেওয়া হয়। তারা এখন বেপরোয়া। মীর সাহেবকে বলি, ক্লু মিলেছে। কিন্তু বিষম বিপদ। আপনি আমাকে একজন গোরা সার্জেণ্ট দিন। তার হাতে দশটা সার্চ ওয়ারেণ্ট। ঠিকানা খালি থাকবে। আমি বসিয়ে দেব। তারপর আমার জন্যে আর আমার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

সঙ্গিনী মিস্ ফোকস্টোনের জন্যে তু'খানা আইডেনটিটি কার্ড চাই। সব শেষে আমার কিছু টাকার দরকার। তা দিয়ে উপহার কিনতে হবে। কাদের জন্যে জানতে চান? যারা ওই মেয়েদের আটক করে রেখেছে তারা হয়তো কিছু খরচপত্র করেছে। তাদের সেটা পুষিয়ে দিতে হবে। তা হলে আর পুলিশ ডাকতে হবে না।

সবরকমে প্রস্তুত হয়েই আমরা তিনজনে রওনা হই। সার্জেন্টকে বাইরে খাড়া রেখে আমরা তু'জনে ভিতরে ঢুকি। প্রথমে মাসীর বাড়ী। মুসলিম কন্যাদের খোঁজে। মাসীকে যখন সেই তিনটি বালিকাকে ছেড়ে দিতে বলি তিনি বলেন, কোথায় শুনলেন তারা এখানে আছে? সব বাজে কথা। তারা এখানে নেই। এর পরে থলে থেকে বেড়াল বার করে বলি, তাদের যে আমাদের হাতে দেবে তার জন্যে এই পুরস্কার। এক হাজার টাকার অলঙ্কার। মাসী বোধহয় আরো কিছু পাবার আশায় প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আমি বলি, তা হলে ভুল ঠিকানায় এসেছি। এখন চলি। তিনি আমাকে থামান ও ভিতরে গিয়ে তিনটি মেয়েকে নিয়ে আসেন। বলেন, দেখুন দেখি এই মেয়েরা কি না। আমি ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখি ও তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। মাসী তখন মোক্ষম চাল চালেন। বলেন, আপনারা তো এদের নিয়ে আর কোথাও চালান দেবেন। আপনারা কারা? আমি আমাদের তু'জনের আইডেনটিটি কার্ড দেখাই। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। তখন তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখাই সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে। তার হাতে সার্চ ওয়ারেন্ট। চেয়ে নিয়ে পূরণ করে দিই। তখন বরফ গলে। এর পরে দরাদরি! অত কম পুরস্কার দিলে কি চলে? আরো কিছু বাড়িয়ে দিন। আমার ব্যাগে নগদ পাঁচশো টাকা ছিল। সেটাও ধরিয়ে দিয়ে মেয়েদের ছাড়িয়ে আনি। প্রথমেই যাই পুলিশ স্টেশনে। তারপর তাদের তিন বাড়ীতে।

সেইখানে বাধে ফ্যাসাদ। গুরুজন গ্রহণ করতে নারাজ। খুলে বলতে হবে কোথায় ওরা এতদিন ছিল। না বললে বাড়ীতে জায়গা হবে না। মেয়েরা মুখ খুলবে না। আমি বারণ করে দিয়েছিলুম। আমরাও মুখ খুলব না। ওঁরাও বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না। অগত্যা আমি ওদের নিয়ে যাই মীর সাহেবের ওখানে। তিনি তাদের সেদিনকার মতো থাকতে দেন। তারপরের দিন পাঠাতে চান রেস্কিউ হোমে। আমি বলি, সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, নইলে সব মাটি হবে। তখন রাতারাতি একটা খালি বাড়ী

ভাড়া করা হয়। আমি তার নাম রাখি হস্‌পিস। আমি চার্জ নিই। মেয়েদের বলি, আপাতত আমিই তোমাদের অভিভাবিকা। আমার প্রত্যেকটি আদেশ মানতে হবে। গ্যাং আমাদের গন্ধ পেলে রক্ষা থাকবে না, তাই পাহারার ব্যবস্থা করি। মিস ফোকস্টোন হন মাদার সুপিরিয়র। তার পর যাই হিন্দু কন্যাদের খোঁজে আলীপুরে আমীর আদমিদের মঞ্জিলে। তাঁরা একজন নন, তিনজন। এবার আমাকে আরো সাবধান হতে হলো। সঙ্গে নিলুম মীর সাহেবের কন্যা রাবেয়াকে। এমন সময়ে গেলুম যখন হুজুররা অনুপস্থিত। বেগমদের কথাবার্তা অনেকটা একই ধরনের। অলঙ্কার আরো মূল্যবান। মেয়েরা সেখানে বাঁদির মতো থাকত। আমাদের দেখে কান্না জুড়ে দেয়। বেগমদের বলি, বাইরে গোরা সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে, এরা হিন্দুর মেয়ে, সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে। আপনারা ঝামেলায় পড়তে পারেন, যদি বন্দী করে রাখেন। তাঁরা এক কথায় রাজী। ওদের নিয়ে প্রথম কাজ হলো পুলিশ স্টেশনে যাওয়া, সেখান থেকে পরের কাজ হলো গুরুজনদের বাড়ী ওদের পৌঁছে দেওয়া। ওঁরাও জানতে চান কোথায় ওদের পাওয়া গেল। মেয়েদের শিখিয়ে ছিলুম কী বলতে হবে। ওরা বলে লোকের নাম জানে না, রাস্তার নাম জানে না। আমি বলি, ওসব বলা বারণ। বিপদের আশঙ্কা আছে। যা ভেবেছিলুম, ওঁরা ঘরে ফিরে নিলেন না। আমি ওদের সরাসরি হস্‌পিসেই তুলি। মীর সাহেবকে রাবেয়া জানায়। তিনি এসে দেখে যান।"

"আমার রাঙা টুকটুকে বোন! তোর পেটে এত বিদ্যে! আমি এত পড়াশুনা করেও তোর কাছে হার মানছি। কিন্তু তোর সামনে মস্ত ফাঁড়া। ওই মেয়েদের কেউ না কেউ পোয়াতী হবে। চার মাস হতে চলল। কোনো লক্ষণ দেখতে পাস্‌নি?" দীপিকাদি উদ্বিগ্ন হয়ে সুধান।

"আমি, ভাই, অত বুঝিনে। মেট্রন তো বলছে তিনজনের লক্ষণ দেখছে। দুটি হিন্দু, একটি মুসলমান। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছি রোমান ক্যাথলিক মিশনারিদের সঙ্ঘ 'আওয়ার লেডী অভ্‌ ফাতিমা'কে ডাকব। সন্ন্যাসিনীরা জানতেও চাইবেন না বৈধ কি অবৈধ, বাপের নাম কী। বাচ্চাকে ওঁরা নিয়ে যাবেন ও রাখবেন। বাচ্চার মাকেও, যদি সে রাজী হয়। পরে তাকে বিদায় দেবেন, যদি না সে খ্রীস্টান হতে চায়। বাচ্চাকে মানুষ করবেন, যদি কেউ দাবী না করে। আমি তো আর কোনো উপায় দেখছিনে, দিদি।

তোর যদি জানা থাকে তো বল।" এমনি করে দু'জনে মধ্যে তুই তোকারি শুরু হয়ে যায়।

দীপিকাদি বোনের মাথাটা টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বলেন, "ধন্যি মেয়ে টুকটুক। আমার যদি মেয়ে হয় তার নামও আমি টুকটুক রাখব।'

"সে কী, দিদি! তোরও হবে না কি?" টুকটুক ফিসফিস করে সুধায়।

"হতে পারে। একদিন রাত্রে কবচ পরতে অবহেলা করেছি।" দীপিকাদি স্মিতমুখে উত্তর দেন।

॥ তিন ॥

জুলিকে পেয়ে ও তার গোলগাল চেহারা নিরীক্ষণ করে তার মা আনন্দে অশ্রুমোচন করেন। তিনি তো আশা করেননি যে তাঁর বেবীর বেবী হবে। ভগবান আছেন।

জুলি একবার বাড়ীখানার উপর চোখ বুলিয়ে বলে, "মা, আবু তালিব কোথায়? ওকে দেখছিনে কেন?

"আবু তালিবকে আমি ছুটিশুদ্ধ পেনসন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। নইলে পাড়ার ছেলেরা ওকে বেহেস্তে পাঠাত।" মা কৈফিয়ৎ দেন।

"আবু আমার ছেলেবেলা থেকে আমাদের বিশ্বস্ত বাবুর্চি। এমন কী ঘটল যে ওকে পাঞ্জাবে ফেরৎ পাঠাতে হলো?" জুলি জেরা করে।

"কাগজে পড়িস্নি কলকাতায় কী ভয়ানক দাঙ্গা বেধেছিল? কে কাকে রক্ষা করবে? আমি আবুকে না আবু আমাকে? দু'জনেরই সমান বিপদ। পাড়ার মুরুব্বিরা এসে বলেন, মিসেস্ সিন্‌হা, আপনি বাঁচতেও পারবেন না, বাঁচাতেও পারবেন না, যদি আপনার বৃদ্ধ মুসলিম পাচকটিকে জবাব না দেন। ওর যে কোনো অপরাধ হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ পাড়ায় ওর থাকা না থাকাটার উপর শান্তি বা অশান্তি নির্ভর করছে। হী ইজ আ সিকুইরিটি রিস্ক। এর পরে আমি আর কী বলতে পারি? গভর্নমেণ্ট হাউসে আগের মতো আমার গতিবিধি নেই। আমার মেজ জামাইও আর স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল নয়। বর্ণহিন্দুরা এ জমানায় অচ্ছুৎ। ক্যাবিনেটে তাঁরা নেই। কাজেই আমাকে সেই অন্যায় অনুরোধ মানতে হলো। অনুরোধ না আদেশ। তখন থেকে আমার মাথা

হৈট। তোর বাপ যদি বেঁচে থাকতেন কার সাধ্য ছিল আমার বাড়ী বয়ে এসে আমাকে হুকুম করে? আজকের সিচুয়েশনে কেউ কিছু করতে পারে না। লাটসাহেবও না, যদি না তিনি এই মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে স্বহস্তে শাসনভার নেন।" মা হাহুতাশ করেন।

জুলি আর কথা না বাড়িয়ে টেলিগ্রাম করে, 'আবু তালিব, কাম ব্যাক।' টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে একশো টাকা রাহা খরচ পাঠায়। একদিন 'দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা' এসে হাজির। এর পরে বলা উচিত ছিল 'যাও, ঠাকুর, চৈতন চুটকি নিয়া।' কিন্তু ভবিষ্যতে তারও প্রয়োজন হবে, বাড়ীতে একটি লোক বাড়বে ও জুলি তাকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

আবু ফিরে আসার পর পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়। ছেলেরা এসে বলে, "আপনি আমাদের নমস্য। কত বড়ো স্বাধীনতা কর্মী! কিন্তু এটা তো আপনাকে বলতে হবে না যে মুসলমানরা সারা বাংলাদেশ গ্রাস করতে চায়, সেখানে হিন্দুকে মারবে কিংবা তাড়াবে কিংবা কলমা পড়াবে। তার চেয়ে আরো খারাপ, ধরে বেঁধে বীফ খাওয়াবে! ওয়াক, ওয়াক, থুঃ! এ ঝুঁকি কে নিতে চায়, আপনিই ভেবে দেখুন। আমরা নিছক আত্মরক্ষার জন্যে লড়ছি। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। আপনার এই লোকটি অবশ্য বহুদিনের চেনা মুসলমান। আমরাও তো একে ভালোবাসি। মাঝে মাঝে দেশ থেকে পাওয়া খেজুরটা, কিসমিসটা, আপেলটা দেয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এরা সবাই অন্ধ ইসলামবিশ্বাসী, হিন্দুবিদ্বেষী, সুতরাং এক একটি বিষধর সর্প।"

"তোমরা কি এতই অকৃতজ্ঞ যে এক বছরের মধ্যেই ভুলে গেলে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুসলিম সেনাদের? আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম কংগ্রেস মন্ত্রীদের? যাঁরা এখনো স্বাধীনতার জন্যে লড়ছেন। ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতার। কিন্তু আমি কেমন করে ভুলব যে বিয়াল্লিশ সালে আমি যাঁদের বাড়ীতে আত্মগোপন করে লড়েছিলুম তাঁদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। সেদিন তো কেউ সাপের মতো আমাকে কামড়ায়নি, আমাকে ধরিয়ে দেয়নি। সুনীল, রঘু, বসন্ত, তোমরাও তো পালিয়ে বেড়িয়েছিলে। তোমরাও কি সেদিন মুসলমানের কাছে আশ্রয় চাওনি ও পাওনি? যতরকম পাপ আছে তার মধ্যে হীনতম হচ্ছে পথের সাথী যে কুকুর তাকে স্বর্গের তোরণে পৌঁছিয়ে পরিত্যাগ করা। যুধিষ্ঠির বরং স্বর্গ ত্যাগ করবেন তবু পথের সাথীকে ত্যাগ করবেন না।

আমাদের এ দেশের স্বাধীনতা আসন্ন। সেই আমাদের স্বর্গসুখ। আমরা আমাদের মুসলমান সাথীদের যদি সঙ্গে নিতে না পারি তবে বরং স্বাধীনতাকেই ছাড়ব। কিংবা স্বাধীনতাই হয়তো আমাদের অধর্ম দেখে আমাদের ছাড়বে।" জুলি রাগে দুঃখে ভেঙে পড়ে।

ওরা মুখ কাঁচুমাচু করে বলে "তা হলে কী করতে বলেন, মঞ্জুদি?"

"নেতাজী থাকলে যা বলতেন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই এখনো সারা হয়নি। আবার বাধলে সে সময় মুসলমানকে মনে পড়বে। সবাই কিছু লীগপন্থী নয়। বহু মুসলমান গান্ধীপন্থী, সুভাষপন্থী, কৃষকপ্রজা, ইউনিয়নিস্ট। ওদের বাঁচাও। যাকে বাঁচাও সেও বাঁচায়। এই আবু তালিবই আমাকে ও আমার মাকে বাঁচাবে।" জুলি বিশ্বাস করে।

ওরা চিন্তাকুলভাবে প্রণাম করে ফিরে যায়।

ওদের চলে যাবার পর মা বলেন, "আবার যদি দাঙ্গা বাধে ওরাই তো এ পাড়ার ভরসা। পুলিশ অপদার্থ। আর্মি সব জায়গায় টহল দিতে পারবে না। তোর মওলানা আজাদ বা খান্ আবদুল গফফার খান বা শাহ্ নওয়াজ খান কেউ আমাদের রক্ষা করতে ছুটে আসবেন না। তুই ভুল করলি।"

জুলি তার মাকে বোঝায় যে কংগ্রেস বড়লাটের গভর্নমেণ্টে যোগ দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা পাকাপোক্তভাবে নয়। বনিবনা না হলে পদত্যাগ করে আবার সংগ্রামে নামার দুয়ারটা খোলা রেখেছে। তখন মুসলমানরাও তার আহ্বানে সংগ্রামে নামবে। তিন চার মাসের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে ওয়েভেলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় হয় ওয়েভেল বিদায় নিয়েছেন, নয় কংগ্রেস নেতারা বিদায় নিয়েছেন। বাপুকেও সে সময় নোয়াখালী থেকে বিদায় নিতে হবে। দাঙ্গা বাধিয়ে জিন্না সাহেবের কী লাভ হবে? কংগ্রেসকে সরানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তো কংগ্রেস কোথায় যে কংগ্রেসকে সরাবেন? স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার শুরু হলে সেই গঙ্গার বানে সদলবলে তিনিই ভেসে যাবেন।"

তার মা রাজনীতি বোঝেন না। তিনি রাজভক্ত প্রজা। ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে এটা তিনি কামনাও করেন না, বিশ্বাসও করেন না। তাঁর স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর মতভেদ ছিল। মেয়ের সঙ্গেও মতভেদ রয়েছে।

"তোর ওই এক কথা। হয় ইংরেজ, নয় কংগ্রেস। এদিকে মুসলিম লীগ বলে একটা দাবীদার রয়েছে। সে কি তার পাওনার জন্যে লড়বে না? সারা

বাংলা না পাক, পূববাংলা সে পাবেই। কার্জন লাইন আমাদের কপালে লেখা আছে। লর্ড কার্জন এদেশ থেকে গিয়ে ওদেশের গভর্নমেণ্টে কী যেন হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাঁকে সালিশ মানলে তিনি পোলাণ্ডে যান আর সেখানেও এক লাইন টানেন। সেটাকে বলে কার্জন লাইন। পোলরা সে লাইন মুছে ফেলে। আমরাও যেমন মুছে ফেলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার সে লাইন আঁকা হয়েছে। লাইনের এক পাশে পোলাণ্ড, আরেক পাশে সোভিয়েট ইউনিয়ন। কী করবে পোলরা? এটা যে তাদের কপালের লাইন। কার্জন ছিলেন লাইন আঁকতে ওস্তাদ। শুধু কার্জন কেন, ম্যাকমেহন, যাঁর নামে ম্যাকমেহন লাইন। ডুরাণ্ড, যাঁর নামে ডুরাণ্ড লাইন। তোদের জানা উচিত ইংরেজরা তোদের শত্রু নয়। তারা তোদের ভালোর জন্যেই সেবার লাইন টেনেছিল। এবারেও টানবে, যদি তোরা মুসলিম লীগের সঙ্গে আপস করতে রাজী থাকিস্।" মিসেস সিন্‌হা আপসের পক্ষপাতী।

"আপস কে না চায়? কিন্তু ভারতের ঐক্যের বিনিময়ে নয়। বাংলাদেশের ঐক্যের বিনিময়েও নয়। এ দুটো হলো স্বতঃসিদ্ধ।" জুলির মতে। "আমরা সমগ্রের জন্যে লড়েছি, ভগ্নাংশের জন্যে নয়। ভগ্নাংশ নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনে। সমগ্রকে যতদিন না পাচ্ছি ততদিন লড়তেই থাকব। আরো দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর। বাপুও ততদিন বাঁচবেন।"

"সেটা বড়ো শক্ত কথা। বাপু কতদিন বাঁচবেন সেটা বাপুর হাতে নয়। মানুষের হাতে নয়। ভগবানের হাতে।" জুলির মা বলেন।

"ওঁর স্বাস্থ্য এখন চমৎকার। উনি যেদিন কলকাতা হয়ে নোয়াখালী যান সেইদিনই আমরা শিয়ালদায় নেমে ওঁকে দেখতে যাই। তিনি আরো দশ বছর বহাল তবিয়তে বাঁচবেন।" জুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে।

জুলি আবুকে ডেকে উর্দুতে বলে, "কায়দে আজমের তো দাড়ি নেই, সুহরাবর্দী সাহেবেরও তো দাড়ি নেই, নাজিমউদ্দীন সাহেবেরও তো দাড়ি নেই, খিজর হায়াৎ খান্ সাহেবেরও তো দাড়ি নেই, তবে তোমার কেন দাড়ি থাকবে? ইসলামে দাড়ি ফরজ নয়। দাড়ি না রাখা হারাম নয়।"

আবু দাড়ি নেড়ে বলে, "এ দাড়ির বয়স তোমার চেয়েও বেশী। আমি বরং এ বাড়ী ছাড়ব তবু এ দাড়ি ছাড়ব না। ছাড়লে আমার বিবি আমাকে ছাড়বে। যার দাড়ি নেই সে মরদ নয়।"

জুলি তখন ঠাকুরকে ডেকে বলে, "তোমার ঐ টিকি আর পৈতে দেখলে

মুসলমানদের মাথায় খুন চেপে যায়। টিকি আর পৈতে কি না রাখলেই নয়? টিকি পৈতে বড়ো না প্রাণ বড়ো? এইটেই আজকের দিনের জ্বলন্ত প্রশ্ন। এই দাঙ্গাকেই বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে হবে। জ্বলছে আগুন ধিকি ধিকি। এইবেলা দে পৈতে টিকি। বিদেশী কাপড় পুড়িয়েছি। স্বদেশী টিকি পৈতেও পোড়াব।"

ঠাকুর তো স্তম্ভিত। "এ কী বলছ, দিদি! এই পৈতে হাতে ধরেই আমরা ব্রাহ্মণরা যে ব্রহ্মশাপ দিই তাকে ভয় করে না এমন হিন্দু নেই। এটাই আমাদেরও ব্রহ্মাস্ত্র। আমরা কি আমাদের অস্ত্র তোমাদের মুখের কথায় সমর্পণ করতে পারি? আর আমাদের এই টিকি? এই শিখা? এই শিখায় বাঁধি বেলপাতা বা তুলসীপাতা। হাতে করে তো ঘুরে বেড়ানো যায় না। অভিশাপ যেমন দিই আশীর্বাদও তেমনি করি। এই শিখা থেকেই বেলপাতা বা তুলসীপাতা দিয়ে। অভিশাপ দেবার ক্ষমতা যার আছে আশীর্বাদ করার ক্ষমতাও তার আছে। তোমরা আমাদের ক্ষমতার দুটো দিকই বন্ধ করবে। আমরা কি এতই দুর্বল?"

জুলির মা সহাস্যে মন্তব্য করেন, "চিতাবাঘকে বললে সেও তার দাগ বদলাবে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে বললে সে তার পৈতে ফেলে দেবে না। তেমনি, মুসলমানকে বললে সে তার দাড়ি কামাবে না। আরবদেশ থেকে ফতোয়া এলে স্বয়ং কায়দে আজমও দাড়ি গজাতে শুরু করবেন, নাজিমউদ্দীনের তো কথাই নেই। সুহরাবর্দী একটু গাঁইগুঁই করতে পারেন, কিন্তু সেটাও সাময়িক। ব্রাহ্মণরা অবশ্য বাইরের অনুশাসনের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁদের অনুশাসন আসে সুদূরতম অতীত থেকে। যার পৈতে নেই তাকে কেউ ব্রাহ্মণ বলে মানতে চায় না। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে শূদ্ররাও দলে দলে পৈতে নিয়ে দ্বিজ হচ্ছে। অনেকে জানে না যে উপবীতটা ব্রাহ্মণদের একচেটে নয়। ক্ষত্রিয়রাও, বৈশ্যরাও উপবীতের অধিকারী। পার্সী পুরোহিত ও পাচকদেরও উপবীত থাকে। প্রাচীনকালে নারীদেরও ছিল। দেবীদের মূর্তিতেও উপবীত লক্ষ করা যায়। তোমরা দেশকে স্বাধীন করতে পারো, কিন্তু দেশাচার, লোকাচার বা কুলাচার বদলে দিতে পারবে না। হিন্দুদের বেলা আস্তে আস্তে বদলে দিতে পারো, মুসলমানদের বেলা একেবারেই না। ওদের প্রত্যেকের ভিতরে একটা প্রতিরোধের প্রাচীর। তাই ভারতের সমাজ শক, হূণ, কুষাণকে অঙ্গীভূত করতে পেরেছে, কিন্তু তুর্ক, মোগল, আরবকে

অঙ্গীভূত করতে পারেনি। উল্টে ওরাই হিন্দুদের একাংশকে ইসলামে দীক্ষা দিয়ে মুসলিম সমাজের অঙ্গীভূত করেছে। অঙ্গীভূত করা না করা নিয়ে এই যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বই হিন্দু মুসলিম বিরোধের মূলে। এর থেকেই জন্মেছে পাকিস্তানের কল্পনা ও দাবী। তার থেকে বেধেছে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বাধবে গৃহযুদ্ধ। যদি ইংরেজরা সত্যিই চলে যায়। আমার বিশ্বাস হয় না। এমন সোনার সাম্রাজ্য কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়? স্বাধীনতা যাকে ভাবছ সেটা কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন।"

জুলি তর্কে ভঙ্গ দেয়। তার পরবর্তী প্রোগ্রাম হয় বিয়াল্লিশ সালে যাঁরা তাকে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন সেইসব হিন্দু ও মুসলমানের বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া। তাঁরা কে কেমন আছেন, কেউ মার খেয়েছেন বা মরেছেন কি না, কেউ পালিয়েছেন ও ফিরেছেন কি না। তার মা তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, "তোর পক্ষে বেশী চলাফেরা সুবুদ্ধির কাজ হবে না। যেটিকে ধারণ করেছিস সেটির পক্ষে নিরাপদ নয়। সব সময় পরিচারিকাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবি।"

শরীর যতই ভারী হয়ে আসে জুলির চলাফেরাও ততই কমে আসে। তবু সে তার হিতকারীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে যায়। মোটের উপর ভালোই আছেন ওঁরা। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর মন বিষিয়ে যায়নি। তবে তাঁদের সকলের মনেই আশঙ্কা এই দাঙ্গাই শেষ দাঙ্গা নয়। সেটা আসন্ন না হলেও অবশ্যম্ভাবী। জিন্না তাঁর জেহাদ নামক শেষ অস্ত্র সংবরণ করবেন না। যদি না ইংরেজরা পাকিস্তান দিয়ে চলে যায়। জুলি কি বলতে পারে আবার গণ সত্যাগ্রহ ছাড়া তার মহান নেতার হাতে আর কী অস্ত্র আছে? থাকতেন যদি নেতাজী তা হলে তাঁর হাতে মারণাস্ত্র থাকত। নেতাজীর অভাবে জুলি ক্রমশ গান্ধীজীর দিকেই ঝুঁকেছে। সেটা তার স্বামীর সান্নিধ্যের জন্যেও বটে। সৌম্যর কাছে অহিংসা হচ্ছে মূলনীতি। জুলির কাছে পলিসি। এই পার্থক্যটুকু বাদ দিলে ওরা এখন এক লক্ষ্যে এক নেতৃত্বাধীন। তবে সে আর সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবে না, যদি বাপু আবার সংগ্রামের ডাক দেন। তাকে তার মাতৃকর্তব্য পালন করতে হবে।

তার মেজদি একদিন স্বামীর সঙ্গে খোঁজখবর নিতে আসেন। জানতে চান ক'মাসের। কবে প্রত্যাশা করছে। কী কী বন্দোবস্ত হচ্ছে। তাঁর স্বামী ভূতপূর্ব স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল। কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "চার বছর আগে তুমি

যে কলকাতা দেখেছিলে এ কলকাতা সে কলকাতা নয়। কিছু লক্ষ করেছ ?"

"কই, না তো।" জুলি তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেনি।

"চারবছর আগে ইংরেজ আর মার্কিন সৈন্যরা কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় দুরন্ত বেগে গাড়ী চালিয়ে সব কুকুর সাফ করে দেয়। কুকুরবংশ নির্মূল। তাদের মধ্যে উঁচু জাতের বিলিতী কুকুরও ছিল। বুড়ো হয়ে গেছে বলে বেচারিদের বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল তাদের দেশী মালিকরা। সাহেব মালিকরা তা না করে গুলী করে মেরেছিল। তোমার দিদি দয়া করে দু'তিনটিকে ঘরে এনে বাঁচায়। তুমি তো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। নইলে তুমিও আরো কয়েকটিকে বাঁচাতে। এক বছর বাদে দেখা গেল মানুষ মরছে কাতারে কাতারে। খিদের জ্বালায় পড়ে আছে প্রকাশ্য রাজপথে। সে দৃশ্য তোমাকে দেখতে হয়নি। তুমি তখন জেলে। বাইরে থাকলে কয়েকজনকে বাঁচাতে। আমরা আর কতটুকু করতে পারি! লঙ্গরখানা খুলে সেবাকার্য করেছিলুম। এবার কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অকর্মক। তুমি থাকলে কী করতে জানিনে।" জামাইবাবু বলেন।

"কেন, কী হয়েছিল এবার ?" জুলি বুঝতে পারে না।

"এবার কলকাতার যেখানে যত ভিখিরি ছিল সব সাফ হয়ে গেছে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাবাজরা কানা, খোঁড়া, নুলো, কুষ্ঠরোগী কাউকেই রেহাই দেয়নি। পিটিয়েছে, খুঁচিয়েছে, কুপিয়েছে, পুড়িয়েছে, গঙ্গায় ভাসিয়েছে বা ডুবিয়েছে। ইংরেজ মার্কিনের কৃপায় পথঘাট হয়েছিল নিষ্কুকুর। হিন্দু মুসলমানের মেহেরবানীতে হলো নির্ভিক্ষুক। কোথাও কোথাও নিষ্ফিরিওয়ালা। পরশুরাম যেমন পৃথিবীতে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন তেমনি আর কী? এর পরের দৃশ্য বোধহয় নির্ধনিক ও নির্জমিদার করা। কমিউনিস্টরা ওৎ পেতে বসে আছে। কবে আবার দাঙ্গা বাধবে। তেমন একটা কভার না পেলে ওরা আসরে নামবে না।" কৌসুলীর উক্তি।

"আপনি মনে করেন এটা কমিউনিজমের দিকে মোড় নেবে ?" জুলি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়। বাবলীরাই ঘোলা জলে মাছ ধরবে।

"আমার প্রিয় শালী, তুমি কোন্ স্বর্গে বাস করছ ? তুমি কি ধরে নিয়েছ দেশের অবস্থা এখনো গান্ধীজীর নিয়ন্ত্রণে ? না, এখন কারো নিয়ন্ত্রণে নয়। না গান্ধীর, না জিন্নার, না ওয়েভেলের, না বারোজের। তবে সর্বত্র

কোয়ালিশন হলে, সবাই সবাইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করলে এখনো সিচুয়েশন সামলানো যায়।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

"কাউনসেল অভ্ ডেস্‌পেয়ার।" মিসেস সিন্‌হা কণ্ঠক্ষেপ করেন।

জুলির মাসিমা সেখানে ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেন, "আমরা ধনিকও নই, জমিদারও নই, আমরা বাঁচব তো?"

"মনে হয় বাঁচবেন। তবে তিনজন মানুষের জন্যে ছ'জন দাসদাসী রাখতে পারবেন না। বাড়ীটাও শেয়ার করতে হবে বাইরের লোকের সঙ্গে। পানভোজনও।" ব্যারিস্টার সাহেব অন্য অর্থে পানভোজন করেন।

মাস দেড়েক বাদে সৌম্য বিহার থেকে ফেরে। তার মুখ অন্ধকার। জুলি উৎকণ্ঠিত হয়ে সুধায়, "কী দেখে এলে? কেমন দেখে এলে।"

"অবস্থা শান্ত। সেটা যেন ঝড়ের আগের ঠাণ্ডা। ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে তার রক্তের ছাপ আর ধ্বংসের ছাপ দেখে এলুম। কয়েকটি বন্দিনীকে মুক্ত করতে পারলুম, মুক্ত হয়েছে যারা তাদের দেখে এলুম, কিন্তু কয়েকটি এখনো আটক হয়ে রয়েছে। তারা হস্‌টেজ বা জামিন।" সৌম্য কাতর স্বরে উত্তর দেয়।

জুলি স্তম্ভিত হয়। "এ কি সত্যি? বিহারে, কংগ্রেস শাসনে?"

"বিয়াল্লিশ সালে আমরা ওদের যা শিখিয়েছি তাই ওরা প্রয়োগ করেছে। যাদের বিরুদ্ধে তারা মুসলমান। বিশেষত ধনী মুসলমান। নোয়াখালীতেও একই প্যাটার্ন। হিন্দু, বিশেষত ধনী হিন্দু। সব চেয়ে যেটা খারাপ লাগে সেটা নারীকে এর মধ্যে টেনে আনা। যেমন নোয়াখালীতে তেমনি বিহারে। তবে মাত্রার তারতম্য আছে।" সৌম্য বিমর্ষভাবে বলে।

"মাত্রাটা বড়ো কথা নয়। লঘুত্ব ও গুরুত্বই বড়ো কথা। শুধু কি অপহরণ না তার পরে ধর্ষণ?" জুলি উৎকণ্ঠিত হয়ে জেরা করে।

"সেটা আমি বলতে পারব না। মহিলারা কেউ সে রকম অভিযোগ করছেন না। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও সম্মত নন। ভবিষ্যতের কথা তো চিন্তা করতে হবে। সন্দেহভাজন আসামীদের ধরপাকড় করা হয়েছে ঢের। কিন্তু আদালতের বিচারে ক'জনের সাজা হবে? আর কোন্ অপরাধে? হরণের না ধর্ষণের? তাই সরকারী মহলও চিন্তিত।"

জুলি বলে, "আমিও যেতুম, দেখতুম, উদ্ধার করতুম, দণ্ডদানের ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু কী করব? দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে আমি এখন অপারগ।

আচ্ছা, আশ্রমে ফিরে যাবার আগে একটা সামাজিক কর্তব্য সেরে যাও দেখি। নিয়ে চল আমাকে স্বপনদার ওখানে। তাঁর নাকি হাত পা কাঁপছে। সেই দাঙ্গার সময় থেকে। আমার যাওয়া উচিত ছিল আরো আগে। যাইনি, নানান জায়গায় যেতে হয়েছিল। তা ছাড়া তোমার প্রতীক্ষায় ছিলুম।"

সেইদিনই দু'জনে স্বপনদার নতুন ঠিকানায় যায়। বৌদি দরজা খুলে দেন। চেঁচিয়ে বলেন, "কারা এসেছে জানো? জুলি আর তার বর।"

জুলির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে জুড়ে দেন, "আরো একটি মানুষ, যার মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

স্বপনদা উঠে এসে জুলিকে আলিঙ্গন করেন। সৌম্যর দুই কাঁধ ধরে কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁকানি দেন। ক্যারামেল অনেকদিন থেকেই মজুত রয়েছিল। জুলিকে দিয়ে বলেন, "আমার প্রিয় বোন ক্যারামেল! আমার প্রিয় বোনটি! একটু যেন মোটাসোটা মনে হচ্ছে। পূব বাংলায় খাঁটি দুধ ঘি ননী মাখন খেয়ে।"

দীপকাদি উচ্চ হাস্য করে বলেন, "কলকাতার ভেজাল দুধ ঘি খেয়েও তেমনি মোটাসোটা হতো। এটা আরেকজনকে বহন করছে বলে।"

স্বপনদা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, "ওঃ তাই নাকি! সুসংবাদ। শুভসংবাদ। সেলিব্রেট করা উচিত। বাড়ীতে কী আছে বার করো। দু'জনের জন্যে।"

বৌদি জুলিকে টেনে নিয়ে অন্য ঘরে যান। কথা হয় চুপি চুপি।

"তারপর, মহাত্মা চৌধুরী! সেকালে এক ঋষি অপর ঋষিকে জিজ্ঞাসা করতেন, অপি তপো বর্ধতে? আমি ঋষি নই, তুমি ঋষি। আমারও সেই জিজ্ঞাসা। বলি, তুমি কিসের তপস্যায় মগ্ন? ফল কী পাচ্ছ?"

"আমাদের এখন মহাসঙ্কট। আমরা জানতুম আমরা ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনো সফল হব না, তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম পালটে দিয়ে অহিংস উপায় অবলম্বন করি। তাতে বহুদূর সফলও হই। এখন ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে বল কষাকষি হচ্ছে না, বোধহয় আর তার দরকারও হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিম লীগের সঙ্গে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা এখন আদৌ নামব কি না। নামলে ওদের চেয়েও নির্মম, ওদের চেয়েও বর্বর, ওদের চেয়েও ব্রুটাল হতে হবে। নয়তো সফল হব কী করে? কতক হিন্দু আমাদের নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজেরাই ইতিমধ্যে কলকাতায় ও বিহারে হিংসার মোকাবিলা করেছে প্রতিহিংসায় অথবা অতিহিংসায়। কলকাতায় সমান

হিংস্র, বিহারে অধিকতর হিংস্র। রোগের চেয়ে রোগের প্রতিকার আরো ভয়ঙ্কর। জবাহরলাল তো আসুরিক চিকিৎসা করতে উদ্যত। বিহারের দাঙ্গাবাজদের উপর বোমাবর্ষণ। আমরা যারা অহিংস উপায়ে বিশ্বাসী তাদের কাছে এর চেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ আর আসেনি। আমাদের হাতে কোনো তৈরি দাওয়াই নেই। ওষুধ বানিয়ে নিতে হবে। বাপু সেই চেষ্টায় আছেন। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে কি আমরা দাঙ্গাবাজদের সম্মুখীন হতে পারব? ফলাফল ভগবানের হাতে। সেই পরিমাণ মানবপ্রেম তথা ভগবদ্‌বিশ্বাস কি আমাদের আছে? আমরাই বা আর ক'জন! অতিক্ষুদ্র গান্ধী পরিবার। দেশময় অনর্থ হলে দেশময় ছুটোছুটি করা অসম্ভব।" সৌম্য দম নেয়।

স্বপনদা বলেন, "বলো, আর কী বলতে চাও।"

"তারপর শেষ কথাটা কী? মুসলিম লীগের অন্তঃপরিবর্তন হবে, সে আর লড়তে চাইবে না। অস্ত্র সমর্পণ করবে। ভারত অখণ্ড থাকবে। স্বাধীনও হবে। তার পরেও তো প্রশ্ন উঠবে, অতঃ কিম্? সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র তো বলপ্রয়োগে হয় না, ভোটপ্রয়োগে হতে পারে। জিন্না বলেছেন ক্রুট মেজরিটির কাছে তিনি নত হবেন না। আমরা যেমন বলেছি ক্রুট ফোর্সের কাছে আমরা নত হব না। সব মুসলমান যদি এককাট্টা হয়ে পাকিস্তান চায়, সব হিন্দু যদি এককাট্টা হয়ে তাতে নারাজ হয় তা হলে সর্বসম্মত সমাধান তো হবেই না, ভোটের জোরে যেটা হবে সেটা অপর পক্ষ মেনে নেবে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। সে বিদ্রোহ অহিংস আকারও নিতে পারে। তা হলেও অহিংসা এক্ষেত্রে নিয়ামক নয়। সত্যই নিয়ামক। মুসলমানদের অমতে তাদের উপর আইন কানুন চাপিয়ে দেবার কী অধিকার আছে হিন্দুদের? সত্য কার দিকে? সত্যটা কী? ভারতীয়রা কী এক নেশন না দুই নেশন না বহু নেশন? ইংরেজরা ছত্রপতি না হলে ভারতবর্ষ তো ছত্রভঙ্গ অবস্থাতেই থাকত। যতবার তাকে একচ্ছত্র শাসনে আনা গেছে ততবার বাহুবলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমরাও সে পন্থা অবলম্বন করতে পারি। কিন্তু মহাপুরুষ যীশু বলে গেছেন, সমগ্র জগৎ যদি তুমি লাভ কর অথচ নিজের আত্মাকেই হারাও তবে তোমার কতটুকু লাভ হলো? আত্মার বিনিময়ে আমরা সমগ্র ভারত জয় করতে চাইনে। সর্বসম্মতিক্রমে যে অংশ আমাদের সেই অংশই আমাদের। সমগ্র ভারত কি কেবল হিন্দু মেজরিটির জন্যে? মুসলিম মাইনরিটির জন্যেও নয়? তাদের জন্যেও যদি হয়ে থাকে তবে তারা ভোট

দিয়ে সেকথা বলুক। তারা আদৌ ধরাছোঁওয়াই দিচ্ছে না। কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বয়কট করেছে। ইন্টারিম গভর্নমেণ্টে এসেছে সেটাকে ভিতর থেকে বানচাল করতে। নোয়াখালীতে বাপু এমন বাধার মুখোমুখি হচ্ছেন যে রাতের মাঝখানে থেকে থেকে কেঁদে উঠছেন, "এখন আমি কী করি?" আমারও তো একই দশা। মুসলমানরা ইংরেজদের মতো বিদেশী নয়, তবু একদল এখন এই হাজার বছর পরেও বিদেশী হবে বলে জেদ ধরেছে। সেই বিদেশের নাম পাকিস্তান। তারা একদা বিজেতা ছিল বলে এখন আবার বিজেতা হতে চায়। তাই হাঁক ছাড়ছে, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' বিধর্মী তারা আগেও ছিল, এখনো রয়েছে। মাঝখানে একটা সেতু গড়ে উঠেছিল। নানক, কবির, দাদু, রজ্জব, চৈতন্যের প্রেমের সেতু। সেটা ভেঙে চুরমার করেছে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তথা প্যান-ইসলামিজম। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আবার গড়ে তুলতে পারিনি। মাঝখানে দুই সম্প্রদায়কে এক করেছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ভাষা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় আছে, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের মনের মিল পল্লী অঞ্চলে এখনো কতকটা আছে, কিন্তু এইসব দাঙ্গাহাঙ্গামার ঢেউ সেখানেও পৌঁছেছে। গ্রামগুলোও যদি যুদ্ধক্ষেত্র হয় তবেই আমরা গেছি। যুদ্ধে জিতেও যুধিষ্ঠির মহারাজ সিংহাসন ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথ ধরেন। আমাদের বাপুরও সেই পরিণাম না হয়।" সৌম্য কাতর কণ্ঠে বলে।

স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দেন। "মুসলিম লীগ মুখে যাই বলুক না কেন সে আমাদের পর নয়, আপন শরিক। এটা শরিকানা মামলা। চলছে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতম আদালতে। রায় দেবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট অ্যাটলী। সেবার যেমন দিয়েছিলেন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। রায়টা যে পুরোপুরি মুসলিম লীগের পক্ষেই যাবে এমন কথা ধরে নেবার কারণ নেই। কংগ্রেস ইংরেজকে জ্বালিয়েছে এর জন্যে ওরা তাকে সাজা দেবে তেমন জাতই ওরা নয়। ওরা অতীত দেখে কাজ করে না, ভবিষ্যৎ দেখে করে। ভবিষ্যতে কে তাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করবে, কে তাদের শিবিরে যোগ দিয়ে লড়বে, এইসব চিন্তা করেই তারা কাজ করে। তুমি আমার কথা বাপুকে জানাবে। তিনি যেন ইংরেজদের উপর বিশ্বাস না হারান। তারা মহৎ বলেই মহত্তের মর্যাদা বোঝে। জিন্নাকে অবশ্য ডুবিয়ে দিয়ে যাবে না। মুসলমানদের কাছে

তারা বহুভাবে ঋণী। ভবিষ্যতেও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার দরকার হবে। পারস্য উপসাগরের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে। ইরাক, ইরান, আরব উপকূলের তৈল আহরণ করতে। ইউনিটি অভ্‌ ইণ্ডিয়া ইজ আ লস্ট কজ্‌। তার জন্যে আমি চোখের জল ফেলিনে। আমার চোখের জল বাঙালীর জন্যে, বাংলার জন্যে। যা দেখছি যা শুনছি তা আমার হাতে পায়ে কাঁপুনি ধরিয়েছে। একটা নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছি। ভালচারাইজেশন।"

সৌম্য শিউরে ওঠে। বলে, "ভুলে যান, স্বপনদা, ওই দুঃস্বপ্ন।"

"ক্ষমা করতে পারি। ভুলতে পারিনে, সৌম্য।" স্বপনদা বলেন।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় বৌদি ঢুকেছিলেন জুলিকে নিয়ে। তিনি কথা কেড়ে নিয়ে বীরদর্পে বলে ওঠেন, "মেরি কলকত্তা নেহি ছুঁগী।"

জুলি তো অবাক। "সে কী, বৌদি, তুমি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে দেবে?"

"গৃহযুদ্ধ এড়াতে। দেখছ না একটা দাঙ্গাতেই তোমার দাদার কী হাল হয়েছে। গৃহযুদ্ধ বাধলে সর্বাঙ্গ কাঁপবে।" দীপিকাদি আশঙ্কা করেন।

॥ চার ॥

ষোল বছর পরে যূথিকার মা তাকে চিঠি লিখেছেন। অবিশ্বাস্য ঘটনা। অঘটন আজও ঘটে। যূথিকা একনিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করে ও মানসের দিকে বাড়িয়ে দেয়। একটি কথাও বলে না। মা লিখেছেন—

"সাবিত্রীসমানেষু,

প্রিয় শেলী,

খবরের কাগজে দেখিলাম তোমাদের ওদিকে নোয়াখালী নামে একটা জায়গায় কী সব ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। তোমরা নিরাপদে আছ তো? আমাদের নিরাপত্তার জন্য তোমরা যেমন চিন্তিত ছিলে তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আমরাও তেমনি চিন্তিত জানিবে। সেবার তোমাদের সাহায্যেই আমরা রক্ষা পাইলাম। ষোলই, সতেরোই আগস্ট আমরা গৃহবন্দী। চারদিকে 'আল্লা হো আকবর' ও 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' চিৎকার। ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া আমরা দুইদিন লুকাইয়া থাকি। টেলিফোন করিয়া কাহাকেও পাই না। গাড়ী বাহির করিতেও সাহস হয় না। পথেই কাটা পড়িব।

এমন অবস্থায় পুলিশ থেকে একজন গোরা সার্জেন্ট আসিয়া জানিতে চাহিল আমরা কি এখানেই থাকিতে ইচ্ছা করি না অন্য কোনো পাড়ায় চলিয়া যাইতে চাহি। অন্যত্র যাইতে চাহিলে পুলিশ সঙ্গে যাইবে। আমরা জানিতে চাহিলাম, আপনারা খবর পাইলেন কাহার কাছে? তিনি বলিলেন, পুলিশ ওয়্যারলেসে আপনার কন্যা ও জামাতার তরফ হইতে খোঁজ লইতে বলিয়াছেন তাঁহাদের জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব। আমরা তো হাতে স্বর্গ পাইলাম। সেইদিনই চলিয়া গেলাম হেস্টিংসে। এক ইউরোপীয় বন্ধুর বাড়ী। তাঁহার সহায়তায় সেই পাড়াতেই একটা খালি ফ্ল্যাট পাইলাম। কেয়ারটেকার ফ্ল্যাট। যাঁহাদের ফ্ল্যাট তাঁহারা ফিরিলেই আবার সরিতে হইল। এবার চেতলায় এক আত্মীয়ের বাড়ী। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে স্বস্থানে ফিরিয়াছি। তোমাকে চিঠি লিখিব লিখিব করিয়া লেখা হয় নাই। বিশ্রাম পাই নাই বলিলে মিথ্যা হইবে না, কিন্তু পুরোপুরি সত্যও হইবে না। আসল কারণ সঙ্কোচ। তোমার সঙ্গে ষোল বৎসর পত্র ব্যবহার নাই। তোমাকে লিখিলে তুমি কী মনে করিবে!

শেলী, আমরা এই ষোল বৎসরে অনেক জায়গায় বাস করিলাম। সিমলার চাকরির মেয়াদ ফুরাইলে লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে এক জাহাজে গেলাম ইংলণ্ডে। চেলটেনহামে ইংরেজ পেনসনারদের সঙ্গে আমরাও বসতি করিলাম। কিন্তু মুখপোড়া হিটলার যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। আক্রমণের ভয়ে আমরা পলাইয়া আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়া বাড়ীটা কিনিলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই! জাপানী বোমার ভয়ে চলিলাম আবার সিমলায়। যুদ্ধের পরে কলিকাতা ফিরিলাম শান্তির আশায়। কিন্তু কোথায় শান্তি! দাঙ্গাহাঙ্গামায় শহর বিপর্যস্ত। তোমাকে আর যাহা বলিবার ছিল তাহা শুনিলে তুমি বলিবে, বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। হ্যাঁ, মা শেলী, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। তোমার দাদা কলিকাতায় থাকিয়াও খোঁজ লয় না আমরা জীবিত না মৃত। তোমার ছোটভাই তার শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, তবে তার ফ্ল্যাটের জন্য ভাড়া দেয়। সে কালেভদ্রে দেখা করিতে আসে। শুনিয়া থাকিবে তোমার দাদা মেম বিবাহ করিয়া স্বেচ্ছায় সমাজচ্যুত হইয়াছেন। তোমার বাবা তাই তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহার পুত্র হইলে সে তো পিণ্ডাধিকারী হইতে পারিবে না, আমরা তবে পরলোকে কাহার হাতে পিণ্ড পাইব? তোমার বাবা বলিতে

আরম্ভ করিলেন যে তোমার ছোট ভাইই তাঁহার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি নিজেই সম্বন্ধ করিয়া স্বসমাজে তাহার বিবাহ দিলেন। বধূমাতা বড়লোকের কন্যা। কিন্তু সে আমাদের মতো মাঝারি অবস্থার লোকের ঘরে থাকিল না, চলিয়া গেল তাহার পিতৃগৃহে। দুঃখের বিষয় তাহার স্বামী ও পুত্রকেও লইয়া গেল।

এখন আমরা শুনিতেছি ইংরেজরা এ দেশ ছাড়িয়া চিরবিদায় লইতেছে। আমাদের মতো রাজভক্ত প্রজাদের ভাসাইয়া দিয়া যাইতেছে। মুসলিম লীগ শাসাইতেছে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিবে। তাহা হইলে আমরা ইহলোকেই বা কী খাইব? পেনসনের টাকায় কি আজকাল সংসার চলে? তাহা হইতে বড় কথা জমিদারি যদি না থাকিল তবে কী থাকিল যে তোমার দাদাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হইল ও উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল? আর তোমার ছোট ভাইকেও এমন কী দেওয়া হইল যে সে আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আমাদের দিকে তাকাইবে? এ সংসারে সব সম্পর্কই সম্পত্তিভিত্তিক। যতই দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি এ সংসারে কেহ কাহারও নহে। মায়ার সংসার। তোমার বাবা এখন দেশের মায়া কাটাইয়া দিয়া আবার বিলাতে চলিয়া যাইবার জন্য তৈরি হইতেছেন। যুদ্ধ শেষ। বিলাত নিরাপদ। তাহা হইলে কেন এদেশে পড়িয়া থাকা? দেশ স্বাধীন হইলে কংগ্রেস কি আমাদের মান রাখিবে? শুনিতেছি বিলাতী উপাধিগুলো কাঁচিয়া যাইবে। ও বি ই বলিয়া কেহ চিনিবে না, মানিবে না। যাক, এসব কথা লিখিয়া তোমাকে 'বোর' করিতে চাহি না। তুমি তোমার সংসার লইয়া আনন্দেই আছ। আনন্দেই থাক। তোমাদের সবাইকে আমাদের শুভকামনা। ইতি তোমার অভাগিনী মা।"

পড়তে পড়তে যূথিকার চোখ ছল ছল করে। আবেগে তার বাগ্‌রোধ হয়। মানসও নীরব থাকে।

"অভিজাত পরিবার!" যূথিকা চোখ মুছে বলে। "ভাঙবে, তবু মচকাবে না!"

"এবা.. তো বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। তুমি উত্তর দেবে তো?" মানস বলে।

'দেবার কী আছে? ত্যাজ্য কন্যা যাকে করেছেন তাকে আশীর্বাদ পর্যন্ত করেননি। ইঙ্গিতও করেছেন যে সম্পর্কটা সম্পত্তিভিত্তিক। যেন আমিও খোঁজ

নিয়েছি সম্পত্তির আশায়। উনি স্বীকার না করলে কী হবে, সম্পত্তি ওঁর প্রচুর জমেছে। জমিদারি উঠে গেলেও অর্থাভাব হবে না। অভাগিনী যদি নিজেকে মনে করেন তবে তা অর্থাভাবে নয়, ভালোবাসায় অভাবে। অমন মাকে কে ভালোবাসতে যাবে, বলো? বাবার জন্যেই আমি বেশী দুঃখিত। এখন সে রামও থাকছে না, সে অযোধ্যাও থাকছে না। কেউ তাঁকে চিনছেও না, সেলাম ঠুকছেও না। সেসব উর্দিপরা চাকর বাকরও নেই। মানী লোকের মাথা হেঁট। অন্দরেও খাণ্ডার গৃহিণী।"

যূথিকার মনের অবস্থা অনুমান করে মানস আর কথা বাড়ায় না। কোমল স্বরে বলে, "প্রিয়ে শেলী! তোমার ডাকনাম যে শেলী একথা তো তুমি একবারও আমার কাছে প্রকাশ করনি। করলে তো আমি তোমাকে জুঁই বলে ডাকতুম না, শেলী বলেই ডাকতুম। কী মিষ্টি নাম শেলী! শেলী আমার প্রিয় কবি।"

"ও নাম বরাবরের মতো তেতো হয়ে গেছে। ও নামে ডাকলে আমার মনে পড়ে যায় তোমার অপমান আর আমার বহিষ্কার। পড়লে তো চিঠিখানা, কোথাও কি দেখলে এতটুকু দুঃখপ্রকাশ! ওই যে বলেছি, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। আমি ওঁদের ধনও চাইনে, সম্পত্তিও চাইনে, চাই শুধু একটু স্নেহ, একটু মমতা। যেটা মানুষের সহজাত। পশুর মধ্যেও যা দেখা যায়। যাক, তবু এতকাল পরে মনে পড়েছে যে আমি বেঁচে আছি। আর আমিও হয়তো নিরাপদ নই। এটা আমারই ওয়্যারলেসে মেসেজের পাল্টা মেসেজ। স্বতঃ উৎসারিত নয়।" যূথিকা ক্ষুব্ধ স্বরে বলে যায়।

"ভাই শেলী, আমি কিন্তু আনন্দিত। তোমার জননী 'তোমাদের' ও 'তোমরা' লিখে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী ও সন্তানদেরও স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভালোবাসা পাই না পাই, স্বীকৃতি তো পেয়েছি। এই বা কম কী!" মানস গদগদ ভাবে বলে।

"ওটা সাধারণ শিষ্টাচার। ওর মধ্যে স্বীকৃতির নামগন্ধ নেই। স্বীকৃতির জন্যে তুমি এমন কাঙাল কেন? আর কেউ না করুক আমি তো তোমাকে স্বীকার করে নিয়েছি। স্বীকৃতি একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। সার কথা হলো সেই প্রেম, ভালোবাসা। আমার ছেলেমেয়েরা তাদের দাদামশায় ও দিদিমার স্নেহ পাচ্ছে না, তাদের মামা মামীদেরও না। তাদের খেলার সাথী ও পড়ার সাথীদের সঙ্গে এইখানেই তফাৎ। এতদিন এটা তাদের খেয়াল

হয়নি, এখন স্কুলে গিয়ে হৃদয়ঙ্গম করছে। যতদিন পেরেছি ভুলিয়ে রেখেছি। আর পারছিনে। ওঁদের দিক থেকে এটা নিষ্ঠুরতা। কবে এটা তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করবেন? এই চিঠিতে ওঁদের অন্তঃপরিবর্তনের লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তুমিও নিশ্চয়ই অনুভব করছ যে তোমার সহযোগীদের শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন, শালা আছে, শালী আছে। তোমার শ্বশুর শাশুড়ী ও শালা থাকলেও না থাকার সামিল। শালী অবশ্য কোনোদিন ছিল না।" যূথিকা আক্ষেপ করে।

মানসের হাসি পায়। "শেলী যত মিষ্টি শালী তার চেয়ে কম মিষ্টি নয়। যদি বলি আরো বেশী তুমি ক্ষেপে যাবে।"

"তা হলে তুমি এক কাজ করো। আমাকেই শালী বলে ডাকো। কিন্তু ছেলেমেয়ের সামনে না।" যূথিকা অভিমান করে।

মানস জিব কেটে বলে, "ছি! বৌকে শালী বলে ডাকব! তা হলে তো শালীকেও বৌ বলে ডাকতে হয়। শালী নেই, ভালোই হয়েছে। শেষকালে কাকে কী বলতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়তুম।"

যূথিকা কিছুদিন পরে নিজেই চিঠির জবাব দেয়। মানসকে দেখায়। চিঠিতে ছিল—

"প্রিয় মা,

তোমার চিঠির জন্যে আমাদের ধন্যবাদ। আমরা এখনপর্যন্ত নিরাপদ। কিন্তু কখন কী ঘটে বলা যায় না। তোমরা বিপদ দেখলে পালিয়ে যেতে পারো, আমাদের কি পালানোর জো আছে? ওর ডিউটি, ও পালাতে পারে না। জজ না থাকলে জেলা অরাজক হবে। ওকে রেখে আমরাই বা পালাই কী করে? আমরা কি তেমন নিষ্ঠুর? তা ছাড়া আমাদের এই জেলার চারদিকে নদী নালা জঙ্গল পাহাড়। রেল লাইন যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যদি জাহাজ না চলে, ট্রেন বিপদের মুখে নিয়ে যায়, মোটরও কিছুদূর গিয়ে আর পথ পাবে না। তা হলে আমাদের কী দশা হবে তা আন্দাজ করতে পারো। আমরা আগুনের ভিতরে থেকেই নিরাপত্তার অন্বেষণ করব। রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে? আমরা ধর্মকর্ম কিছুই করিনে। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করি। আর তাঁর প্রতিরূপ মানুষেও।

আমাদের প্রণাম জেনো তোমরা। ইতি। তোমার—

ত্যাজ্যকন্যা শেলী

এবার মানসের চোখের কোণে জল দেখা দেয়। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলে, "ত্যাজ্যকন্যাটা কেটে দাও। কী দরকার খোঁচা দেওয়ার? এ যেন কাঁকড়াবিছের ল্যাজেই কামড়।"

যূথিকা ওটা কেটে দিয়ে ওর জায়গায় লেখে, "মৃতকন্যা"।

তা দেখে মানস শিউরে ওঠে, "সর্বনাশ! সতীর দেহত্যাগ শিবের জীবনেও অভিসম্পাত।"

"ওঁরাই তো বলেছিলেন আমি ওদের চোখে মৃত।" যূথিকা স্মরণ করে।

"সেটা রাগের মাথায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া কথা। ওসব ধরতে নেই। ভুলে যাও আর ক্ষমা করো।" মানস তার শাশুড়ীর হয়ে বলে।

"ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়।" যূথিকা ঘাড় নাড়ে। যা হোক শেষপর্যন্ত লেখে, "পতিব্রতা কন্যা শেলী।"

মানসের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "তোমার জন্যে আমি কিছুই ত্যাগ করিনি। আমার জন্যে তুমি কত কী ত্যাগ করলে।"

যূথিকা স্নিগ্ধ স্বরে বলে, "প্রেমের জন্যে ত্যাগ তো চিরকাল নারীরাই করে। পুরুষেরা কবে করেছে? একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় চণ্ডিদাস। হয়তো ওদেশের সাহিত্যে ওরকম কয়েকটি ব্যক্তিও পাওয়া যাবে। আর পারস্যের সাহিত্যে। লায়লা আর মজনু।"

"অত দূর যেতে হবে কেন? এই তো সেদিন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের জন্যে সিংহাসনত্যাগ করলেন। পুরুষরাও পারে, তবে নারীদের মতো অত বেশী নয়।" মানস আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করে।

এর পর নিরাপত্তার প্রসঙ্গ আবার ওঠে। যূথিকা সুধায়, "তোমাদের বিপদে আপদে একটা র‍্যালিং পয়েণ্ট স্কীম আছে না?"

"আছে বইকি। পুলিশবেষ্টিত হয়ে এক নিরাপদ কেন্দ্রে সবাইকে বাস করতে হবে। আমার প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবে না। স্বাধীনতা বলতেও না। পরে আমি পুলিশের বিরুদ্ধে একটি লাইনও লিখতে পারব না।" মানস বলে।

"সাধে কি ইংরেজরা পুলিশকে এত তোয়াজ করে?" যূথিকা টিপ্পনী কাটে।

"গরজ বড়ো বালাই। এই যে আমি পুলিশ ওয়্যারলেসের সাহায্যে

আমার শ্বশুর শাশুড়ীর খোঁজ নিলুম এটা কি আমারও শক্ত হাতকে কম শক্ত করবে না? ও রকম একটা পরিস্থিতিতে ও ছাড়া আর গতি ছিল না। তেমনি আরো একবার হয়তো সাহায্য নিতে হবে, যদি র‍্যালিং পয়েন্টে আশ্রয় নিয়েও স্বস্তি না থাকে। শুধু আমাদের নয়, অফিসার সকলেরই। ওয়্যারলেস করে চেয়ে পাঠাতে হবে হেলিকপ্টার।" মানস ফাঁস করে।

"হেলিকপ্টার? সে আবার কী?" যুথিকা অবাক।

"যুদ্ধের সময় তার উদ্ভাবন হয়েছে। এরোপ্লেন যেখানে নামতে পারে না অবতরণভূমির অভাবে, হেলিকপ্টার সেখানে নামতে পারে। ছেলেদের খেলার মাঠও তার নামার পক্ষে যথেষ্ট। খেলার মাঠ থেকে আমরা ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব, যদি হেলিকপ্টার আনিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সেটা এত গোপনে যে কাকপক্ষীও টের পাবে না। টের পেলে হেলিকপ্টারকে গুলী করে অচল করবে। অগত্যা পাল্টা গুলী চালাতে হবে।" মানস চোখ বোজে।

যূথিকা বিশ্বাস করতে পারে না যে পরিস্থিতি ততদূর ভয়াবহ হবে। বলে, "মানুষ মরে ভয়ে। আমরা ভয় করব না। বিপদের সম্মুখীন হব। তবে ছেলেমেয়েদের আগে থেকে আর কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। শুধু প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, ওসব ভীষণ কাণ্ডকারখানা যেন ওদের কোমল মনের উপর ছায়াপাত না করতে পারে। আশা করি তার দরকার হবে না। কেনই বা হবে, যদি ক্ষমতার হস্তান্তর সময় থাকতে হয় ও নির্বিবাদে হয়!"

"নির্বিবাদে হবে না, শেলী। সময় থাকতে হলেও হতে পারে। ইংরেজদের যদি ভারতের উপর পিছুটান না থাকে। ওয়েভেল কেবলি ওয়েভার করছেন। সেদিন পাকড়াশী এসেছিল টুরে। ক্লাবে দেখা হলো। বলেছিল সময় পেলে বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গেও দেখা করে যাবে। সময় পায়নি মনে হচ্ছে। যাই হোক, সে তো ভিতরের খবর রাখে। সে যা কানে কানে বলে গেল তা কল্পনাকেও পরাস্ত করে।" মানস যুথিকার আরো কাছে সরে আসে।

"আমারও কি শোনা উচিত?" যুথিকা বিব্রত বোধ করে।

"আমারও কি বলা উচিত? তবে তোমাকে না বলে পারিনে। জানি তুমি চাপা মেয়ে। চেপেই রাখবে।" মানস কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়।

"তা হলে বলো কী শুনেছ।" যুথিকা কান পাতে।

"ওয়েভেল প্রাণ ধরে কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী রেখে যাবেন না।

লীগকে একমাত্র উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া তো প্রশ্নের বাইরে। একাধিক উত্তরাধিকারী রেখে যেতে হলে ভারত ভাগ করতে হয়। আর্মি ভাগ করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগকেও ভাগ করতে হয়। তাঁর একক দায়িত্বে তিনি একাজ করতে পারেন না। কংগ্রেসের রাজিনামা চাই। কংগ্রেস রাজি হবে কেন? কাজটা তো লীগের স্বার্থে। পরোক্ষে ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থে। অথচ কংগ্রেস যদি অকস্মাৎ পদত্যাগ করে আবার সেই কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন বাধিয়ে দেয় তবে সেটাকে দমন করাও আগের বারের মতো সহজসাধ্য হবে না।" মানস থেমে যায়।

'তা হলে তিনি কী করবেন?" যূথিকার কৌতূহল আরো বাড়ে।

মানস কী বলবে, কতটুকু বলবে, কেমন করে বলবে ভাবতে সময় নেয়। তারপর বলেই ফেলে, "গ্যাখ, এসব জল্পনা কল্পনা এখনো পাকা হয়নি, তাই একে প্ল্যান বা স্কীম মনে করলে ভুল হবে। কংগ্রেস যদি অকস্মাৎ পদত্যাগ করে আবার আন্দোলন বাধায় তবে বড়লাট যা করবেন এটা তারই একটা ইঙ্গিত। তিনি 'এ' গ্রুপের কংগ্রেস প্রদেশগুলোর থেকে গভর্নরসমেত সব ব্রিটিশ অফিসারকে প্রত্যাহার করবেন। সেই প্রদেশগুলো তাঁর অধীনতা থেকে মুক্ত হবে। সম্রাটের অধীনতা থেকেও। তার মানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা স্বাধীন। কিছুদিন পরে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার স্বাধীন। কংগ্রেস এসব প্রদেশে গোলমাল বাধাবে না, ক্ষমতা নিয়ে তৃপ্ত থাকবে। তারপর তিনি বাংলাদেশ ও আসাম থেকেও গভর্নর ইত্যাদিকে সরাবেন। কিন্তু তার আগে কোয়ালিশনের চেষ্টা করবেন। ব্যর্থ হলে হয়তো প্রদেশ ভাগ করে একাংশ লীগকে ও একাংশ কংগ্রেসকে দেবেন। লীগ অবশ্য প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধও করতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস যদি তৃপ্ত হয় তো ইংরেজ নিরাপদ। ভয়টা তো কংগ্রেসকেই, লীগকে নয়। এর পরে কী করবেন তা ওয়েভেলের কেন, শিবের অসাধ্য কাজ। পাঞ্জাবের শিখরা অত সহজে তৃপ্ত হবার পাত্র নয়। তারা চায় শিখিস্থান বা খলিস্থান। তার মানে খলসাদের জায়গা। কংগ্রেস তৃপ্ত হতে পরে, লীগ তৃপ্ত হলেও ইংরেজের গায়ে হাত দেবে না, কিন্তু শিখ! সে যে মারাত্মক ব্যাপার। ওদের বাদ দিয়ে প্রদেশভাগ হয় না, ওদের নিয়ে কোয়ালিশনই হতে পারে। না হলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর না মেলাপর্যন্ত ব্রিটিশ আর্মিকে ভাগও করতে পারা যাবে না, অপসারণ করতেও পারা যাবে না। ওয়েভেল যা করতে চান সেটা কাঁচারকম ক্ষমতার হস্তান্তর। তাও

পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু তিনি সত্যি সত্যি ক্ষমতা সম্প্রদান করবেন। এর মধ্যে কোনো প্যাচ নেই। একভাগ কংগ্রেসকে, একভাগ লীগকে, এটা স্থির কেবল শিখসম্বন্ধেই তিনি মনঃস্থির করতে অক্ষম। তা বলে কি ইংরেজরা অনন্তকাল আটকা পড়ে থাকবে? ইতিমধ্যেই ইংরেজ অফিসাররা ক্ষতিপূরণ পেলে অবসর নেবেন, বলা বাহুল্য পেনসনও পাবেন। কেউ কেউ এমন অধৈর্য হয়েছেন যে ক্ষতিপূরণ না পেলেও শুধুমাত্র পেনসন সম্বল করে বিদায় নেবেন। প্রশ্ন উঠেছে, পেনসনটা দেবে কারা? ব্রিটিশ সরকার, ভারত সরকার, না এক বা একাধিক ভারতীয় সরকার? যতদূর জানা গেছে ব্রিটিশ সরকার দেবেন না, অক্ষম বা অনিচ্ছুক। কংগ্রেস রাজী, লীগও রাজী, কিন্তু কেবল বিদেশীদেরই, স্বদেশীদের নয়। যেহেতু স্বদেশীরা সকলেই চাকরি পাবে। একই শর্তে।"

"এটা তো অন্যায়! বিদেশীদের উপর এত দয়া কেন? ওঁরাও তো ব্রিটেনে বা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে চাকরি পেতে পারেন। আর স্বদেশীরা সবাই কি চাকরিতে থাকতে পাবেন? যাঁরা কংগ্রেসীদের বেধড়ক পিটিয়েছেন বা বেপরোয়াভাবে জেলে পুরেছেন তাঁরা কি টিকতে পারবেন? কংগ্রেসীরা আগে থেকেই শাসিয়ে রেখেছে যে দেখে নেবে। লীগের অধীনে চাকরি করা আরো দুষ্কর। লীগের মুলুক মানে মগের মুলুক। যার নমুনা নোয়াখালী।" যুথিকা শঙ্কিত হয়।

মানস চিন্তিত হয়ে বলে, "পাকিস্তান না হতেই এই! পাকিস্তান হলে কী যে হবে তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। হিন্দুরা না হয় কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গ তাদের ভাগে পাবে। ক্যাবিনেট মিশন সেটা মানেন। বড়লাটও সেটা মানেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গ তো তাদের নাগালের বাইরে থাকবে। সেখানে বলপূর্বক নারীহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ, জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করে করপ্রদানে অক্ষমদের ঘরবাড়ী জায়গাজমি অধিগ্রহণ তো কেউ ঠেকাতে পারবে না। ঠেকাতে গেলে যুদ্ধ বাধবে ও তাতে বহুলোক হতাহত হবে। যুদ্ধ-নিবারণ যাঁদের ব্রত, যেমন মহাত্মা গান্ধীর, তাঁরা তো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ সমর্থন করতে পারেন না। তাঁদের এখন থেকেই সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে যুদ্ধ না বাধে। আমার তো ভয় হচ্ছে যে ইংরেজদের প্রস্থানের পূর্বেই জনতায় জনতায় যুদ্ধ, সৈনিকে সৈনিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সেটাই জিন্না সাহেবের সংকল্প আর তিনিও গান্ধীজীর মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু একজন যেমন কট্টর

অহিংসাবাদী অপরজন তেমনি পাকিস্তান অর্জনের জন্যে পিস্তলধারণে বিশ্বাসী। তা বলে পিস্তল দেখিয়ে তিনি বা তাঁর অনুগামীরা নারীহরণ করতে পারেন না, ইসলামে দীক্ষিত করতে পারেন না। এই দুটি অ্যাকশন যদি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের অন্তর্গত হয় তবে সারা দেশ জ্বলে উঠবে। কেউ নেবাতে পারবে না। না ইংরেজ, না কংগ্রেস, না লীগ, না গান্ধী, না জিন্না। তবে দাবানলের পরেও কিছু অবশিষ্ট থাকে। সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায় না। শান্তি একদিন ফিরবে। নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতের সাধারণ মানুষ স্বভাবতই সহনশীল। মুসলমানরাও যে সবাই অসহিষ্ণু তা নয়। এই দ্যাখ না, আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা আফজল সিরাজী। উনি স্বয়ং গিয়ে হেলথ অফিসার বশীর আহমদের বাড়ী থেকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন, শাসিয়ে আসেন যে পরের বার গ্রেফতার করবেন। আর আমাদের পুলিশ সাহেব ফিদা হোসেন খান্ তো দিনরাত গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেলে চড়ে, কখনো নৌকায় করে। কখনো স্ববেশে, কখনো ছদ্মবেশে। তিনি খানসামা সেজে চিয়াং কাইশেক আর মাদাম চিয়াং কাইশেককে স্পেশাল ট্রেনে খানা পরিবেশন করেছিলেন। দারুণ তুখোড় অফিসার। এঁরা কেউ কম মুসলমান নন, কিন্তু এঁরা মাইনে পাচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, পাকিস্তান অর্জন করতে নয়। ব্রিটিশ শাসনের ডিভি রুল অভ্ ল। সেই শাসন যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাঁরাও তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন, আমিও আমার কর্তব্য পালন করব। দুঃখ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে পাকিস্তান হলে এঁরাও তার শাসকদলের অধীনে চলে যাবেন। রোমে যারা যায় তারা রোমানদের মতো আচরণ করে। পাকিস্তানে যারা যাবেন তাঁরা পাকিস্তানীদের মতো আচরণ করবেন। যুদ্ধ বাধলে এঁরা থাকবেন ভিন্ন শিবিরে। হায়, হায়।”

“ওঃ এইসব দুশ্চিন্তা নিয়ে তুমি রাতের পর রাত পায়চারি করছ? সাধারণ মুসলমানরা আমাদের মালীর মতো ভালোমানুষ, আমাদের বাবুর্চির মতো নিরীহ। কিন্তু ওদের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র অন্যরকম। ওঁরা এইসব সাধারণ মুসলমানকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন। হিন্দুর বাঁচবার পথ থাকবে, সে পালিয়ে বাঁচবে, কিন্তু পশ্চিমা হিন্দুরা আক্রমণ করলে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান বাঁচবে কী করে? কোথায় পালাবে? পশ্চিমে নয়, পুবেও নয়। সেদিকে বার্মা। তা হলে কি

দক্ষিণে জাহাজ ধরে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আরব সাগরে ভেসে পশ্চিম পাকিস্তানে কূল পাবে? সারা বাংলাই যদি ওদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তো হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই লক্ষ্যভেদ সম্ভব, হাতাহাতি করে সম্ভবপর নয়। নারীহরণের সাজা একদিন পেতেই হবে। রাবণ রাজার লঙ্কার পতন হলো, আর জিন্না বাদশার পাকিস্তানের পতন হবে না? আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনে যে এর পেছনে জিন্নার হাত আছে বা থাকতে পারে। ছেলেবেলায় তিনি আমাকে কত আদর করেছেন। জিন্না একজন খাঁটি ভদ্রলোক। সার নাজিমও একজন খাঁটি ভদ্রলোক। তাঁর ভাই খাজা শাহাবউদ্দীনও তাই। বেগম শাহবউদ্দীন তো আমার বন্ধু। আর সুহরাবর্দী সাহেবেরও তো আমি হিন্দুদের মুখেও প্রশংসা শুনেছি। এঁরা থাকতে এমন অপকর্ম ঘটায় কে? কার হাত আছে এর পেছনে?" যূথিকা জানতে চায়।

"শুনছি গোলাম সারওয়ার। নোয়াখালীতে ওর একটা উপদল আছে। গত নির্বাচনে ওকে লীগ প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়নি, তাই ও নাকি সুহরাবর্দীর উপর রাগ করে তাঁকে অপদস্থ করার অভিপ্রায়ে খুনখারাবি, লুটতরাজ, আগুন লাগানো, নারীহরণ, ধর্মান্তরীতকরণ ইত্যাদি ঘটিয়েছে। ঘটনার বিবরণ যা পেয়েছি তার থেকে মনে হয় না যে মাত্র একজনের মাথা এর পেছনে। দশাননের দশটা মাথা ছিল। একটা মাথা না হয় গোলাম সারওয়ারের। বাকী ন'টার নাম ঠিকানা কী? নোয়াখালী তিনটি মাল রপ্তানী করে বলে প্রসিদ্ধ। সুপারি আর লস্কর আর মোল্লা। যদি বলি মোল্লারাও এর পেছনে তা হলে কি ভুল হবে? হিন্দুদের যা স্বভাব। অপহৃতা নারীকে ওরা ঘরে নেবে না, অগত্যা ওরা মুসলমান হয়ে মুসলমানের জন্ম দেবে। যার ধর্মান্তর হলো তাকে একবার গোমাংস খাইয়ে দিলেই সে আর কখনো হিন্দু হতে পারবে না, মন্দিরে ঢুকতে পারবে না, সে ম্লেচ্ছ। মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধির কত রকম সহজ উপায়! তার জন্যে হিন্দুদের পবিত্রতার ধারণাই দায়ী। সে ধারণা সীতাকেও অপবিত্র জ্ঞান করে অগ্নিপরীক্ষার বিধান দিয়েছিল। পূর্বপুরুষরা গোমাংস ঘ্রাণ করেছিলেন বলে ঠাকুরবংশকে বরাবরের মতো পিরালী ব্রাহ্মণ করে রাখা হয়। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের মনেও গভীর ক্ষত ছিল। নোয়াখালী একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা আমাদের সাত শতাব্দীর ইতিহাসের ও ঐতিহ্যের উপসংহার। আমরা সবাই চমকে উঠেছি। বাপুপর্যন্ত ছুটে এসেছেন দিল্লী থেকে। এর

তাৎপর্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।" মানস এইসব নিয়ে চিন্তান্বিত। এর সমাধান খোঁজে রাত জেগে।

"তোমার মধ্যে আরো একটা পরিবর্তনও লক্ষ করছি। জিজ্ঞাসা করতে পারছিনে মুখ ফুটে।" যুথিকা মুখ টিপে হাসে।

"হ্যাঁ, জুঁই। আমি আবার সেই ব্রত নিয়েছি। যতদিন না নোয়াখালীর মেয়েদের উদ্ধার হয় ততদিন এই ব্রত আমি চালিয়ে যাব। তোমার সম্মতি আছে বলে ধরে নিয়েছি। অন্যায় করেছি ?" মানস কবুল করে।

"দূর !" যুথিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "তোমার দৌড় কতদূর তা আমি জানি। তাই চুপ করে আছি।"

॥ পাঁচ ॥

কথা ছিল নোয়াখালী থেকে ফিরে এসে বঙ্কিমবাবু মানসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি একদিন আসেন তার কুঠিতে।

"সৌম্যদার সঙ্গেও দেখা হলো। তিনি বিহার ঘুরে এলেন। আপনাদের ভালোবাসা জানিয়েছেন। বৌদি কলকাতায় থেকে গেছেন। শুনেছেন বোধহয় যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা।" বঙ্কিমবাবু বলেন।

"ওমা, তাই নাকি ?" যুথিকা বিস্মিত ও আনন্দিত হয়।

মানস মন্তব্য করে, "তা হলে ওর কলকাতায় থেকে যাওয়াই শ্রেয়। যদিও মুস্তাফীদের ওখানে থাকলেও চলত।"

"সৌম্যদাও তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু বৌদি একটু বেশীরকম সাবধানী। একটু বেশী বয়সে এই প্রথম মা হতে যাচ্ছেন কিনা। জটিলতা হতে পারে। তাঁর নিজের ভয়ডর নেই, কিন্তু কে জানে যদি তাঁর সন্তানের অমঙ্গল হয় ! একথা শোনার পর সৌম্যদাও অনুমতি দেন।" বঙ্কিমবাবুও অনুমোদন করেন।

এর পর নোয়াখালীর প্রসঙ্গ। বাপু ওখানে যাবার পর থেকে অবস্থা শান্ত। আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সেটা বাপুর প্রভাবে, না পুলিশের প্রতাপে, না মিলিটারির প্রসাদে তা বলা শক্ত। বুঝতে পারা যাবে বাপু যখন নোয়াখালী ছাড়বেন, মিলিটারি তাঁর অনুসরণ করবে ও পুলিশ

একলা পড়ে যাবে। যেখানে হিংসা আর অহিংসা একই সঙ্গে কাজ করছে সেখানে কোন্‌টা সফল তা কী করে প্রমাণ হবে?" বঙ্কিমবাবুর সংশয়।

"বাঃ! আপনি গান্ধীপন্থী হয়ে একথা বলছেন?" মানস আশ্চর্য হয়।

"দেখুন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির নিরস্ত্র বিরোধ এক জিনিস আর প্রজাদের একভাগের নেতা হয়ে আরেকভাগের নেতার সঙ্গে মোকাবিলা অন্য জিনিস। কে না বুঝতে পারছে যে এটা জিন্না সাহেবের ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট আন্দোলনের অঙ্গ? বাপুর কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনের পাল্টা চাল। কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন কি পুরোপুরি অহিংস ছিল? আমরাই কি বলিনি যে নিষ্ক্রিয় থাকার চেয়ে সক্রিয় হওয়া ভালো, পুরোপুরি অহিংস না হলেও চলে? মানুষ খুন হয়নি, কিন্তু থানা আক্রমণ, ট্রেজারি আক্রমণ ইত্যাদি তো হয়েছে। বেশীর ভাগ অবশ্য বাংলার বাইরে। মুসলিম লীগ এক কাটি সরেশ। মানুষ খুনও করেছে, আরও অনেক কিছু করেছে যা কম শোচনীয় নয়। যেমন নারীহরণ ও ধর্মান্তরীকরণ। ওদিকে বিহারী হিন্দুরাও তা একই মুদ্রায় শোধ করেছে। ধর্মান্তরীকরণটা বাদে আর কী বাকী রেখেছে?" বঙ্কিমবাবুর মাথা হেঁট।

"বলেন কী, কর মশায়! নারীহরণও বাদ যায়নি!" মানস চমকে ওঠে।

"না, মল্লিক মশায়। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।" বঙ্কিমবাবু স্বীকার করেন।

"কক্ষনো নয়। হিন্দুরা কক্ষনো অমন কাজ করতে পারে না। ওরা হাজার অপরাধ করলেও মুসলিম নারী হরণ করে না।" মানসের দৃঢ়বিশ্বাস।

"এমনিতেই করে না। করেছে নোয়াখালীর বদলা নিতে। কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কেউ প্ররোচিত করেনি, যা হয়েছে তা আপনা থেকে হয়েছে। জবাহরলাল শাসাচ্ছেন বোমাবর্ষণ করবেন। অপরপক্ষে বল্লভভাই শাসাচ্ছেন তরবারির সঙ্গে তরবারির ভেট হবে। তার মানে হিংসার প্রতিদানে হিংসা। তা হলে নারীহরণের প্রতিদানে নারীহরণ নয় কেন? এখন আমরা কার নেতৃত্ব মানব? বাপুর, না জবাহরলালের, না বল্লভভাইয়ের?" বঙ্কিমবাবুও বিভ্রান্ত।

"কেন, আইনের শাসন কি উঠে গেছে? দণ্ডবিধি আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি আইন, সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন কি রদ হয়েছে? আইন অনুসারে কাজ করার জন্যে পুলিশ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন, জজ রয়েছেন। আসামীদের জন্যে জেল রয়েছে। বোমাবর্ষণের বিধান তো কোথাও লেখেনি। বোমা যদি

পড়ে নিরপরাধদের উপরেও পড়বে। তলোয়ার ব্যবহার তো যুদ্ধকালে নিবদ্ধ। যুদ্ধঘোষণা না করেই কি তলোয়ার ব্যবহার করা যায়? তাও সৈনিকে সৈনিকে নয়, গুণ্ডায় গুণ্ডায়। বাপুর সম্বল অবশ্য নৈতিক উপায়। তাঁর কথা আলাদা।" মানস অভিমত দেয়।

"বাপু আশা করছেন যে আমরা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যরা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে গিয়ে শহীদ হব। কিন্তু আমাদের সে শক্তি কোথায়? ইচ্ছাই বা কোথায়? চরম আত্মদানের জন্যে আমরা প্রস্তুত নই। তবে যদি কারাবরণের আদেশ পাই আমরা সর্বদা প্রস্তুত। এই পরিস্থিতিতে তিনি কারাবরণের প্রয়োজন বোধ করছেন না।" বঙ্কিমবাবু যতদূর জানেন।

"না করে ঠিকই করছেন। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। দেশ অরাজক হবে, যখন ইংরেজরা কারো সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে একতরফা প্রস্থান করবে। কংগ্রেসের ভোটের জোর তখন মুসলিম লীগের উপর বলবৎ হবে না। মুসলিম লীগের ভোটের জোর তখন বাংলাদেশের কংগ্রেসের উপর বলবৎ হবে না। পাঞ্জাবের শিখদের উপর তো নয়ই। বল্লভভাই যে তরোয়ালের জোরের কথা বলছেন সে জোর কি যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য? ইতিহাসে কি বৃহত্তর সৈন্যদল ক্ষুদ্রতর সৈন্যদলের দ্বারা পরাজিত হয়নি একাধিকবার? এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে তার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার না করে চলে যায় তবে তার এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না যে সে আড়াল থেকে মুসলিম লীগকে অস্ত্র আর রণকৌশল জোগাবে না। তা যদি হয় কংগ্রেস কেবল পাঞ্জাব থেকে নয়, দিল্লী থেকেও বিতাড়িত হবে। তবে কলকাতা পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু গোটা বাংলাদেশ নয়। চট্টগ্রামের বন্দরে পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য নামবে ও ঢাকা দখল করে নেবে। বাকী থাকে প্রেমের জোর, যার অপর নাম অহিংসার জোর। কিন্তু তার বেলা কি জুলিয়াস সীজারের মতো বলা চলে, এলুম, দেখলুম, জয় করলুম? মানুষের হৃদয় জয় করতে আরো বেশী সময় লাগে। বাপু হয়তো তিন মাস কি চার মাস কি ছ' মাস থাকবেন। নোয়াখালীর পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা যদি কংগ্রেস লীগের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় হিন্দু মুসলিম জনগণের কাছে আপীল করে কী ফল হবে? জিন্না সাহেবের এজেন্টরাও তো গ্রামে গ্রামে সক্রিয়। এখন ইংরেজদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতি আর কাজ করছে না। জিন্না সাহেবের ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট নীতিই তার

স্থান নিয়েছে। দ্বন্দ্বটা ধর্ম নিয়ে নয়, রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে। এর ফয়সালা কি জনগণের স্তরে হতে পারে? হলে হবে উচ্চতম স্তরে।" মানস সংশয়ান্বিত।

"কিন্তু জনগণ যদি আপনাদের মধ্যে মিটমাট করে নেয় তো উচ্চতম স্তরেও কি সেটা প্রতিফলিত হতে পারে না? পাকিস্তানের দাবীটা তো নিচে থেকে ওঠেনি, উপর থেকেই নেমেছে।" মনে করিয়ে দেন বঙ্কিমবাবু।

"তা যদি বলেন, স্বরাজের দাবীটাও নিচে থেকে উপরে ওঠেনি, উপর থেকে নিচে নেমেছে। বটগাছের ঝুরির মতো সেটা এখন মাটিতে দৃঢ়মূল। পাকিস্তানের দাবীও কালক্রমে দৃঢ়মূল হবে। আমাদের ছেলেবেলায় যার নাম ছিল মুসলিম ইণ্ডিয়া পরে তারই নাম হয়েছে পাকিস্তান। যেটা ছিল হিন্দু ভারতের সঙ্গে সমান্তরাল সেটাই হবে হিন্দুস্থানের সঙ্গে সমান্তরাল। কিন্তু মুশকিলটা এইখানে যে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু ভারতের হয়ে লড়ছে না, লড়ছে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলের হয়ে, সকলের স্বার্থে। সে স্বার্থ অবিভাজ্য। ভারতের ডিফেন্স অবিভাজ্য, ফরেন এ্যাফেয়ার্স অবিভাজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা অবিভাজ্য। সেইজন্যে এই তিনটি বিষয় ক্যাবিনেট মিশন অবিভক্তই রেখেছেন। বড়লাটও তাই চান। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে না যায়, সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র যদি রচিত না হয় তবে কংগ্রেসের একতরফা সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অনুমোদন করবেন না। জিন্না সাহেবের খুঁটির জোর সেইখানে। রক্ষণশীল দলের শিবিরে। এত বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিক দলের একক সংখ্যাধিক্যের জোরে পাশ হতে পারে না। যেমন এখানকার কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে তেমনি ওখানকার পার্লামেণ্টে কনসেনসাস আবশ্যক। জিন্না সাহেব এটা খুব ভালো করেই জানেন। তাই তাঁর এত জেদ।" মানস অনুমান করে।

"জিন্না নিজেও শাসনতন্ত্র রচনা করবেন না, কংগ্রেসকেও তা করতে দেবেন না, কংগ্রেস সেটা করলে অগ্রাহ্য করবেন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাঁর ভীটোকেই বড়ো করে দেখবেন। এ তো ভারী অদ্ভুত কথা! তা হলে তো ব্রিটেনকে থেকে যেতেই হয়। বেশ, তাই হোক। থাকুক ওরা যতদিন খুশি। কিন্তু প্রগতির পথ রুদ্ধ দেখলে কংগ্রেস নেতারাও গদী আঁকড়ে পড়ে থাকবেন না। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট ভেঙে যাবে।" বঙ্কিমবাবুর ধারণা।

"সেটাই সম্ভব। কিন্তু সরকারী মহলের ভিতরের খবর ইংরেজরা কংগ্রেসকে

কয়েকটা প্রদেশ ছেড়ে দেবে, কয়েকটা লীগকে, একটা কি দুটোর ভাগ বাঁটোয়ারাও করতে পারে। মোদ্দা কথা ওরা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো একটা পার্টিকে একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে গদীতে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে না। যার ভোটের জোর বেশী সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে এটা জিন্নাও মানবেন না, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও মানবে না। আর কারই বা এত গায়ের জোর আছে যে একচ্ছত্র শাসক হবে? ইংরেজ যেখানে পারল না কংগ্রেস সেখানে পারবে? ঘুরে ফিরে আবার আসতে হয় প্রেমের জোরের কাছে। গান্ধী জিন্নাকে, কংগ্রেস লীগকে, হিন্দু মুসলমানকে যদি ভালোবেসে কোলে টেনে নিতে পারতেন তা হলে ভাবনা কী ছিল? এখন বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন কী অন্তঃপরিবর্তন ঘটতে পারে রাজনীতিতে প্রতিফলিত হবে? তবু সেটা পরীক্ষাযোগ্য।" মানস বলে।

যূথিকা মৌন ভঙ্গ করে। "এসব কোনো কাজের কথা নয়। আমি বলি বাপু সময় থাকতে নোয়াখালী থেকে হিন্দুর মেয়েদের নিয়ে ইহুদীদের প্রোফেট মোজেসের মতো পদ্মা পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা করুন। বাইবেলে যাকে বলা হয়েছে এক্সোডাস। পুরুষরা আরো কিছুদিন থেকে দেখতে পারে মুসলমানদের মতিগতি বদলেছে। তার লক্ষণ না দেখলে ওরাও পেয়ারেলালের নেতৃত্বে অগস্ত্যযাত্রা করবে।"

বঙ্কিমবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, "দিদির বোধহয় মালুম নেই যে নোয়াখালীর শতকরা দশজন হিন্দু শতকরা নব্বইভাগ জমির মালিক আর শতকরা নব্বইভাগ মুসলমান শতকরা দশভাগ জমির। হিন্দুরা অত জমি পেয়েছে খাজনা বাকীর মামলা করে বা সুদ বাকীর মামলা করে। আইন যদি অন্যরকম হতো কিছুতেই অত জমি পেত না। প্রজা ও খাতকের প্রতি সামাজিক সুবিচার করতে যতবারই আইন সংশোধনের প্রস্তাব এসেছে হিন্দুরা বাধা দিয়েছে। যেমন মহাসভাপন্থী তেমনি কংগ্রেসপন্থী। কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললে গান্ধীজীর উপরেও আস্থা হারিয়ে ফেলা হয়। মহাত্মাজী নোয়াখালী গিয়ে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাবেন আমাদের সকলের মনে এই ধারণা ছিল। কই, তেমন কিছু তো ঘটল না। কারণ তিনি সামাজিক সুবিচারের পথ দিয়ে হাঁটছেন না। জমিদারকে বলছেন না, খাজনা মকুব করো। মহাজনকে বলছেন না, সুদ মাফ করো। ওঁরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রজা ও খাতকের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করছেন না। মুসলিম লীগে মহাজন একজনও

নেই, জমিদার থাকলেও তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। তাই তার পক্ষে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, পূরণ করাও শক্ত নয়, যদি পাকিস্তান হয়। মুসলমানরা তাই পাকিস্তানের অনুকূলে ভোট দিয়েছে। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্যে ধার্য দিনে ওরা এসব জেলায় মেতে ওঠেনি। নোয়াখালীর ঘটনা ঘটেছে অনেক পরে। এর পেছনে লীগের হাত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে লীগ থেকে বহিষ্কৃত গোলাম সরওয়ার এর জন্যে দায়ী। তার পেছনে মোল্লাশক্তি থাকাই সম্ভবপর। পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই হিন্দু মুসলমানের ধনবৈষম্য। এ বৈষম্য বজায় থাকলে কমিউনিস্টরা এর থেকে ফায়দা তুলবে। তাদের তুলনায় মুসলিম লীগ এমন কী ফায়দা তুলতে পারে? পাকিস্তান একটা বার্গেনিং কাউণ্টার। পাকিস্তানের চেয়ে ভালো বার্গেন পেলে ওরা ওটা ছেড়ে দেবে। সেই ভালো বার্গেনটা কী? কী সেই রাজনৈতিক সমাধান? আমি তো ভেবে পাইনে। মল্লিক মশায় বলতে পারেন?"

মানস চট করে উত্তর দিতে পারে না। মাথা চুলকিয়ে বলে, "লীগের আসল দাবীটা তার মনের মতো শর্তে প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠন। ব্যতিক্রম কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সেখানে অবিমিশ্র লীগ গভর্নমেণ্ট। কিন্তু লীগের শর্তের মধ্যে এটাও পড়ে যে, কোনোখানেই কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের কংগ্রেসের কোটায় স্থান দেওয়া হবে না। তাঁরা না ঘরকা না না ঘাটকা। কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সংগ্রামী কমরেডদের পরিত্যাগ করবেন না। যেমন ব্রিটিশ কর্তারা তাঁদের মুসলিম সহযোগীদের পরিত্যাগ করবেন না। নতুন মিতার জন্যে পুরনো মিতাকে পরিত্যাগ করতে কি কেউ রাজী হন? ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেসের ডেডলক, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের ডেডলক, এ দুটি ডেডলকের মূল কারণ হচ্ছে এই। আমি তো আরো ভালো বার্গেন খুঁজে পাচ্ছিনে।"

"তা হলে কি রাজনৈতিক সমাধানের কোনো আশা নেই? নোয়াখালীর মাটি চষাই সার?" বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসু হন।

"গান্ধীজী নিশ্চয়ই ভাবছেন। পণ্ডিতজীও। সর্দারজীও। আপনিও চিন্তা করুন। আমিও চিন্তা করি। সবাই যদি অন্ধকার দেখেন তবে মারামারির ভিতর দিয়েই সমাধান হবে। তলোয়ারের ধার দিয়েও।" মানস যতদূর দেখতে পায়।

যূথিকা অধৈর্য হয়ে বলে, "অত কথা এখন থেকে নাই বা চিন্তা করা গেল। নোয়াখালীর মেয়েদের কথাই আগে। সেইসঙ্গে বিহারের মেয়েদের কথাও। দের জন্যেও আমি মর্মাহত। ঘটনাটা যদি সত্য হয়ে থাকে।"

"দিদি, সৌম্যদা কখনো মিথ্যা বলে না। সে কোনো কোনো অবস্থায় অহিংসা ছাড়তে পারে, কিন্তু সত্যকে কোনো অবস্থাতেই ছাড়বে না। ফলাফল যাই হোক। বিহারে যা ঘটেছে তা ওকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সে নিজেও তো একহিসাবে বিহারী। বিহারীরা তাকে ভালোবাসে, সেও তাদের ভালোবাসে। ছি ছি! তাদের এই কর্ম! ওরা নোয়াখালীর বদলা নিয়েছে। এর পরে পাঞ্জাবীরা হয়তো বিহারের বদলা নেবে। তার পর পাঞ্জাবীদের বদলা নেবে হয়তো মারাঠারা। বাপু তাঁর এই সাতাত্তর বছর বয়সে ক'টা প্রদেশেই বা ছুটোছুটি করবেন! করতে হবে তাঁর শিষ্যদেরই। তারাই বা সংখ্যায় ক'জন। মন্ত্রীদের উপরেই বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্বাসটা করবে যারা তারা তো পল্লীগ্রামের সাধারণ হিন্দু, সাধারণ মুসলমান। তারা কি মন্ত্রীদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারবে? তারা কি দেখছে না যেই রক্ষক সেই ভক্ষক?" বঙ্কিমবাবু লজ্জায় ম্রিয়মাণ।

"আমি এখন মুসলিম লীগ গভর্নমেন্টের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। তাঁদের যাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপরেও। কংগ্রেস গভর্নমেন্টের উপরেই বা বিশ্বাস রাখি কী দেখে? বোমা বর্ষণ করে এ সমস্যার সমাধান হয় না। তাতে দোষী আর নির্দোষ একসঙ্গেই মরবে। মেয়েগুলোও বাঁচবে না। তলোয়ারের সঙ্গে তলোয়ারের মোকাবিলা তো যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। সেটা কি গ্রামে গঞ্জেও হবে নাকি? বাপুকে আমি লিখব নারী ও শিশুদের নিয়ে অপসরণই একমাত্র সমাধান। জিন্না সাহেবও বিহারে গিয়ে তাই করুন।" যূথিকা যেন কত বড়ো একটা আবিষ্কার করেছে!

"দিদি, জিন্না সাহেব যদি বিহারী মুসলমানদের নিয়ে পূব মুখে আসেন আর বাপু যদি বাঙালী হিন্দুদের নিয়ে পশ্চিম মুখে যান মাঝপথে মুখোমুখি ঘটবে না তো? লক্ষ করেননি দু'জনের মধ্যে কেমন রেষারেষি চলেছে? ইনি যদি হাঁকেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া' উনি হাঁকেন 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট'। ইনি যদি চালান 'সিভিল ডিস্ওবিবিয়েন্স' উনি চালান 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। দুটো আন্দোলনই যদি একসঙ্গে চলে তবে জনগণ বিভক্ত হবেই। আপনিও সেই

পরামর্শ দিচ্ছেন। যেদেশে জনগণ দ্বিধাবিভক্ত সেদেশের বাসভূমিও তে স্বতঃই দ্বিধাবিভক্ত। সেটা কি একটা সমাধান হলো?" বঙ্কিমবা: মাথা নাড়েন।

যূথিকা অপ্রস্তুত হয়। মানস তাকে আড়াল করতে এগিয়ে আসে "আহা, ওটা তো কেউ গোপনে করতে বলবে না। করতে বলবে সেক্রেটারি অভ স্টেটকে জানিয়ে, বড়লাটকে জানিয়ে, গভর্নরকে জানিয়ে, জিন্না সাহেবকে জানিয়ে, সুহরাবর্দী সাহেবকে জানিয়ে, দুনিয়ার লোককে জানিয়ে। আর একটা দাণ্ডী অভিযান আর কী! সেবারকার মতো এবারও বাপু দেশবিদেশের বিবেককে জাগরিত করবেন। ইমাজিনেশনকে ক্যাপচার করবেন। মোজেস চলেছেন আগে আগে, ইহুদী কন্যারা চলেছে পিছে পিছে। হলিউড থেকে ফিল্ম নির্মাতারা ছুটে আসবে ছবি তুলতে। এখন পদ্মানদীকে কী করে লোহিত সাগরের মতো ফাঁক করা যায়, যে ফাঁক দিয়ে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে পার হবে?"

যূথিকা রেগে যায়। "এটা কি একটা তামাশার বিষয়! দেখছ না এটা একটা সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন। যার জন্যে ত্রেতাযুগে বেধেছিল লঙ্কার যুদ্ধ। আর দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। সীতার অসম্মান রামের সহ্য হয়নি। দ্রৌপদীর অসম্মান কৃষ্ণের সহ্য হয়নি। একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আবার এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনে। বাপু তা না হলে দিল্লী থেকে নোয়াখালীতে ছুটে আসতেন কেন? তিনিই তো এ যুগের কৃষ্ণ। নারীর সম্মান হেলাফেলার বিষয় নয়। এর জন্যে ট্রয় পুড়েছে। বাংলাদেশও পুড়বে, যদি প্রতিকার না হয়। আমরাই জালিয়ে দেব আগুন, যদি অহিংসায় কাজ না দেয়। যদি বাপু বিফল হন। সে আগুনে খাক হয়ে যাবে ইংরেজ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ।"

মানস তাকে শান্ত করে। "আহা, আমিও তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। আমি প্র্যাকটিকাল ম্যান। আমাকে আগে স্টীমার জোগাড় করতে হবে, চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ যাবার মতো খান দশেক স্টীমার। একটাতে দিশারী হবেন বাপু, আরেকটাতে পেয়ারেলাল, আরেকটাতে নির্মল বোস, আরেকটাতে সৌম্য চৌধুরী, আরেকটাতে বঙ্কিম কর ইত্যাদি। গ্রীকরা হাজারটা জাহাজে করে কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়েছিল। পদযাত্রা চাঁদপুর পর্যন্ত চলতে পারে, তার পরে সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রের স্থলে পদ্মা। গোয়ালন্দ

থেকে আবার পদযাত্রা। কলকাতায় যখন ওই দলটি পৌছবে তখন আগুন জ্বলবে বইকি। রাইটার্স বিল্ডিং পুড়ে খাক হবে। গভর্নমেণ্ট হাউস পুড়ে ছাই হবে। বেলভিডিয়ার পুড়ে শ্মশান হবে। তবে ওটা ঠিক অহিংসা নয়। এই যা!"

যূথিকা রাগ করে উঠে যায়। "তোমার সঙ্গে আড়ি। তুমি একটুও সীরিয়াস নও। বাপুকে আমি লিখবই। নইলে আমার মন হালকা হবে না।"

বঙ্কিমবাবু চুপি চুপি বলেন, "আপনাকে সাবধান করে দিই, মল্লিক মশায়। আমি ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করতে যাবেন না। করতে গেলে আখেরে ছাড়াছাড়ি। সব সময় হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাবেন। ওঁরা সব সময় রাইট। আপনি আমি সব সময় রং। এই হলো বিবাহিত জীবনের মাধুর্য। মধুর রস উপভোগ একেই বলে।"

দু'জনে হাসাহাসি করেন। মানস বেয়ারাকে ডেকে বলে, "দু'জনের জন্যে কফি। কফিতে আপত্তি নেই তো?"

"না। কস্তুরবা খেতে ভালোবাসতেন। বাপু একদিন নিজের হাতে তৈরি করে খাওয়ান। আপনিও সেইরকম করবেন। আমি করিনি বলে এই দশা। মন বুঝে কাজ করতে হয় সব পুরুষকেই। মহাপুরুষকেও।" বঙ্কিমবাবু হাসেন।

"আমার কিন্তু এই সুবচন মনে থাকে না। ইচ্ছে আছে খনার বচনের মতো কিছু লিখব। দেশের লোক যা চিরকাল মনে রাখবে।" মানস হাসে।

যূথিকাও পরে এসে সে হাসিতে যোগ দেয়। "এই মানুষটিকে নিয়ে পারা যাবে না, বঙ্কিমদা। এঁর হাতে এক সাংঘাতিক হাতিয়ার আছে। তা দিয়ে ইনি রাজা উজীর মারেন। এঁর লেখাই এঁর লড়াই। আজ হয়তো আমার নামে লিখবেন। আমাকেও সাবধানে থাকতে হয়।"

মানস নিজের হাতে ওর জন্যে এক পেয়ালা কফি ঢেলে দেয়। ঢালতে গিয়ে টিপয়ের উপরেও ঢালে। যূথিকা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে, "তুমি নিতান্তই আনাড়ি। মহাত্মা নও, দুরাত্মা।"

মানস যূথিকার দিকে চেয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় বলে, "তুমি তো জানো আমি মহাত্মা হবার পথেই চলেছি। কিন্তু ওঁর মতো মহাত্মা হওয়া কি আর কারো সাধ্য? উনিই আমাদের বুদ্ধ, আমাদের খ্রীস্ট, আমাদের মোজেস,

আমাদের ওয়াশিংটন, আমাদের লিঙ্কন। উনি যেমন দেশ উদ্ধার করবেন, তেমনি হরিজন উদ্ধার, তেমনি নারী উদ্ধার। ওঁর কি জুড়ি আছে ?''

যূথিকা প্রথম বাক্যটি শুনে রঙিন হয়। বঙ্কিমবাবু বুঝতে পারেন না কেন। দু'চার কথার পর বলেন, "একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। বাপুর নীতি হচ্ছে হিন্দুরা যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে, মুসলমানরা যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে। তাদের নিরাপত্তার জন্যে দায়ী হবে তাদের ভিন্নধর্মী প্রতিবেশীরা। আর উভয়ের প্রতি সমান দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার। সরকার তার কর্তব্য পালনে তৎপর হলে এসব ঘটনা ঘটত না, ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে নারী উদ্ধার, সম্পত্তি উদ্ধার প্রভৃতির সূত্রপাত হতো। সরকারকে তিনি আরো সময় দিতে চান। সরকার থেকে আশ্বাসও পেয়েছেন যে অন্যায়ের প্রতিকার হবে। কিন্তু প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও আশ্বাস পেতে হবে যে আর কখনো অমন ঘটনা ঘটবে না। সে আশ্বাস পলাতক প্রতিবেশীদের বা অপহৃতা প্রতিবেশিনীদের বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। এটা রাজনৈতিক মিশন নয়। নৈতিক।''

"কিন্তু অপরাধীদের সাজা পেতে হবে। আইন তার নিজের রাস্তায় চলবে। তাদের মুক্তির আশ্বাস দেওয়া হবে না। মুক্তির কথা উঠবে দণ্ডভোগের পর।'' মানসও পরিষ্কার করে বলে।

বঙ্কিমবাবু দোনোমনো করেন। "তা হলে তো শান্তির স্পিরিটটাই নষ্ট হয়ে যায়। নারী উদ্ধার শক্ত হবে। বিহারেও।"

"শক্ত হলে পিউনিটিভ ট্যাক্স। গ্রামশুদ্ধ লোকের উপর। অনাদায়ে ঘটি বাটি ক্রোক।" মানস দাওয়াই বাতলায়।

যূথিকা খুশি হয়ে বলে, 'আশা করি ততদূর যেতে হবে না।"

বঙ্কিমবাবু আহত হন। "আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে বাপু ওখানে গেছেন শুধুমাত্র নারী উদ্ধার করতে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য জগাই মাধাই উদ্ধার। জগাই মাধাই যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পারে তবে ওরাই নারী উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। ওরাই প্রত্যেকটি হিন্দুকে রক্ষা করবে। বাপুর নোয়াখালী মিশন সার্থক হবে। জাতীয় জীবনে একটা মিরাক্ল ঘটে যাবে। মুসলমানরা হিন্দুদের সব অশ্রু মুছে দেবে। হিন্দুরা মুসলমানদের সব লাঞ্ছনা মোচন করবে। বাপুর মতো মানুষ হাজার বছরে একজন আসেন। তিনি যদি ব্যর্থ হন তবে সে ব্যর্থতা হাজার বছরের ব্যর্থতা। বোমাবর্ষণে নয়, তলোয়ারের ঝঞ্চনায়

নয়, দেশ ভেঙে টুকরো টুকরো করায় নয়, লোক অপসারণে নয়, যন্ত্র তন্ত্র বদলা নেওয়ায় নয়, তৃতীয় পক্ষের রোয়েদাদে নয়, কোনো মতেই হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান হবে না। এ সমস্যা স্বাধীনতার পরেও, বিপ্লবের পরেও উত্তর-পুরুষকে জর্জর করবে।"

মানস ও যূথিকা দু'জনেই নির্বাক। কিছুক্ষণ পরে মানসের মুখ ফোটে। "নোয়াখালীর তাৎপর্য এত বেশী ?"

"নোয়াখালীর তাৎপর্য বিহারেরও তাৎপর্য। যুক্তপ্রদেশেরও, পাঞ্জাবেরও তাৎপর্য। নয়তো গভনর রুল ঘোষণা করে রাজপুরুষরাই প্রত্যেকটি বাড়ী তল্লাস করে নারী উদ্ধার করতেন। বিহারেও।" বঙ্কিমবাবু নিঃসন্দেহ।

"সৌম্যদা কি নোয়াখালীতে গিয়ে কাজ করবে ?" যূথিকা সুধায়।

"সৌম্যদাকে বলা হয়েছে তার নিজের জেলা সামলাতে। আমাকেও বলা হয়েছে আমার নিজের জেলা আগলাতে। সবাই গিয়ে নোয়াখালীতে জড়ো হলে অন্যান্য জেলার হিন্দুদের মনোবল কমে যাবে। নিজের নিজের জেলায় যদি থাকি মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের যেমন হৃদ্যতা ওরাও আমাদের কথায় কান দেবে। অবশ্য লীগপন্থী মুসলমান বাদে। কী করে যে ওঁদের মন পাব তা ভেবে পাচ্ছিনে। ওঁদের মধ্যেও আমার বন্ধুস্থানীয় আছেন। নোয়াখালীর জন্যে ওঁরাও লজ্জিত। একজন সেদিন কী বললেন শুনলে হেসে কুটি কুটি হবেন।" বঙ্কিমবাবু কৌতূহল জাগিয়ে দেন।

"শমসের আলী আফগান লোকটি ভালো। আমি ওঁকে শের আফগান বলে ডাকি। মাছ মাংস খান না। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তেল চুকচুকে চেহারা। আমার তো মনে হয় বিশুদ্ধ বাঙালী। পেশায় উকীল। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলের কেস নেন। সেই শমসের আলী আমার মনের ব্যথা আঁচতে পেরে বলেন—" বঙ্কিমবাবু হেসে ফেলেন।

"কী বলেন, শুনতে আমি অধীর।" যূথিকা কান পাতে।

"বলেন—হা হা ! বলেন, আরে দাদা, আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে এনেছি। তা তোমরাও আমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাও না কেন ? হা হা ! আমি তো হাঁ !" বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে ঢলে পড়েন।

"ছি !" যূথিকা হাসতে হাসতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"তা আপনি কী বললেন ?" মানস হাসি চাপে।

"আমি বলি, এটা আফগানসুলভ কথা হলো। ওদের প্রথা হচ্ছে ভেন্‌ডেটা।

তুমি আমার বাপকে মেরেছ। আমি তোমার বাপকে মারব। তুমি আমার বৌকে কেড়ে নিয়েছ। আমি তোমার বৌকে কেড়ে নেব। হাতে হাতে ন্যায়বিচার। মামলার নিষ্পত্তি। কিন্তু আমাদের প্রথা তা নয়। আমি বলি, আফগান সাহেব, সাতশো বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষ যখন গজনীতে কি ঘোরে ছিলেন তখন যে প্রথা মানতেন সে প্রথা কি আজকের দিনে এই বাংলাদেশে চলে? আমরা হিন্দুরা কখনো মুসলিম নারীর গায়ে হাত দিইনে। হিন্দুরাও নারীহরণ করে, কিন্তু জাত বাঁচিয়ে। মুসলমানের মেয়েকে যদি ঘরে তুলতে না পারি, যদি বিয়ে করতে না পারি, তবে কেন বেচারিকে অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া? দুটো অন্যায় মিলে একটা ন্যায় হয় না। না, এই একটি ব্যাপারে আমরা নিঃস্পৃহ। তবে সম্পত্তি হরণ যদি বলেন তাতে আমাদের অনীহা নেই। বরং একটু বেশীরকম আগ্রহ।" বঙ্কিমবাবু হাসেন।

"যা বলেছেন। মুসলমানের সম্পত্তি গ্রাস করেই হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ফেঁপে উঠেছে। যারা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছে তারাই এখন দলে দলে পাকিস্তানী বনে যাচ্ছে। এর পরে হয়তো দলে দলে কমিউনিস্ট বনবে। স অনর্থের মূল হচ্ছে সম্পত্তি। নারীও একদা তাই ছিল। নইলে লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র, ট্রয়ের যুদ্ধ ঘটত না। আহা বেচারা শের আফগান! তিনিও 'ক একটা যুদ্ধটুদ্ধ বাধিয়ে দিতেন না সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে? অন্তত মোগল হারেম থেকে বেগম হরণ করে বদলা নিতেন না? সেই ভয়ে তাঁকে কোতল করা হলো।" মানস দুঃখ প্রকাশ করে।

যুথিকার চোখে জল আসে। সে বলে, "সত্যি!"

॥ ছয় ॥

মানসের এক চোখ নোয়াখালীর উপরে, যেখানে গান্ধীজী খানাখন্দ পেরিয়ে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলেছেন। অন্য চোখ দিল্লীর উপরে। যেখানে লর্ড ওয়েভেল কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। কথাবার্তা সফল হলে স্বাধীন ভারত, অখণ্ড ভারত, নয়তো স্বাধীন তথা স্বতন্ত্র দুই রাষ্ট্র। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে শিখদের নিয়ে জটিলতা।

কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট না করে লীগের সঙ্গে মিটমাট করা সম্ভব নয়। লীগের সঙ্গে মিটমাট না করলে লীগ বাধাবে সিভিল ওয়ার। আর লীগকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কংগ্রেসকে অসন্তুষ্ট করলে কংগ্রেস লাগাবে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। ওয়েভেলের একদিকে বাঘ, অন্যদিকে কুমীর। একদিকে সীলা (Scylla) অন্যদিকে ক্যারিবডিস (Charybdis)।

তিনি যদি কংগ্রেসের হাতে কয়েকটা প্রদেশ আর লীগের হাতে কয়েকটা প্রদেশ ধরিয়ে দিয়ে কোনো মতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করে চলে যেতে চান তা হলেও বিপদ কম নয়। অপসরণের পথ তো বোম্বাই বা করাচী বন্দর দিয়ে। কংগ্রেসের বামপন্থীরা জাহাজে উঠতে দেবে তো? আর লীগেরও চরমপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। খাকসার দল। তারাও ব্রিটিশবিরোধী। তা ছাড়া শিখরা তো আছেই। কারো সঙ্গে পাকা বন্দোবস্ত না করে একতরফা সৈন্য অপসরণ সম্ভব ছিল যখন অপসরণ করতে হতো ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিহারে, বিহার থেকে যুক্তপ্রদেশে। কিন্তু সমুদ্রের বক্ষে অবতরণ করে অপসরণ কেবল যে জাহাজের অপেক্ষা রাখে তা নয়, বন্দর ছেড়ে জাহাজে ওঠারও অপেক্ষা রাখে। কুলীরা ধর্মঘট করলে ট্রেন থেকেই মাল নামবে না। সৈনিকদের সঙ্গে ব্যাগ আর ব্যাগেজও তো যাবে।

প্রায় বিশ বছর আগে মানসের এক বন্ধুকে তর্ককালে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বলেছিলেন, "আপনি কি বলতে চান যে ইণ্ডিয়া থেকে আমরা ব্যাগ আর ব্যাগেজ সমেত বিদায় হব?" তার উত্তরে বন্ধু বলেছিলেন, "আরে না, না। ব্যাগ আর ব্যাগেজ সমেত নয়, ওসব তো আমাদের সম্পত্তি।" ভদ্রলোক শুনে হতভম্ব। ঘটনার গতি সেইদিকেই যাচ্ছে। হয় দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করতে হবে, নয় মানে মানে অপসরণ করতে হবে। এর হাতে ওর হাতে মোয়া ধরিয়ে দিয়ে অপসরণ নিষ্কণ্টক হতে পারে না।

এই যেমন ওয়েভেলের সঙ্কট তেমনি গান্ধীজীর সঙ্কট মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে নোয়াখালীর মুসলিম জনগণের হৃদয়জয়ের অভিযান। ব্যর্থ হলে তাঁকেও একদিন হিন্দুদের নিয়ে অপসরণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে ব্যাগ আর ব্যাগেজ থাকলে চাঁদপুর থেকে ষ্টীমারে তুলতে দেওয়া হবে কি? ওদের যদি আদৌ উঠতে দেওয়া হয় খালি হাতেই বিদায় নিতে হবে। অমন ভাবে অপসরণ মানে মানে প্রস্থান নয়। গান্ধীজী তার দায়িত্ব নেবেন না। আর মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়াও কি সহজ কথা? বছর সাত আট-

আগে এক সাক্ষাৎকারীকে লীগপন্থীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "এঁদের চেয়ে শাসকদের সঙ্গে মিটমাট আরো সহজ।"

ত্রিশ বছর পূর্বে জিন্না সাহেব ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারির নেতা। তখনকার দিনে এটা পরস্পরবিরোধী ছিল না, বরং পরিপূরক ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন, "ভারতের জাতীয় স্বার্থের জন্যে কংগ্রেস আর মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্যে লীগ। দুটোরই প্রয়োজন আছে। তাই দুটোতেই আমি আছি।" দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন করতেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখনউতে তিনি কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট সম্পাদনায় অগ্রণী হয়েছিলেন ১৯১৬ সালে। সেটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে হিন্দু মুসলমানের বখরা কী রকম হবে তাই নিয়ে। এর পরে যখন কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনের বা স্বরাজের পালা আসবে তখন আবার সেই রকম একটা চুক্তির প্রয়োজন হবে। আবার সেই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তখন আবার তাঁকে টিলকের মতো একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চুক্তির সম্পাদনায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

টিলকের মৃত্যুর পর গান্ধী[illegible]ন কংগ্রেসের সর্বপ্রধান নেতা। গান্ধীর সঙ্গে[illegible] জিন্নার সদ্ভাব ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধী যেদিন বোম্বাইতে সম্বর্ধিত হন সেদিন জিন্না ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। পরে তাঁরা হোম রুল লীগেও একসঙ্গে মিলে কাজ করেন। জিন্না সভাপতি, গান্ধী সহ-স[illegible]। ভারতের রাজনীতিতে জিন্নাই সিনিয়র। বছর পাঁচেকের মধ্যে [illegible] ঘুরে যায়। খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলনকে জুড়ে দিয়ে [illegible] হন সেই সংযুক্ত আন্দোলনের মহানায়ক। আন্দো[illegible] ছিল গণভিত্তিক [illegible]র তাতে অরুচি। অশাসনতান্ত্রিক। জিন্নার তাতে আপত্তি। তা ছাড়া গান্ধীর নবলব্ধ সহযোগী গোঁড়া মৌলানাদের সঙ্গে জিন্নার মতো গোঁড়ামিবর্জিত মুসলমানের বনিবনা হবে কেন? তিনি না পড়তেন নামাজ, না রাখতেন রোজা, সাহেবদের মতো খানা, সাহেবদের মতো পিনা, সাহেবদের মতো পোশাক। জিন্না ক্রমশ গান্ধীর থেকে দূরে সরে যান। কংগ্রেস থেকেও। কংগ্রেস লীগ চুক্তি স্বপ্নই থেকে যায়।

পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয় ১৯৩৭ সালে। এর পরের ধাপটা ফেডারেশন। কংগ্রেস লীগ চুক্তি না হলে হিন্দু মুসলমা[illegible]

ক্ষমতার ভাগাভাগি হবে কী করে? কিন্তু ততদিনে গঙ্গা যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কংগ্রেসের মতে কংগ্রেসই হচ্ছে ভারতীয় জনগণের ধর্মনির্বিশেষে একমাত্র প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লীগের মতে মুসলিম লীগই হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মসূত্রে একমাত্র প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগকে তেমন মর্যাদা দিতে রাজী নয়, দিলে মৌলানা আজাদ, খান্ আবদুল গফ্ফর খান্ প্রমুখ সংগ্রামী নেতাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। অপর পক্ষে, লীগ কংগ্রেসকে অমন মর্যাদা দিতে নারাজ। দিলে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের মতো সরাসরি কথা বলতে পারে না। কংগ্রেসের তুলনায় লীগ খাটো হয়। জিন্না কখনো কারো কাছে খাটো হবেন না। না গান্ধীর কাছে, না বড়লাটের কাছে। কংগ্রেস লীগ চুক্তি হবে সমানে সমানে। নয়তো আদৌ হবে না। সেরূপ স্থলে মুসলিম লীগের দাবী হবে সেপারেট ইলেকটোরেটের লজিকাল পরিণতি সেপারেট স্টেট। পাকিস্তান। ফেডারেশন নৈব নৈব চ।

জিন্না সাহেব তাঁর বার্গেনিং পাওয়ার বাড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে বার্গেন করবেন? কংগ্রেসের সঙ্গে? কংগ্রেস তো লীগের শর্তে কথাবার্তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বড়লাটের সঙ্গে? বড়লাটের দরজা অবশ্য খোলা। কিন্তু জিন্না সাহেবের সঙ্গে তাঁর বার্গেন যদি কংগ্রেসের বা হিন্দুর খরচে হয় তবে বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেস কথাবার্তা বন্ধ করে দেবে। বড়লাট কি সেটা চাইবেন? কংগ্রেস নেতাদের তিনি হাতছাড়া করলে তাঁরা আবার গান্ধীজীর হাতে পড়বেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেটা পছন্দ করবেন না। তাঁরা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের ঝুঁকি নেবেন না। তবে কি তাঁরা সিভিল ওয়ারের ঝুঁকি নেবেন? তাও নয়। তাঁরা সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছেন। যাতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ নিষ্কণ্টক হয়।

ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট পুনর্গঠনের পর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর আর কোন প্রয়োজন রইল না। মুসলিম লীগ তো তার খেয়াল খুশিমতো একজন তফশিলী জাতির হিন্দুকে নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদ্ আলো করে বসেছে। বাইরে পড়ে গেছেন জিন্না সাহেব। সেটা তাঁর নিজের ইচ্ছায়। জবাহরলাল উক্ত পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হবেন আর তিনি হবেন একজন সাধারণ মেম্বর এ কি কখনো সহ্য হয়? আর তাঁর ক্ষমতাই বা কী? জঙ্গীলাটের আসনটা তো একজন শিখকে দেওয়া স্থির হয়ে গেছে, নইলে শিখরা বেঁকে বসবে,

এমনিতেই ওদের দাবী পাকিস্তানের পাল্টা শিখিস্থান বা খলিস্থান। মুসলিম লীগের মতো ওরাও দাবী আদায়ের দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে, আপাতত সেনাবিভাগের ভার দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।

তা হলে জিন্না সাহেবের হাতে আর কোন্ তাসখানা বাকী রইল? কী খেলা এর পর তিনি খেলবেন? কেন, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বয়কট। তিনি যদি সদলবলে তার বাইরে থাকেন তা হলে কংগ্রেস সেখানে গিয়ে এমন কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবে না যা হিন্দু মুসলমানের সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র। যে শাসনতন্ত্র অনুসারে আসমুদ্র হিমাচল শাসন নির্বিবাদে সম্ভবপর। তেমন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে দাঙ্গাহাঙ্গামা তো বাধানো যাবেই, সিপাহীবিদ্রোহও আপনি বাধবে। কংগ্রেস অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায় যে একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে তা মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় কিছুতেই হতে দেবে না।

মুসলিম লীগ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে না গেলে বড়লাট তার অধিবেশন ডাকবেন না, কারণ সে সভা একবার কাজ শুরু করলে পরে তাকে থামানোই যাবে না। তার তৈরি শাসনতন্ত্র মুসলমানদের উপর বলবৎ করতে হবে। সে ঝুঁকি তিনি নিতে নারাজ। বিস্তর টালবাহানার পর তিনি তারা অধিবেশন ডাকেন। আরম্ভের সময় মুসলিম লীগ অনুপস্থিত। সে আরম্ভ ভারতের মতো একটি মহান রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তার অভিব্যক্তি। এর জন্যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেই গর্ব বোধ করতে পারে। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নিলে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগ সহযোগিতা করবে না। আর সেটা মেনে নেওয়ার তাৎপর্য আসামকে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে লীগের পাতে তুলে দেওয়া। তর্কের খাতিরে সেটা সম্ভব হলেও লীগ তার পাকিস্তানের দাবী প্রত্যাহার করবে না, দশ বছর অপেক্ষা করবে। ততদিনে আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের পেটে তলিয়ে গিয়ে থাকবে।

মানস অর্ধেক রাত জেগে দোতালার ঢালা বারান্দায় রোজ পায়চারি করে। যূথিকা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে শুইয়ে দেয়। তার খড়ের বিছানায়। আজকাল সে ক্যাম্প খাটে শোয় না।

"অমন করলে কি শরীর টিকবে? তোমার অত মাথাব্যথা কেন? দেশ কি শুধু তোমার একার? না তুমিই তার মাথা?" যূথিকা রাগ করে।

"কী করি, বল ? জেগে থাকলেই বরং আমি ভালো থাকি, ঘুমিয়ে পড়লে খালি দুঃস্বপ্ন দেখি।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"দুঃস্বপ্ন ! কী এমন দুঃস্বপ্ন শুনি ?" যূথিকা জেরা করে।

"ওসব শুনলে তুমি ভয় পাবে।" মানস দ্বিধা করে।

"না, না, তুমি বলো। আমি কি ভয় পাবার মেয়ে ?" যূথিকা পীড়াপীড়ি করে। "শুধু একটি জিনিসকে ভয়। আমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।"

মানস তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "দিনকাল বদলেছে। হিন্দুরা আর তেমন হৃদয়হীন নয়। অন্তত আমি তো নই।" কিন্তু তার কণ্ঠে ঠিক স্বরটি ফোটে না। সেও সংস্কারমুক্ত নয়।

"যাক, ওসব অলক্ষুণে কথা যাক। এখন বলো কী এমন স্বপ্ন দেখ।" যূথিকা নাছোড়বান্দা।

মানস একটু ইতস্তত করে। তার পর ধীরে ধীরে বলে, "সব কি মনে আছে ? পূর্বাপরও মনে নেই। যতসব খাপছাড়া স্বপ্ন।"

"যেটুকু মনে পড়ে বলো।" যূথিকা চাপ দেয়।

"তোমাকে বলেছি আমাদের এখানে একটা র‍্যালিং পয়েণ্ট আছে। অফিসারদের আর তাদের পরিবারদের জন্যে। সাইরেন বাজলেই সেখানে গিয়ে জড়ো হতে হয়। চারদিকে কড়া পুলিশ পাহারা। মারমুখো জনতা সেখানে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কিন্তু দিনের পর দিন ঘেরাও করে যদি রাখে, খোরাক সংগ্রহ করতে না দেয়, খাবার জল ফুরিয়ে যায়, তখন কী উপায় ? সময়ে যদি রিলিফ না পৌঁছয় তা হলে তো মরণ অথবা আত্মসমর্পণ। স্বপ্ন দেখি র‍্যালিং পয়েণ্টে পুরুষ বলতে একমাত্র আমি। আমার উপরই আর সকলের নারী ও শিশু রক্ষার ভার। অর্জুনের মতো আমার হাতে গাণ্ডীব অর্থাৎ রাইফেল। কিন্তু যখন তুলে ধরতে যাই তখন দেখি এত ভারী যে বইতে পারছিনে। আমি দিশেহারা। গুণ্ডারা মহাভারতের দস্যুদের মতো যাদবকন্যাদের হরণ করে নিয়ে যায়, কেউ কেউ হাসিমুখে যায়, আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। আমার হাত পা অসাড়। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।" মানস মুখ নিচু করে বলে যায়।

"ওদের মধ্যে কি আমিও ছিলুম ?" যূথী জেরা করে।

"তা তা—ইয়ে—ঠিক মনে পড়ছে না।" মানস পাশ কাটাতে চায়।

"তার মানে ছিলুম। তুমি বলতে লজ্জা বোধ করছ। এবার বলো আমার হাসিমুখ দেখেছিলে?" যূথী আবার জেরা করে।

"কই, না। তেমন তো মনে পড়ছে না।" মানস বলতে ভয় পায়।

"ঠিক মনে পড়ছে। তবে তোমাকে বলে রাখি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তেমনি, নারীও বীরভোগ্যা। যে তাকে ধরে নিয়ে যায় সে তারই হয়।" যূথী পরিহাস করে।

মানস তা শুনে দুঃখ পায়। মৌন থাকে। তখন যূথিকা গম্ভীর মুখে বলে, "তা হলে যা বলি শোন! গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে সেটা নিবারণ করাই সুবুদ্ধি। গৃহযুদ্ধে হিন্দুরাই হয়তো জিতবে, কিন্তু তাদের নারীরা মান বাঁচাবার জন্যে জহর ব্রত করবে। আগুন জ্বালিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে। অন্তত একজন যে করবেই এখন থেকেই তার নোটিস দিয়ে রাখি। যদি পরিস্থিতি আলাউদ্দীন খিলজির আমলের মতো হয়। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সেদিনও যেমন ছিল আজকেও তেমনি রয়েছে। অন্তত কতক মুসলমান আছে যাদের হাতে নারী আর গোরু নিরাপদ নয়। আর হিন্দুদের কাছে এ দুটিই সব চেয়ে মূল্যবান। গোরুকে সরাতে বলব না, কিন্তু সময় থাকতে নারীকে সরাতে হবে। ইংরেজরা যা করছে। মেমসাহেবরা এখন থেকেই ভারত ছাড়ছেন। কেউ যাচ্ছেন বিলেত। কেউ অস্ট্রেলিয়া। এই যে নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এঁর মেমসাহেব নিউ জীল্যাণ্ডের মেয়ে। তিনিও চলে গেছেন বাপের বাড়ী। আমিও যেতুম, কিন্তু আমার তো বাপের বাড়ী নেই।" যূথিকার গলা ধরে আসে।

মানস কেমন করে তাকে আশ্বাস দেবে? কোন্ ভাষায়? বলে, "তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই তোমাকে যেতে দেব। কিন্তু আমাকে এই জেলায় থাকতেই হবে। আমার উপর নির্ভর করছে বহু হিন্দুর মনোবল। তবে ডেনিস রিকম্যান থাকতে ভাবনার কিছু নেই। ছেলেটি খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ ও ভদ্র। তেমনি সাহসী ও অসাম্প্রদায়িক।"

যূথিকা আশ্বাস মানে না। "তুমি কি বুঝতে পারছ না এই হচ্ছে জিন্না সাহেবের লাস্ট চান্স? পাকিস্তান হাসিল করতে না পারলে তাঁর কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে? তিনি কি হাল ছেড়ে দেবার আগে একবার মরণ কামড় দেবেন না? সে কামড়ে ইংরেজরাও কি জখম হতে পারে না? সর্বত্র না হোক, কতকগুলো জায়গায় না ইংরেজ রাজ, না কংগ্রেস রাজ, কোনোটাই

থাকবে না। মুসলিম লীগের চাঁইরা গুণ্ডা রাজ কায়েম করবে। যাকে বলতে পারো গুণ্ডার্কি। তেমন জায়গায় গুণ্ডারাই জজ, গুণ্ডারাই ম্যাজিস্ট্রেট, গুণ্ডারাই পুলিশ, গুণ্ডারাই জেলর, গুণ্ডারাই ফাঁসুড়ে। তাদের একমাত্র ভয় মিলিটারিকে। কিন্তু মিলিটারির ভিতরেও মুসলিম লীগের সমর্থক রয়েছে। ওরা গুণ্ডাদের দিকেই ভিড়ে যাবে। তখন এক রেজিমেণ্টের সঙ্গে আরেক রেজিমেণ্টের যুদ্ধ। পুরোদস্তুর গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক না কেন মানুষের প্রাণ আর নারীর মান দুটোই জুয়াখেলার পণ। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবার আগে শতবার ভাবতে হয়। যোদ্ধারাও প্রাণ হারায়, তাদের নারীরাও মান হারায়। যদি না জহরব্রতে মরে। আমার মত হচ্ছে মুসলিম লীগকে এমন কিছু অফার করা যার উপর ইংরেজরা নীলাম ডাক ডাকতে না পারে। সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়া। আসামের মায়া কাটানো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভার তার উপর ছেড়ে দেওয়া। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তবে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশভাগ করা। ক্যাবিনেট মিশন স্টেটমেণ্টে তার আভাস আছে। বড়লাটই মধ্যস্থ হয়ে উভয় পক্ষকে রাজী করাতে পারেন। ওদেরও তো গরজ কম নয়। ওরা ভালোয় ভালোয় সৈন্যসামন্ত সরাতে চায়।"

মানস মাথা নাড়ে। "না, শেলী। বাপু কক্ষনো রাজী হবেন না, ওটা হবে ভারতমাতার জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ। কংগ্রেস? সে তো তিনিই।"

যুথিকার মত সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। "বাপু যদি বলেন 'না' তবে আমিও বলব, 'না।' কে জানে তিনি হয়তো একটা মিরাক্ল ঘটাতে যাচ্ছেন। একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে মুসলমানরা যদি একবাক্যে বলে, 'ভারতমাতা আমাদেরও মাতা। আমাদের আর কোনো মাতা নেই। হিন্দুরা আমাদের ভাই। আমরা তাদের সঙ্গে লড়ব না। ঘরোয়া মিটমাট চাই। বিদেশীর মুখাপেক্ষী হব না। কায়দে আজম মহাত্মাজীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে ফয়সালা করুন।' আহা! সত্যি কি এমন দিন আসবে!"

মানস শুধু বলে, "সে রকম একটা সম্ভাবনা আছে বইকি। কংগ্রেস যদি ক্ষমতা না চায়, গঠনের কাজ নিয়ে থাকে।"

"ওটা হয়তো দেশভাগ নিবারণ করবে, কিন্তু বাংলাদেশে মুসলিম লীগের গুণ্ডার্কি বন্ধ করতে পারবে না। যদি না মুসলমানদের অন্তঃপরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বাপুর নোয়াখালীর মিশন সফল হয়।" যুথিকা ভাবে।

মানস একমত হয়। "হ্যাঁ, সেটার উপরেই ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে। ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে। মুসলমানদের অধিকাংশের হয়নি। অপেক্ষা করলে সেটাও সম্ভব। কিন্তু ঘটনার গতি অপেক্ষা করবে কি? দেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। এই অবস্থায় ইংরেজ চলে গেলে এর শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবে কে? মুসলিম লীগ? সঙ্গে সঙ্গে শিখদের সঙ্গে তার বেধে যাবে। সারা ভারতের ভার তার হাতে সঁপে দেবার আগে ইংরেজরা দশবার ভাববে। নয়তো শিখ সৈন্যরাই তাদের কোতল করবে। শিখদের বক্তব্য হলো ভারত যদি অখণ্ড থাকে তবে তারা শিখিস্থান চাইবে না, যদি দ্বিখণ্ড হয় তবে শিখিস্থান দাবী করবে ও তার জন্যে লড়বে। লড়কে লেঙ্গে শিখিস্থান। ওরফে খলিস্থান।"

যূথিকা কৌতূহলী হয়ে সুধায়, "আচ্ছা, খলিস্থান বলতে কী বোঝায়? খালি জায়গা? খালি জায়গা কি কোথাও আছে?"

"খলি বলতে বোঝায় পবিত্র। যেমন খলসা। খলিস্থান হচ্ছে শিখদের পক্ষে পবিত্র স্থান, যেমন পাকিস্তান হচ্ছে মুসলমানদের পক্ষে পবিত্র। কিন্তু এমন একটাও জেলা নেই যেখানে শিখদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। শিখ নেতারা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কি সব? সম্পত্তি কাদের বেশী? মুসলমানদের না শিখদের? কাদের হাত থেকে ইংরেজরা পাঞ্জাব নিয়েছিল? মুসলমানদের না শিখদের? গোটা পাঁচ ছয় শিখ রাজ্য এখনো রয়েছে। কাদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হবে? মুসলমানদের না শিখদের? এসব যুক্তি অকাট্য। তাই পাকিস্তানে চট করে রাজী হচ্ছে না ইংরেজ। শিখরা কিছুতেই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সামিল হবে না। অথচ হিন্দুস্থান নামক রাষ্ট্রেরও কি সামিল হতে রাজী হবে? না, তাতেও তাদের আপত্তি। তাদের মতে তারা একটি স্বতন্ত্র নেশন। তাদের আপত্তি খণ্ডন করার জন্যে কংগ্রেস অভয় দিচ্ছে, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হবে একটি সেকুলার স্টেট, যেখানে কোনো ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্ম করা হবে না। যে রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র হবে না। সেখানে যে যার নিজের ধর্ম আচরণ করবে। কেউ ধর্মীয় কারণে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে না। কেউ সেই কারণে বিশেষ অসুবিধা পোহাবে না। এখন শিখরা এতে আশ্বস্ত হলে হয়। মুসলিম লীগ এমন একটা কুদৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে যে এর অনুসরণ করলে শিখরা হবে না-ঘরকা না-ঘাটকা।" মানস উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে।

নোয়াখালীর ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে মানস ইতিমধ্যে তার লাঠিদের চেনা

অচেনা বহু অফিসারকে চিঠি লিখেছিল। তাঁদের কেউ ইংরেজ, কেউ হিন্দু, কেউ বা মুসলমান। চিঠির বয়ান ইংরেজদের বেলা একরকম, হিন্দুদের বেলা আরেক রকম, মুসলমানদের বেলা আরো এক রকম।

ইংরেজদের লিখেছিল, "শুনছি আপনারা অচিরে এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছেন। তাকে কী অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন ভেবে দেখেছেন কি? বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে একজনও হিন্দু নারী নিরাপদ নয়। আপনারাও তাদের রক্ষা করছেন না, হিন্দুরাও যে রক্ষা করবে তারও উপায় নেই, কারণ তারা নিরস্ত্র। হিন্দুনারীর সম্মান একবার গেলে চিরকালের মতো যায়। হিন্দু পুরুষরা এর কোনো প্রতিকার জানে না। দুর্বৃত্তদের এর থেকে নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় তাদের নিধন। তার জন্যে চাই তাদের অস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। আপনারা যদি আর কিছু না করেন তবে এই অন্যায়ের নিন্দাবাদ করুন। তা নইলে লোকে ধরে নেবে যে আপনারা এর পেছনে আছেন। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।"

হিন্দুদের লেখে, "হিন্দু নারীর এ অসম্মান আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আঙুলটি নাড়তে পারছিনে। যেহেতু আমরা সরকারী চাকুরে ও সার্ভিস রুলসের অধীন। কী করা যায়, বলুন তো? দলবদ্ধ হয়ে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো যায় না? গভর্নরের এখনো যথেষ্ট সংরক্ষিত ক্ষমতা রয়েছে। তিনি কি শুধু মুসলমানদের গভর্নর? হিন্দুদের কেউ নন? ইংরেজ শাসনের গোড়ায় সবাইকে অভয় দেওয়া হয়েছিল যে কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না। অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুদের ধরে ধরে মুসলমান করা হচ্ছে। কলমা পড়ানো হচ্ছে। গোমাংস খাওয়ানো হচ্ছে। যাতে তারা স্বধর্মে ফিরতে না পারে! এ বিষয়ে হিন্দুদের দুর্বলতা আছে। গোরু খেয়ে একবার যদি জাত গেল তো বরাবরের জন্যে গেল। তেমনি রাবণের হাতে একবার পড়লে সীতার আর নিস্তার নেই। তাকে শেষপর্যন্ত পাতালপ্রবেশ করে সব জ্বালা জুড়োতে হবে। প্রতিকার যেখানে নেই সেখানে নিবারণই তো শ্রেয়। কিন্তু কেমন করে?"

আর মুসলমানদের লেখে, "আপনাদের অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষপাতী। কিন্তু পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে হিন্দু বলে কি কোনো ধর্ম সম্প্রদায় থাকবে না? থাকলে তাদের নারীদের সম্মান বলে কি কোনো পদার্থ থাকবে না? যে কোনো মুসলমান সেটা হরণ করতে পারবে? এমনতরো পাকিস্তানে কি

কোনো হিন্দু সম্মতি দিতে পারে ? তার বিনা সম্মতিতে কি তাকে পাকিস্তানের শামিল করতে পারা যাবে ? নোয়াখালীতে যা ঘটেছে সেটা কি পাকিস্তানের নমুনা ? কারো কণ্ঠে একটি প্রতিবাদের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না কেন ? আমরা কতকাল একসঙ্গে আছি। হিন্দু মুসলমানকে ছেড়ে, মুসলমান হিন্দুকে ছেড়ে বাঁচবার কথা কখনো ভাবেনি। এখন থেকে ভাবতে হবে নাকি ?"

এসব চিঠির উত্তর একে একে আসতে আরম্ভ করে। অবশ্য সকলেই জবাব দেন না। কারো জবাব সহানুভূতিশীল, কারো জবাব বেদরদী, কারো জবাব কটুকথায় ভরা, কারো জবাব উপদেশপূর্ণ। বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

এক আয়ারল্যাণ্ডবাসী জেলা জজ লেখেন, "প্রথমে মনে হয়েছিল আপনি একজন এজেন্ট প্রোভোকেটর। তা নয়, আপনি একজন উগ্র ন্যাশনালিস্ট। আপনার অন্তর বিদ্বেষ বিষে জর্জর। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ায় আমাদের কী ? আমরা কেন বিচারের আগেই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করব ? আমরা প্রোফেসনাল মেন। সেই নিরিখেই আমাদের যা মূল্য। আমাদের আইনে বিনা বিচারে কাউকে দণ্ড দেওয়া চলে না। আপনি আমাদের অকারণে উস্কানি দিচ্ছেন।"

এক ইংরেজ হাইকোর্ট জজ লেখেন, "যেসব কথা পড়ছি সেসব সত্য হলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু রোগের চেয়ে রোগের যে দাওয়াই নির্দেশ করেছেন সে দাওয়াইটা যে আরো খারাপ। নারীর সম্মান একদিন না একদিন ফিরে আসতে পারে, আমাদের সমাজে আসে। কিন্তু মানুষের প্রাণের দীপ একবার নিবিয়ে দিলে আর জ্বালানো যায় না।"

এক স্কটল্যাণ্ডবাসী কমিশনার লেখেন, "গোলাম সারওয়ারকে তো আমি জেলে পুরে এসেছিলুম। ওকে খালাস করল কে ? আমি বরাবরই বলে আসছি যে রাজনৈতিক আন্দোলন যত ইচ্ছা চালানো হোক। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা যেন সব সময় বজায় থাকে। আমরা রাজনীতিকদের আশা আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিইনে, কিন্তু আইন ভঙ্গ করলে সাজা দিই।"

ভারত ত্যাগ সম্বন্ধে একটি কথাও কেউ ঘূণাক্ষরে ফাঁস করেন না। তবে একটা বিহ্বল সুর বাজে। সকলেই এখন প্রস্থানের দিন গুণছেন।

একজন প্রবীণ হিন্দু জজ লেখেন, "আগে বলসঞ্চয় করতে হবে। নইলে এর প্রতিকার সম্ভব হবে না।"

আরেকজন প্রবীণ হিন্দু জজ লেখেন, "নিষ্ফল আক্রোশে নিজের হৃৎপিণ্ড নিজেই বার করে খাচ্ছি। আপনার সঙ্গে আমিও আছি। কিন্তু দলবদ্ধ হওয়া সহজ নয়। আমরা যে সরকারী চাকুরে!"

আরেকজন প্রবীণতর হিন্দু জজ আশীর্বাদ করেন, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। জীতা রহো।"

একজন হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, "পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তবু মিলিটারিকে ডাকলে ফল আরো খারাপ হবে।" মানসের চিঠিতে সে রকম একটা প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছিল।

একজন তরুণ বাঙালী মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, "আমাদের খবরের কাগজগুলো হলদে রঙের কাগজ। খবর বানাতে বা অতিরঞ্জন করতে ওস্তাদ। যা ঘটেছে তার চেয়ে বহুগুণ রটেছে। হিন্দুদের অযথা রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভয় পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি ঘটনাস্থলে গেলে দেখবেন আপনার উদ্বেগ মাত্রাতিরিক্ত।"

আরেকজন অভিজ্ঞ পাঞ্জাবী মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন, "পাকিস্তান যখন হবে তখন দেখবেন সেটা একটা আদর্শ রাষ্ট্র। সেখানে সবাই সুখে শান্তিতে বাস করছে। কী মুসলিম, কী হিন্দু। নোয়াখালী তার নমুনা নয়। সেখানে সামান্য যা হয়েছে তা হিন্দুরা পাকিস্তানবিরোধী প্রোপাগাণ্ডার কাজে লাগাচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

বিহারের ঘটনা শুনে মানস ফলস পোজিশনে পড়ে। বিহারের মুসলিম বন্ধুদের কী বলে সান্ত্বনা দেবে? আরেক প্রস্থ চিঠি লেখে। বলে, "বাংলাদেশের সরকার যদি আইনের শাসন বলবৎ না করে বিহারে লোকজন মরীয়া হয়ে আইনকে নিজের হাতে নেবেই তো। এটাও খারাপ ওটাও খারাপ। আমি গভীরভাবে দুঃখিত। আসুন, এ আগুন সবাই মিলে নিবিয়ে দিই। জিন্না সাহেবেরও বোঝা উচিত তিনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন।"

॥ সাত ॥

বিহারী মুসলিম বন্ধুদের চিঠি লেখার সময় মানস জানত না যে মুসলিম নারীদেরও হরণ করা হয়েছে। খবরের কাগজ এ বিষয়ে নীরব। পরে যখন খবরটা কর্ণগোচর হয় তখন মানস মরমে মরে যায়। হিন্দুরাও যে অমন কাজ

করতে পারে এটা নতুন কথা নয়, কিন্তু সেটা কেবল হিন্দু নারীর বেলা। মুসলিম নারীকে হরণ করার মামলা তার কোর্টে বহুবার এসেছে, কিন্তু আসামীরাও মুসলমান।

মানসের চিত্ত নৈতিক সঙ্কটে দোলাচল। সুমতি বলে, মুসলিম বন্ধুদের আবার লেখ। ক্ষমা চাও বিহারী হিন্দুদের হয়ে। এ তোমার এ আমার পাপ। কুমতি বলে, বিহারী মুসলমানরাও তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বলে রব তুলেছে। লড়াইতে কী না হয়? অল ইজ ফেয়ার ইন ল্যভ অ্যাণ্ড ওয়ার। নোয়াখালীতে তো মুসলমানরাই তার নমুনা দেখিয়েছে। কেউ যে নিন্দাবাদ করেছেন তাও তো নজরে পড়েনি। বুঝুক ওরা গৃহযুদ্ধ বলতে কী বোঝায়। জেহাদ মানে কী।

কুমতিই প্রবল হয়। মানস আর লেখে না। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চিন্তা করে সে তার মুসলিম বোনদের জন্যে আর কোন ব্রত নিতে পারে। এই শীতে মেজের উপর শীতলপাটি পেতে শুতে সাহস হয় না। কিংবা লেপ কম্বল মুড়ি না দিয়ে খড়ের বিছানায়। একটা কিছু করা উচিত। নইলে পাপমোচন হবে কেন? ব্যক্তিগত পাপ নয়। সম্প্রদায়গত পাপ।

কিছুদিন পরে বিহার থেকে মুসলিম শরণার্থীর ঢল নামে। তাদের অন্যত্র না বসালে তারা কলকাতায় এসে জুটবে। তাদের জন্যে মেদিনীপুর জেলার পোড়ো জমিতে শিবির খোলা হচ্ছে। ওদিকে নোয়াখালীর হিন্দু শরণার্থীরাও কলকাতা আসতে ব্যগ্র। ওদের ঠেকানো হয়েছে চাঁদপুরে শিবির খুলে। তদারক করার জন্যে পাঠানো হয়েছে সিরাজী সাহেবকে। যাঁর জায়গায় এসেছেন রিকম্যান। শরণার্থী সমস্যা এখন থেকেই গুরুতর। যখন গৃহযুদ্ধ জমে উঠবে তখন শরণার্থীর ভিড়ে শিবির উপচে পড়বে। পথ ঘাট ছেয়ে যাবে শরণার্থীতে। শহরের জনসংখ্যা ফেঁপে উঠবে। রেশনে টান পড়বে। একদিক থেকে বিহারী মুসলমান, আরেকদিন থেকে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

ফরাসীদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা নিখুঁত ছিল। তবু তারা জার্মানদের কাছে নামমাত্র যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করল কেন? কারণ জার্মান আক্রমণের তোড়ে ফ্রান্সের উত্তর দিক থেকে অসামরিক অধিবাসীরা ভেসে যায়। সবাই ছোটে রাজধানী অভিমুখে। পথঘাট শরণার্থীতে ভরে যায়। তাদের গাড়ীগুলোর জট খুলে ফরাসী সৈনিকরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে ট্যাঙ্ক ও ট্রাক নিয়ে এগোতে

পারে না। শরণার্থীদের ঠেলতে ঠেলতে জার্মান সৈনিকরা কিন্তু এগিয়ে আসে। অগত্যা ফরাসীরা রণে ভঙ্গ দেয়।

সমরতত্ত্বের গ্রন্থকারদের কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে শরণার্থী জনতা। সৈন্যসামন্ত নয়, অস্ত্রশস্ত্র নয়! রণপতিদের সমস্ত গণনা ভেস্তে দিতে পারে শরণার্থীদের গড্ডলিকাপ্রবাহ। যাঁরা বলছেন, হয় পার্টিশন নয় গৃহযুদ্ধ, আর যাঁরা বলছেন, বরং গৃহযুদ্ধ তবু পার্টিশন নয়, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না যুদ্ধ একবার জমে উঠলে উন্মত্ত জনতা কেমন অমানুষিক ব্যবহার করতে পারে। তখন সব চাল উল্টে যাবে। কেউ ধরে নিতে পারে না যে আখেরে জিৎ হবে।

যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ ও গণ সত্যাগ্রহ। এতদিন সেটা সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাতে কিছু ফলও পাওয়া গেছে। এখন কি সেই সব নৈতিক অস্ত্র প্রজাদের একভাগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে? জাতীয়তাবাদকে ওরা মনে করত ইসলামের বিশ্বজনীনতার সঙ্গে বেখাপ। ইকবাল আর জিন্না সাহেবরাই ওদের বুঝিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদও ভালো, যদি সেটার নাম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও তার আধার হয় পাকিস্তান বলে ভারতের এক খণ্ড। সোজা পথে না হয়ে বাঁকা পথে তারা জাতীয়তাবাদী হচ্ছে, দেশকে আপনার ভাবছে। এতদিন তো ধর্মই কেবল ছিল তাদের আপনার। দেশের এক অংশকে ভালোবাসাও দেশকে ভালোবাসা। ওদের সত্যিকার বিপক্ষ হিন্দুরা নয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই। কিন্তু সেকথা এখন ওদের বোঝায় কে? রোখটা পার্টিশনবিরোধীদের উপরেই। যেন এটা প্রকারান্তরে ইসলামবিরোধিতা।

মানস ক্রমে উপলব্ধি করে যে হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে বধ করে হিন্দুদেরও মঙ্গল হতে পারে না। সে উপায় সম্পূর্ণ গর্হিত। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করাই প্রকৃত পন্থা। তারা না বুঝলে অহিংস অসহযোগ বা গণ সত্যাগ্রহও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করাই শ্রেয়। আগে যেমন হয়েছে পরেও তেমনি তার থেকে আসতে পারে দাঙ্গাহাঙ্গামা। শেষে ইংরেজরাই সেসব দমন করবে। হিন্দুরা দমন করতে পারবে না। অন্তত পূর্ববঙ্গে তো নয়ই। উল্টে ওরাও যদি জেহাদ ঘোষণা করে তবে ইংরেজরাও কি পারবে দমন করতে? ইসলাম বিপন্ন শুনলে ওরা উন্মাদের মতো লড়বে।

আর নৈতিক অস্ত্র যাদের হাতে তারা কি বীর না কাপুরুষ? যদি বীর

হয়ে থাকে তবে বীরের অহিংসার নিদর্শন কোথায়? গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো নির্ভীক ক'জন? মানবপ্রেমিকই বা ক'জন? অন্তরে যদি প্রেম না থাকে, সাহস না থাকে তবে অহিংসা তো দুর্বলের অহিংসা। তেমন অহিংসার চেয়ে হিংসাই ভালো, যদি সে হিংসা চোরাগোপ্তা হিংসা না হয়। পেছন থেকে ছোরা মেরে পালিয়ে যাওয়া ও ধরা পড়লে মিথ্যা বলা বা প্রাণ ভিক্ষা করা বীরের হিংসা নয়। সেটাও কাপুরুষের কাজ। সব চেয়ে ভালো 'লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ'। তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি। পরস্পরকে পরলোকে পাঠালে ইহলোক ভোগ করবে কে?

মানস ভেবে দেখে মুসলিম লীগকে স্টেট উইদিন স্টেট না দিয়ে স্টেট আউটসাইড স্টেট দেওয়াই দূরদর্শিতা। তবে তার সে স্টেট তারই মাপে তৈরি হবে। বর্গফল সারা ভারতের চার ভাগের এক ভাগ। কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গ তো বাদ যাবেই, সিমলাসমেত পূর্ব পাঞ্জাবও বাদ। সীলেট যদি চায় আসাম ছেড়ে পূর্ববঙ্গের সামিল হতে পারবে। আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও যদি চায় পাকিস্তানেয় সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। সিন্ধুপ্রদেশ তথা বেলুচিস্থান সম্বন্ধেও সেই কথা। ক্যাবিনেট মিশনের স্টেটমেণ্টেও পাকিস্তানের সীমানির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে, যদি পাকিস্তানই হয় মুসলিম লীগের সঙ্গে সেটলমেণ্টের ভিত্তি। নয়তো স্বাধীন বঙ্গ। মানসের মতে।

সম্ভাব্য পাকিস্তানের পরিসংখ্যান জানতে মানস যায় দেবাদিদের গুহর ওখানে। গুহ এসব বিষয়ে যেমন ওয়াকিবহাল আর কেউ তেমন নন। গুহ বিস্মিত হয়ে সুধান, "পরিসংখ্যান জেনে আপনি করতে চান কী? মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দান?"

"ভাবছি।" মানস উত্তর দেয়, "আমার অন্তরে সেই পরিমাণ প্রেম নেই যা থাকলে মুসলমানদের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি। আবার সেই পরিমাণ হিংসা নেই যা থাকলে আমি মুসলমানদের প্রাণ নিতে পারি। তা হলে আমার মতে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে না দিয়ে পাকিস্তানের দাবী নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়াই শ্রেয়। পোর্শিয়া যেমন শাইলককে বলেছিলেন, এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবে নাও, কিন্তু খবরদার এক ফোঁটা রক্ত যেন না পড়ে। আমিও তেমনি বলব পাকিস্তান কেটে নিতে চাও নাও, কিন্তু হিন্দুপ্রধান অঞ্চল যেন আত্মসাৎ না করো।"

এর পর গুহ বইপত্র নাড়াচাড়া করে বলেন—খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে না

গিয়ে মোটামুটি একটা হিসাব দিচ্ছি। সারা বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যা তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ আর অমুসলিম সংখ্যা দু'কোটি সত্তর লক্ষ। সব মুসলমান যদি পূর্ববঙ্গে ভিড় করে আর সব অমুসলমান যদি পশ্চিমবঙ্গে সমবেত হয় তবে পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ আর পশ্চিমবঙ্গের দু'কোটি সত্তর লক্ষ। ধরে নিচ্ছি যে সঙ্গে সঙ্গে লোক বিনিময় ঘটবে। সেটা যদি না ঘটে তবে মিশ্র জনসংখ্যা মোটের উপর সেই রকমই হবে। এ গেল বাংলাদেশের হিসাব। আসামের মুসলিম সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ। অমুসলিম সংখ্যা সাতষট্টি লক্ষ। সীলেট যদি বাদ যায় ও আসামের সব মুসলিম সেখানে গিয়ে জড় হয় তা হলে চৌত্রিশ লক্ষ মুসলমান বাকী আসাম ছেড়ে পূর্ববঙ্গের সামিল হবে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে তিন কোটি সত্তরলক্ষের মতো। বলা যাক চার কোটি। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যাও একই রকম গণনায় হিন্দু শিখ বাদ দিয়ে ও মুসলিম যোগ করে দাঁড়াবে দু'কোটি ছাব্বিশ লক্ষ। বলা যাক তিন কোটি। তা হলে তামাম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা সাতকোটি। এর উপর আরো দু'কোটি মুসলমান চাপাতে পারো, যদি হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলি থেকে মুসলমানরা সবাই পাকিস্তানে মহাপ্রস্থান করে। কিন্তু কাটছাঁট দেওয়া পাকিস্তান কি ন'কোটি মুসলমানের ভার সইতে পারবে? লীগ নেতাদের সঙ্গে তর্ক করেছি। তাঁদের কথা হলো বিশ্বাসে মিলায় পাকিস্তান তর্কে বহুদূর। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কাটছাঁট না দেওয়া পাকিস্তানই তাঁরা পাবেন।"

"তার মানে ব্রিটেন পক্ষপাতিত্ব করবে। যেমন আগেও করেছে। সেটা এবার সম্ভবপর নয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের আটকা পড়তে হবে। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও সময়মতো স্বদেশে ফিরে গিয়ে অন্য চাকরি পাবেন না, তাঁদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট দেবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তো দেবেন না বলেই দিয়েছেন। তাঁদের অবস্থা হবে ত্রিশঙ্কুর মতো। দাপটের সঙ্গে শাসন করতেও পারবেন না। খিদমদপারি করতে হবে। আমার বিশ্বাস কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হবেই, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লীগের সঙ্গেও। যেমন হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডে।" মানস যতদূর জানে।

গুহ তা শুনে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। বলেন, "আমি তখন কেমব্রিজের ছাত্র। আয়ারল্যাণ্ডের বত্রিশটা কাউণ্টির মধ্যে ছাব্বিশটা ছিল ক্যাথলিকপ্রধান আর বাকী ছ'টা প্রটেস্টাণ্টপ্রধান। ছ টা কাউণ্টিকে অপশন

দেওয়া হয় তারা ইচ্ছে করলে আইরিশ ফ্রী স্টেটে যোগ দিতে পারবে, নতুবা বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের জন্যে আলাদা গভর্নমেণ্ট গঠন করবে ও সেটা গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ইউনাইটেড কিংডমের সামিল হবে। প্রটেস্টাণ্টদের ইউনিয়নিস্ট পার্টি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গেই ইউনিয়ন চায়, আইরিশ ফ্রী স্টেটের সঙ্গে নয়। তাদের সিদ্ধান্তই ভোটারদের সমর্থন পায়। আইরিশ রেপাবলিকান পার্টি আয়ারল্যাণ্ডের পার্টিশন মেনে নেয় না, কিন্তু অধিকাংশ আইরিশ ক্যাথলিক ওটা মেনে নেন। নইলে শুধু যে ক্যাথলিকে প্রটেস্টাণ্টে গৃহযুদ্ধ বাধত তাই নয়, ব্রিটেনের সঙ্গেও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বেধে যেত। দুই ফ্রণ্টে লড়াই। তার ঝুঁকি নেবে কে? জনমত পার্টিশনকেই মন্দের ভালো মনে করে। সেই মর্মে মীমাংসা হয় দীর্ঘসূত্রী আইরিশ প্রশ্নের। সেই মর্মে দীর্ঘসূত্রী ভারতীয় প্রশ্নেরও মীমাংসা হতে পারে। যাকে জটিলতর করেছে হিন্দু মুসলিম বা কংগ্রেস লীগ প্রশ্ন। আমরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই হব ভুক্তভোগী।"

মানস তাঁকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করে। "ভারত বিভক্ত হলেও বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকতে পারে। পার্টিশন নয়, সিসেশন। অবিভক্ত বাংলাদেশ ভারত তথা পাকিস্তানের বাইরে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিন্ন কি তৃতীয় এক জাতীয়তাবাদ হয় না? বাঙালী জাতীয়তাবাদ। বিহার ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি জুড়লে মোট জনসংখ্যা সাত কোটিরও বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রও সপ্ত কোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদ শুনেছেন। দ্বিসপ্ত কোটি ভুজে খর করবাল দেখেছেন। হিন্দু মুসলমানের এক জননীকেই বন্দনা করেছেন। দুই জননীকে নয়। ইতিমধ্যে এমন কী ঘটেছে যে বঙ্গজননী হবেন ভাগের মা?'

গুহ বিষণ্ণ স্বরে বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রই তো লিখেছেন 'বন্দে মাতরম' রব তুলে হিন্দু বাঙালীরা মুসলিম বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাঙালীরা বাংলাভাষাতেই দোহাই দেয়, 'মুই হেঁদু। মুই হেঁদু।' ওরা হিন্দু ধর্ম ছেড়েছে, বাংলা ভাষা ছাড়েনি। বাঙালী বলে যারা পরিচয় দেবে তারা ধর্মান্তরিত বাঙালীকে মেরে তাড়াবে কেন? কোথায়ই বা তারা পালিয়ে বাঁচবে? আফগানিস্থানে, ইরানে, মধ্য এশিয়ায়? না ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে? কলকাতার দাঙ্গার সময়ও 'বন্দে মাতরম্' রব উঠেছিল। এখন কানে আসছে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পেলে তাঁরা পার্টিশনে সায় দেবেন।

আহা, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কী শ্রদ্ধা। আর আমাদের প্রতি কী অনুরাগ! তর্কের খাতিরে আপনাকে আজ লোকবিনিময়ের কথা বলছি। সেটা আমার মনের কথা নয়। আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না। মুসলমানও হব না। জেলে যেতে হয় যাব। পরলোকে যেতেও আপত্তি নেই। জমিদারিটা হারাব। সেটা ইসলামের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দরুন নয়, ফরাসী বিপ্লবের বা রুশবিপ্লবের সাম্যের প্রেরণায়। নবাবদের জমিদারিও যাবে। চলবে কী করে জানিনে। বাড়ীখানা যদি রাখতে দেয় একতালাটা ভাড়া দিয়ে দোতালায় বাস করব।"

মানস ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "আপনি তা হলে secession-এ বিশ্বাস করেন না।"

"দেখুন, মিস্টার মল্লিক, ওটা শুধু কথার মারপ্যাঁচ। আয়ারল্যাণ্ডেও sec ssion শব্দটা ব্যবহার করা হয়। অথচ সেখানে দেখা গেল আলস্টারের তিনটি কাউন্টি ফ্রী স্টেটকে দেওয়া হলো, ছ'টি নর্দান আয়ারল্যাণ্ডকে। আলস্টার তো আস্ত রইল না। আয়ারল্যাণ্ডও না। তা হলে পার্টিশন হলো কি না, বলুন। তবে আমাদের বেলা যেটার সম্ভাবনা আছে সেটা সিসেশন নয়, পার্টিশন। কারণ মুসলিম লীগ চায় একই দিনে একই ক্ষণে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অনুকূলে ক্ষমতার হস্তান্তর। আয়ারল্যাণ্ডে হয়েছে আগে পরে। আগে আইরিশ ফ্রী স্টেট হয়। তার পরে নর্দান আয়ারল্যাণ্ড বেরিয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীও তেমনি একটা সূত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু জিন্না সাহেব তার বিপক্ষে। নর্দান আয়ারল্যাণ্ড ফ্রী স্টেটের সঙ্গে সমান স্টেটাস পায়নি। পাকিস্তানের জন্যে তিনি চান সমান স্টেটাস। সমান সোভরেনটি। গান্ধী জিন্না সমান। জবাহর লিয়াকৎ সমান। কংগ্রেস লীগ সমান। হিন্দু মুসলিম সমান। তাঁর মাথায় এই সব ঘুরছে। সেটা একদিক থেকে ভালো বলতে হবে। পাকিস্তান কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো ডোমিনিয়ন হবে, নর্দান আয়ারল্যাণ্ডের মতো লেজুড় হবে না।"

এর পরে মানসের আর কিছু বলার থাকে না। শোনারও থাকে না। সে উঠতে চায়। গুহ তাকে উঠতে দেন না। বলেন, "শুনুন। বাংলাদেশ যদি দু'ভাগ হয় সেটা হিন্দু স্বার্থপরতার পরিণাম। কলেজ হলো, তার নাম হলো হিন্দু কলেজ। সেখানে মুসলমানের প্রবেশ মানা। মুসলমানদের একটা জেনারেশন ইংরেজী শিক্ষার একই প্রকার সুযোগ পেল না। কলকাতার মাদ্রাসার সঙ্গে ইংরেজী ক্লাস জুড়ে দেওয়া হলো, কিন্তু সেটার দৌড় বেশী

দূর নয়। একসঙ্গে পড়াশুনা করলে যেমন পরস্পরকে চেনাশোনার ও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুতার সুরাহা হয় তেমন হলো না। সরকার থেকে হিন্দু কলেজ বিস্তর অর্থ সাহায্য পায়, সুতরাং সরকার যখন প্রস্তাব করেন সেটা সকলের জন্যে উন্মুক্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ হোক তখন হিন্দু প্রতিনিধিরা আপত্তি করেন। একজন কি দু'জন বাদে। শেষে হিন্দু কলেজ ভেঙে এক ভাগ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ, তার দুয়ার সকলের জন্যে খোলা। আরেকভাগ হয় হিন্দু স্কুল। তার দুয়ার এখনো খোলা নয়। অথচ সরকারী টাকাতেই চলে। মুসলমানদের জন্যে অন্য বন্দোবস্ত করলে আর যাই হোক একসঙ্গে পড়াশুনা ও খেলাধূলা হয় না। পরিচয়সূত্রে ভাববিনিময় হয় না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ফী বেশী বলে বিদ্যাসাগর মশায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্ররা সস্তায় পড়ে। কিন্তু শুধু হিন্দু ছাত্ররাই প্রবেশ পায়। অথচ গরিব ছাত্র মুসলমানদের মধ্যেই বেশী। তারা প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হলেও ফী জোগাতে পারে না। তাই কোনোখানেই ইংরেজী পড়াশুনার উৎসাহ পায় না। ফলে চাকরি বাকরিও জোটে না। হিন্দুরা লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়। অগত্যা মুসলমানরা চাকরির কোটা দাবী করে ও পায়। পৌর প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে সম্পত্তিগত যোগ্যতা কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতা হয় ভোটদানের শর্ত। মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য। তাই হিন্দুদেরই প্রাধান্য। নিচের স্তরে এটা লক্ষ করে মুসলমানরা উপরের স্তরে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা দাবী করে ও পায়। সেই ভেদনীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী। এর থেকে পরিত্রাণ কোনো রকম গোঁজামিলে নয়।" গুহ নিবেদন করেন।

মানস মাথা হেঁট করে শোনে। উচ্চবাচ্য করে না। তখন গুহ আবার বলেন, "ভালো নয়, মন্দের ভালো। এর চাইতেও খারাপ হতো, যদি মুসলমানরা হতো প্রত্যেকটি প্রদেশে বা অঞ্চলে মাইনরিটি। তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে চাকরিবাকরিতে উচ্চতর স্থান অর্জন করতে পারত না, রাজনীতিক্ষেত্রেও উচ্চ আসন লাভ করতে পারত না, সর্বক্ষেত্রে নিম্নতর পোজিশন পেয়ে বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। তখন তাদের দমন করতে গিয়ে সব এনার্জি ক্ষয় হতো। অবশেষে বাধ্য হয়ে গোটা কয়েক প্রদেশ ওদের জন্যে খালি করে দিয়ে স্বস্তি পাওয়া যেত। সেইখানে ওরা রাজত্ব করত। তার চেয়ে এই ভালো যে কয়েকটা প্রদেশে বা অঞ্চলে ওদের মেজরিটি হয়ে রয়েছে। অপর পক্ষ মানে মানে স্বীকার করে নিতে পারে, হার

জিতের প্রশ্ন ওঠে না। সীমান্তরেখা নিয়ে বিবাদ সালিশের দ্বারা নিষ্পত্তি হতে পারে।"

মানস সুধায়, "তাহলে কি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বঙ্গের সম্ভাবনা নেই?"

"কই, তার লক্ষণ কোথায়? তার অত্যাবশ্যক শর্ত কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। কংগ্রেস বা লীগ কোনো মহল কি তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন? যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক সেটাই সবচেয়ে উপেক্ষিত।" গুহ উত্তর দেন।

"কলকাতার দাঙ্গার আগে কোয়ালিশনের প্রসঙ্গ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু তার পর থেকে আর নয়। নোয়াখালীর পর যা শোনা যাচ্ছে তা কারো কারো মুখে বঙ্গভঙ্গের কথা, কারো কারো মুখে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বাইরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বঙ্গের কথা। ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের কথা চাপা পড়ে গেছে। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে মুসলিম লীগ যোগ দিয়েছে, কিন্তু সেটাকে বানচাল করার জন্যে। কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে লীগ সদস্যরা যোগ দেননি, দিলে সেটাকেও বানচাল করত। না দেওয়ার ফলে অন্যান্য সদস্যরা এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের অদল বদলে কংগ্রেস বা লীগ কোনো পক্ষ রাজী নন। শিখদের দিক থেকেও আপত্তি উঠেছে। যে অ্যাসেম্বলীর সদস্য সংখ্যা ব্রিটিশ ভারত থেকে দু'শো বিরানব্বই তার শিখ সদস্য মাত্র চারজন। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে একজন শিখকে জঙ্গীলাটের আসন দেওয়া হয়েছে বলে তার উপর থেকে আপত্তি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি সম্বন্ধে আপত্তি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়নি।" মানস যতদূর জানে।

"ওই দুটি রাস্তার কোনোটিতেই অগ্রগতি যেটুকু হয়েছে তার বেশী হবে না, মিস্টার মল্লিক। বৃথা আশা। নেতি নেতি সুরে দেশভাগেই পৌঁছতে হবে, হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে প্রদেশভাগেও। দেশভাগ বা প্রদেশভাগ এমন কিছু অভূতপূর্ব নয়। সেইসঙ্গে লোকভাগও যদি হয় তবে সেটা কিন্তু অভূতপূর্ব। আর সর্বনেশে। আমি তো ভাবতেই পারিনে হিন্দুরা মুসলমানদের ছেড়ে আর মুসলমানরা হিন্দুদের ছেড়ে কেমন করে বাঁচবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন বটে, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরূপ। আমার ঘোড়ার সহিস মুসলমান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান মুসলমান, বজরার মাঝি মুসলমান, হাতির মাহুত মুসলমান, পালকি বেয়ারা মুসলমান, দালানের মিস্ত্রী মুসলমান, পোশাকের দর্জি মুসলমান, টেবিলের

খানসামা মুসলমান, কিচেনের বাবুর্চি মুসলমান। আমার খোরাক আসে মুসলমান চাষী রায়তের চষা জমি থেকে, আমার কাপড় আসে মুসলমান জোলার তাঁত থেকে। আবার ধোপা হিন্দু, নাপিত হিন্দু, গয়লা হিন্দু, বেয়ারা হিন্দু, পুরুত হিন্দু, গুরু হিন্দু, পূজারী হিন্দু, মালী হিন্দু, মেথর হিন্দু, মারা গেলে মুদ্দফরাস হিন্দু। জমিদারি কর্মচারীদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। আমার বাবার আমলেও এই রেওয়াজ ছিল, আমার ঠাকুরদার আমলেও। তফাতের মধ্যে আমি টেবিলে আর কিচেনে মুসলমান নিয়োগ করেছি। তা না হলে সাহেবসুবোদের নিমন্ত্রণ করতে পারতুম না, করলে অন্যত্র বন্দোবস্ত করতুম। না, আমার কোনো গার্ডেন হাউস নেই। ওসব উপসর্গও নেই। কিন্তু যা বলতে চেয়েছি তার থেকে সরে এসেছি। হিন্দু আর মুসলমান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে হিন্দুকে রাখবে মুসলমান আর মুসলমানকে রাখবে হিন্দু। The Age of Golden Deeds is not over. বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও কাজ করছে। তার দৃষ্টান্তও আছে। কারা মেজরিটি, কারা মাইনরিটি এ গণনা তুচ্ছ। এরই উপরে দাঁড়িয়ে ইমারত গড়তে গেলে সে ইমারত শক্ত বুনিয়াদের উপর খাড়া থাকবে না। পার্টিশন একদিন রহিত হবেই, যেমন আগেও একবার হয়েছে। যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাবে তারা পরে আবার ফিরে আসবে। যারা মারের ভয়ে পালিয়ে আসবে তারাও পরে আবার ফিরে যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছিন্নমূল করে পশ্চিমবঙ্গে বা পূর্ববঙ্গে স্থাপন করা সম্ভব, কিন্তু শিকড় লাগানো সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাবুরা নিজেদের চশমায় সবাইকে দেখছেন। তবে নাটের গুরু তাঁরা নন, তিনি, যিনি এ যুগের মহম্মদ তুগলক। মহম্মদ আলী জিন্না। তুগলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে নাগরিকদের চলে যাবার হুকুম জারি করেছিলেন। দিল্লী খালি হলো, কিন্তু দৌলতাবাদ জমল না। পথে মারা গেল বা নিরুদ্দেশ হলো বা লুকিয়ে থাকল বেশীর ভাগ। আশা করি গান্ধী বা জবাহরলাল অমন পাগলামি করবেন না। যে যেখানে আছে সেখানেই তাকে রাখবেন। তুগলক আমল বেশী দিন টেকেনি। টিকতে পারে না। পাকিস্তানীদেরও সুমতি হবে। তারা লোকবিনিময়ে ক্ষান্তি দেবে।" গুহ আশাবাদী।

"আপনি যা বললেন সব সত্যি। কিন্তু লক্ষণ সুবিধের নয়। একটা ঘোরতর বিপর্যয়ের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কত মানুষের প্রাণহানি হবে, কত নারীর সম্মানহানি, কত গৃহস্থের গৃহহানি, কত কৃষিজীবীর জমিহানি, কত

ব্যবসায়ীর ব্যবসায়হানি, কত ছাত্রের ভবিষ্যৎহানি এসব ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এইসব কারণেই আমি পার্টিশনবিরোধী। যেমন ভারতের পার্টিশন তেমনি বাংলার পার্টিশন। দুটো ভুল মিলে একটা ঠিক হয় না। দুটো অন্যায় মিলে একটা ন্যায়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের গ্রহণযোগ্য কোনো সর্বসম্মত সমাধানও তো আমি বাতলাতে পারছিনে। সময় বয়ে যাচ্ছে। ইংরেজরা উড়ু উড়ু। উত্তরাধিকারী না হলেও চলে না। হলেও সেটা বিতর্কিত হবেই। তা সে কংগ্রেসই হোক আর লীগই হোক। সিভিল ওয়ার এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে তার প্রথম দিন। ফ্রান্সের ইতিহাসে সে রকম একটা দিন ছিল সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে। পনেরো শ' বাহাত্তর সালের চব্বিশে আগস্ট। প্রায় কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। তার জের অনেক দূর গড়ায়। ফ্রান্স প্রায় প্রটেস্টাণ্টশূন্য, ইংলণ্ড প্রায় ক্যাথলিকশূন্য হয়।" মানস জেগে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখে।

গুহ দার্শনিকের মতো নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, "আমরা ইংরেজ আমলের জমিদার। এদেশের ব্যারন। ওরা যেদিন কুইট নোটিস পায় আমরাও সেদিন কুইট নোটিস পাই। তার পর থেকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে সাজঘরে ঢুকে সাজপোশাক খুলে ফেলছি। 'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া গুঁড়ামাত্র আছে অবশেষে।' হাতী গেছে, ঘোড়া গেছে, ঘোড়ার গাড়ী গেছে, বজরা গেছে, সাহেবী চাল গেছে, দিশী ঠাটও গেছে। দেনা যা ছিল সব শোধ করে দিয়েছি। জনা কতক পুরনো চাকরবাকর আছে, ছাড়িয়ে দিতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু আমার কষ্ট নয়, ওদেরও কষ্ট। পাবলিকের করুণার পাত্র হতে চাইনে। দান খয়রাত একেবারে বন্ধ করে দিইনি। যাকে একশো টাকা দিতুম তাকে দশ টাকা দিই। যাতে একেবারে নিঃস্ব না হয়ে পড়ি সেদিকে নজর আছে। আমি পথের ভিখারীও হব না, কম মাইনের চাকরিও করব না। বেশী মাইনের চাকরি আমাকে কেই বা দিচ্ছে, বলুন? গণিতের নোট বুক থেকে আমার কিছু আয় হয়। দেশে গণিতের আদর যদি থাকে আমার সে আয় অব্যাহত থাকবে। অনেকদিন থেকে আমি নিখরচায় বিদ্যার্থীদের পড়িয়ে আসছি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। আমার বিশ্বাস আমার মুসলিম ছাত্ররা আমার পাশে দাঁড়াবে। ইংরেজদের সঙ্গে আমাকে একনৌকায় ভাসতে হবে না। দুশো বছর ধরে এক সাজ পরে ইতিহাসে কোন্ শ্রেণীই বা অভিনয় করে? বাংলার জমিদার শ্রেণীকেও ইতিহাসের রায় মেনে নিয়ে

মানে মানে সরে যেতে হবে। তাই আমার কোনো আফসোস নেই, জজ সাহেব।"

মানস ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নেয়। পুলিশ সাহেব ফিদা হোসেন তার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। যূথিকাকে বলছিলেন তাঁর বদলীর খবর। উচ্চতর পদে কলকাতায় বদলী। ভাগ্যবান পুরুষ। মানস অভিনন্দন জানায়।

"অভিনন্দনের কী আছে? এটা একটা ফালতু পদ। আমাকে নাকি পাঞ্জাবে পাঠানো হবে ক্যালকাটা পুলিশের জন্যে সিপাহী রিক্রুট করতে। গতবারের দাঙ্গায় ক্যালকাটা পুলিশের বহুৎ বদনাম হয়েছে। তাই নতুন রক্ত আমদানী করতে হবে।" ফিদা হোসেন চিন্তিত।

মানস সুধায়, "কেন? কর্তারা কি ফের দাঙ্গা বাধবে মনে করেন?"

"কী করে বলব? তবে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। সেটা বিহারের মুসলিম নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া। সব মুসলমান এখন একদিল যে পাকিস্তান হাসিল করতেই হবে। নইলে মুসলমান বাঁচবে না। আমি তো আগে পাকিস্তানের বিপক্ষেই ছিলুম। এখন অন্যান্য মুসলিম অফিসারদের মতো আমিও তার পক্ষে।" পুলিশ সাহেব সখেদে বলেন।

মানস দুঃখিত হয়। বলে, "বিহারের জন্যে আমি লজ্জিত। কংগ্রেস নেতারা বিব্রত। আর কখনো সে রকম হবে না। আর কোথাও হবে না।"

"না হলে তো বাঁচি। তবু পাকিস্তান হলে আরো নিশ্চিন্ত হব। আপনারাও শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলবেন, আমরাও শান্তিতে নিঃশ্বাস ফেলব। আমি এমন কথা বলব না যে আপনারা সারা বাংলা বা সারা পাঞ্জাব ছেড়ে দিন। আমি কট্টর জিন্নাভক্ত নই।" ফিদা হোসেন আশ্বাস দেন।

॥ আট ॥

সৌম্য যেদিন নোয়াখালী ফিরে যায় সেদিন বাবলী এসেছিল জুলিকে দেখতে। সেই প্রথমবার নয়, আগেও কয়েকবার দেখে গেছে। জুলির জন্যে জুলির যত না ভাবনা বাবলীর তার চেয়েও বেশী।

"আচ্ছা, সৌম্যদা, তুমি কোন্ প্রাণে তোমার বৌকে বিপদের মুখে ফেলে

রেখে যাচ্ছ? যে কোনো দিন ওর প্রিম্যাচিয়োর ডেলিভারি হতে পারে। নারীর জীবনে এত বড়ো বিপদ কি আর আছে?" বাবলী রাগ করে।

"আমরা সত্যাগ্রহীরাও একজাতের যোদ্ধা। সত্যাগ্রহ হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প। ডাক পড়লে সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হতে হয়, যুদ্ধ তাদের জন্যে সবুর করবে না। তুমি কি চাও যে আমরা যুদ্ধে হারি? তুমি কি বুঝতে পারছ না আমাদের হারজিতের উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করছে? তার মানে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য। বোন বাবলী, তুমি থাকতে আমি এমন কী বেশী করতে পারি যার ফলে জুলি নিশ্চয় বাঁচবে? নারীজাতির এই যুদ্ধক্ষেত্রে নারীই পরম সহায়। পুরুষ তো সাক্ষীগোপাল।" সৌম্য মনে করে।

বাবলী ঠাণ্ডা হয়। বলে, "তোমরা আবার এক সত্যাগ্রহের তোড়জোড় করছ নাকি? কাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ? মুসলমানদের বিরুদ্ধে?"

"না, বোন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ছাব্বিশ সাতাশ বছর ধরে অহিংস সংগ্রামে নিযুক্ত। আমাদের শিবিরে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটা চার্চিলের বিরুদ্ধে গান্ধীর সংগ্রাম। চার্চিলের সঙ্গে তলে তলে জিন্নার আঁতাত। জিন্না এই সংগ্রামটাকে হিন্দু মুসলমানের সংগ্রামে পরিণত করেছেন। আমরা যদি সতর্ক না হই তবে আমাদেরও বলা হবে হিন্দুর মিত্র মুসলমানের শত্রু। ইতিমধ্যেই রব উঠেছে গান্ধী ছুটে গেছেন নোয়াখালীতে হিন্দুদের বাঁচাতে। কই, বিহারে তো যাননি মুসলমানদের রক্ষা করতে? কী করে এদের বোঝাব যে নোয়াখালীতে হিন্দু বাঁচলে বিহারেও মুসলমান রক্ষা পাবে? বিহার ঘুরে এলুম। সেখানে যারা মুসলমানদের মেরেছে তাদের যুক্তি হলো হিন্দুরা বিহারে বদলা না নিলে নোয়াখালীর দাঙ্গা ত্রিপুরায় ছড়াত, সেখান থেকে ঢাকায়, সেখান থেকে সীলেটে। বিহারেও গান্ধীজীর যাওয়া দরকার। এই কুযুক্তি খণ্ডন করা চাই। আমি চেষ্টা করেছি। হিন্দু বন্ধুরা আমার কথা শোনেনি। মুসলিম বন্ধুরা টিটকারি দিয়েছে। বলেছে, আমাদের হাতে বন্দুক দাও, ইয়ার। অন্তত বন্দুকের লাইসেন্স পাইয়ে দাও। আমরাই আমাদের ধন প্রাণ ও ইজ্জত সম্মান রক্ষা করব। এখন এই সিভিল ওয়ার থেকে হিন্দু মুসলমানকে নিবৃত্ত করতে হবে। তাদের একজোট করে প্রস্তুত রাখতে হবে বিদেশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ওরা

যাবার আগে এমন এক চাল চালবে যার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলে মুসলিম লীগ হয় ট্রয় যুদ্ধের ঘোড়া অথবা মুসলমানরা পায় স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র। নেপথ্যে ইংরেজরাই বহাল থাকবে। যেমন রয়েছে আরব রাষ্ট্রগুলোতেও। আমরা যেটাই মেনে নেব সেটাই আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে। কোনোটা মেনে না নিলে কী হবে সেটাই চিন্তা করছি।" সৌম্যকে চিন্তাকুল দেখায়।

"কোনোটা মেনে না নিলে যেটা হবে সেটা গৃহযুদ্ধ। সেটা পেশাদার সৈনিকদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে না। নোয়াখালী আর বিহার তার নমুনা। গান্ধীজী ক'টা জায়গায় গিয়ে আগুন নেবাবেন আর তোমরাই বা ক'টা জায়গায়? তোমরাই বা ক'জন? পরিস্থিতি অবশেষে আমাদের হাতে এসে পড়বে। গৃহযুদ্ধকে আমরা শ্রেণীযুদ্ধের মোড় দেব। জমিদার বনাম প্রজা, জোতদার বনাম চাষী, কলওয়ালা বনাম মজদুর, মহাজন বনাম খাতক, ভদ্রলোক বনাম ধাঙড়। আমরা হিংসা অহিংসার ভেদ মানিনে। যাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় তাই করণীয়। হয়তো রক্তের নদী সাঁতরে পার হতে হবে।" বাবলী বলে যায়।

"One more river, one more river, one more river to cross. ইংলণ্ডে শুনেছিলুম এইরকম একটা গান। হ্যাঁ, স্বাধীনতার তীরে পৌঁছতে হলে আরো একটা নদী পার হতে হবে। আমরাও বুঝি সেকথা। কিন্তু সেটা রক্তের নদী কেন হবে, বোন? আর তোমরাই বা কেন সেটাকে শ্রেণীযুদ্ধের রূপ দেবে? আমাদের একটা সুযোগ দাও। আমরা অহিংসভাবেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয় সুবিধা-ভোগীর স্বার্থে নয়। অগণিত দীনহীনের জন্যেই। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব ভুলে যাই তোমরা আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ো। তার জন্যে কারো রক্তপাত করতে হবে না। নির্বাচনে হারিয়ে দিলেই আমরা হটে যাব। গঠনের কাজ নিয়েই থাকব।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

জুলি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "ভাই বাবলী, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কি একটিমাত্র পন্থা আছে? লেনিন যা দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ লেবার পার্টির দিকে তাকাও। কত বড়ো একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে ওরা বুলেট ছেড়ে ব্যালটের মাধ্যমে। আমরা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমেও আরো একটা বিপ্লব ঘটাতে পারি। আগে তো স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হই।"

"কী করে সফল হবে, ভাই? মুসলিম লীগকে যদি তার পাওনা এক

পাউণ্ড মাংস না দাও? মাংস কেটে নিলে রক্ত পড়বেই।" বাবলী তর্ক করে।

"আমরা সবটাই মুসলিম লীগকে ছেড়ে দেব।" সৌম্য উত্তর দেয়। "কিন্তু একটি শর্তে। ভারতকে ভাবী মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ রাখতে হবে। স্বাধীন ভারত মার্কিন পক্ষেও লড়বে না, রুশ পক্ষেও লড়বে না। তোমাদের বিপ্লবের পর তোমরা তো রুশ পক্ষে লড়বে ও ভারতকে জড়াবে। সেটা হবে অকারণে মার্কিনকে শত্রু করা। পরিণাম হবে জাপানের মতো ভয়াবহ। লীগ সরকার মার্কিনপক্ষ নিলে আমরা লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে নামব।"

বাবলী কী ভেবে বলে, "সত্যাগ্রহও হিংসা প্রতিহিংসার রূপ নিতে পারে। মুসলিম লীগ মুসলিম জনতাকে লেলিয়ে দেবে। যেমন ষোলই আগস্টের দিন। হিন্দু জনতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে না। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়ে নেবে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ এক জিনিস, লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অন্য জিনিস। ব্রিটিশ পক্ষে জনতা ছিল না। লীগ পক্ষে জনতা থাকবে। ইংরেজরা ধর্মের নামে লড়ত না। লীগপন্থীরা ধর্মের নামে লড়বে। তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছ, সৌম্যদা।"

"হিংসা প্রতিহিংসার এই ভিসাস সার্কল ভঙ্গ করতে হবে আমাকে। আজ এটাই আমার প্রাথমিক কর্তব্য।" সৌম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জুলি তা শুনে বলে, "তা হলে তুমি আগে মুসলমানদের বাঁচাও। বিহারে ফিরে যাও। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পাশে বাপুজী রয়েছেন।"

"বিহারের মুসলমানদের পেছনে সেখানকার সরকার রয়েছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পেছনে এখানকার সরকার নেই। সেইজন্যে বাপুকেই থাকতে হচ্ছে। আমাদের কর্তব্য তাঁকে নোয়াখালী থেকে খালাস দেওয়া। তা হলে তিনি বিহারে যেতে পারবেন।" সৌম্য খোলসা করে।

"ছোটবোনের একটা আবদার শোন, দাদা। যেখানেই যাও শহীদ হতে যেয়ো না। তোমার বা তোমাদের শাহাদতে মুসলিম লীগের হৃদয় গলবে না। সে হৃদয় অধিকাংশ মুসলমানেরও হৃদয়। যেমন হৃদয়হীন ভাবে ওরা গোরু কাটে তেমনি কসাইয়ের মতো ভারতকেও কাটবে। হিংসা থাকলে প্রতিহিংসাও থাকে। হিন্দুদেরও কতক অংশ বলতে শুরু করেছে ওরাই বা কালীঘাটের খাঁড়া দিয়ে পাঁঠাবলির মতো বাংলাদেশকে বলি দেবে না কেন? দু'দিকেই ধর্মীয় যুক্তি। মানুষ যেন হিন্দু বা মুসলমান ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারতীয় নয়, বাঙালী নয়, মালিক নয়, শ্রমিক নয়, বুদ্ধিজীবী নয়, কৃষিজীবী নয়, ক্যাপিটালিস্ট নয়, কমিউনিস্ট নয়, শিল্পী নয়, সমজদার নয়। আমরা ধর্ম জিনিসটারই বিপক্ষে। তাই আমরা এর মধ্যে নেই। এই ভাগাভাগি, ভাঙাভাঙির মধ্যে। তবে একথাও ভেবে রেখেছি যে পাকিস্তান হলে আমরা সবাই সেখান থেকে চলে আসব না, সেখানেও আন্দোলন চালাব। তাই পাকিস্তান স্বীকার করে নেব। আমরা বাস্তববাদী। যাতে কার্যোদ্ধার হয় সেটাই আমাদের নীতি।" বাবলী মন খুলে বলে যায়।

"তোরা একটার পর একটা বোকামি করেছিস। এটাও সেইরকম একটা বোকামি। ইসলামকে জিতিয়ে দিলে ইসলামই তোদের ঘাড় মটকাবে, বাবলী। যাক, তোর সঙ্গে আমি একমত যে শাহাদতে চিঁড়ে ভিজবে না। তোর দাদার জানা উচিত যে চার্চিল জিন্না অ্যাকসিস অত সহজে ভাঙবে না বা মচকাবে না। লেবার পার্টিকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। অ্যাটলীকে আর ক্রিপসকে হাতছাড়া করার মতো বোকামি আর নেই। জবাহর ঠিক পথেই চলছেন। বাপুর দিক থেকে বাপুও ঠিক। দেশ একটাই হোক আর দুটোই হোক হিন্দুকে মুসলমানের সঙ্গে আর মুসলমানকে হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করতে হবে। যেমন নোয়াখালীতে তেমনি বিহারে, তেমনি সিন্ধুপ্রদেশে, তেমনি দক্ষিণ ভারতে। দেশভাগ হলেও লোকভাগ যাতে না হয় তার জন্যেই বাপুর এই নোয়াখালী মিশন। আমারও মন চাইছে উড়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে, কিন্তু দেহ নড়তে চাইছে না। তোর দাদাই যান। আমার জন্যে ওঁকে থাকতে হবে না। মা আর মাসী রয়েছেন।" জুলি তাই নিশ্চিন্ত।

বাবলী ক্ষেপে যায়। "আমাদের বোকামি না তোদের নেতাদের খোকামি? কোলের শিশুও বুঝতে পারে যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে লড়তে গেলে হিটলার হারবেই আর হিটলার হারলে ব্রিটেন জিতবেই। তেমনি, আমেরিকার সঙ্গে লড়তে গেলে জাপান হারবেই আর জাপান হারলে ব্রিটেন জিতবেই। তা হলে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে শক্তি ক্ষয় করার দরকারটা কী ছিল? এখন গৃহযুদ্ধের বেলা শক্তি কম পড়ছে না? আপস না করে চারা আছে?"

সৌম্য দুঃখিত হয়। বলে, "আমাদের সেদিন 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ঝাঁপ না দিয়ে চারা ছিল না, বোন। আমরা ইংরেজদের দুর্যোগের সুযোগ

নিতে চাইনি, ওদের দুর্দিনে ওদের পাশে দাঁড়াতেই চেয়েছি। কিন্তু ওদের প্রজা বা তাঁবেদার হিসাবে নয়, ওদেরই মতো স্বাধীন জাতি হিসাবে। কিছুতেই ওদের বোঝানো গেল না যে আমাদের দেশরক্ষা আমাদেরই দায়িত্ব ও দায়িত্বের সমপরিমাণ ক্ষমতাও থাকা চাই। আমাদের সহযোগিতা পাবে অথচ আমাদের সম্মান দেবে না, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে আর কী করলে ভালো হতো ? পরে যখন জাপান এসে সীমান্তে হাজির হয় তখন দেখা গেল প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়। প্রতিরোধ করতে হবে। তার আগে জাতীয় সরকার গঠনের চেষ্টা আবার করা হলো। সিভিল পাওয়ার ওঁরা অনেকখানি ছাড়বেন, কিন্তু মিলিটারি পাওয়ার মুঠোর মধ্যে রাখবেন। যুদ্ধকালে সেইটেই তো আসল। মিলিটারি হাতে পেলে আমরা জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ করতুম। তা যখন সম্ভব নয় তখন অসামরিক প্রতিরোধই করতে হলো একই কালে দুই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীর বিরুদ্ধে। যারা অকুপেশনে অবস্থিত আর যারা অকুপেশনে অগ্রসর। ওদের মতলব এক পক্ষ হটতে হটতে যাবে, আরেক পক্ষ হটাতে হটাতে এগোবে। যাবে যারা তারা আগন্তুকদের হাতেই বরং ক্ষমতা তুলে দিয়ে যাবে, তবু আমাদের হাতে তুলে দেবে না। কারণ পরে ওদের হাত থেকে ফিরে পাবে, আমাদের হাত থেকে ফিরে পাবে না। মাঝখান থেকে আমাদের দেশ হবে দুই বিদেশীর যুদ্ধক্ষেত্র। তারা পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়ে আমাদের খোরাক থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে, আমাদের কল-কারখানার উপর বন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করবে, আমাদের লোকদের ঘরবাড়ী পোড়াবে। এর নাম পোড়ামাটি নীতি। লক্ষ লক্ষ মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে পালাবে, সৈনিকরাও যে পালাবে না তা নয়। তারা মার্সিনারি সৈনিক, রাজার জন্যে লড়ছে, দেশের জন্যে নয়। এমন যে পরিস্থিতি এতে আমাদের কর্তব্য হলো ইংরেজ ও জাপানী উভয়ের মাঝখানে জায়গা নিয়ে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করা। তার জন্যে আমরা রেল লাইন ভেঙেছি, পুল উড়িয়ে দিয়েছি, টেলিগ্রাফের তার কেটেছি। ফলে ইংরেজরাও এগোবার পথ পায়নি, জাপানীরাও এগোবার পথে বাধা পেয়েছে। এ অবস্থা অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে ক'মাস হয় সে ক'মাস আমরাই আমাদের প্রভু। সেই যে স্বাধীনতার স্বাদ সে স্বাদ যারাই পেয়েছে তাদেরই জীবন সার্থক হয়েছে। তার জন্যে মরেও সুখ আছে। কতক কর্মী স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে, মানুষ খুন করেছে, জরিমানা উশুল করেছে, জমা দেয়নি। তবে সাহেব খুন করেছে

বলে শোনা যায়নি। বরং সাহেবদের গুলীতেই মরেছে। সব দলেই কয়েকটা কালো ভেড়া থাকে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। সাহেবরাও নয়। যাই হোক, এখন ওদের অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে। সকলের না হোক অধিকাংশের। অ্যাটলীর দিকেই অধিকাংশ ভোট। চার্চিলের দিকে নয়। চার্চিল গোষ্ঠী ক্ষমতায় ফিরে আসার আগেই লেবার পার্টির সঙ্গে আমাদের মিটমাট করতে হবে। মিটমাটকে যদি আপস বলো তো আপস সব সময় মন্দ নয়। যা চেয়েছি তার সমস্তটা হয়তো পাব না, বাদ সাধবে মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের পেছনে অধিকাংশ মুসলমান। তাদের সঙ্গে দর কষাকষি বৃথা, বল কষাকষিও বিজ্ঞতা নয়। অবশ্য কালক্রমে মুসলিম জনগণের জ্ঞানোদয় হবে। কিন্তু ইংরেজ বা কংগ্রেস কেউ ততদিন অপেক্ষা করবে না।"

"অপেক্ষা করবে না তো কী করবে?" বাবলী সুধায়।

"লীগ সদস্যরা যদি যৌথ দায়িত্ব না মানেন কংগ্রেস সদস্যরা পদত্যাগ করবেন। মিটমাট করতে না পেরে বড়লাট সদলবলে ভারতত্যাগ করবেন। সেটা কী করে এড়ানো যায় সেই নিয়েই আলাপ আলোচনা চলেছে দিল্লীর সঙ্গে লণ্ডনের। এই সম্প্রতি নেহরু আর জিন্না লণ্ডন ঘুরে এলেন। দু'জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অ্যাটলী একটা সূত্র বার করেছেন। জনসংখ্যার বৃহৎ কোনো অংশের সহযোগিতা বিনা যদি কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় তবে সে শাসনতন্ত্র ভারতের অনিচ্ছুক অংশগুলির উপর ব্রিটিশ সরকার চাপিয়ে দেবেন না। তার মানে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাদেশ যদি অনিচ্ছুক হয় তবে তারা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সামিল হবে না। কিন্তু কিসের সামিল হবে সেটা স্পষ্ট নয়। পাকিস্তানের উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ পাকিস্তানে না-ও যেতে পারে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকতে পারে। একই কথা খাটে পাঞ্জাবের বেলাও। সমগ্র পাঞ্জাব পাকিস্তানে যাবে শুনলে শিখরা তুলকালাম কাণ্ড করবে। হিন্দুরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তেমনি, সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানে যাবে শুনলে হিন্দুরাও মারমুখো হবে। তা হলে কি প্রদেশভঙ্গ হবে? অ্যাটলী সেটা কংগ্রেস ও লীগের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি কারো উপর কিছু চাপাবেন না। প্রদেশভঙ্গ করতে চাইলে নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালাতে হবে। নইলে মারামারি বেধে যাবে। গৃহযুদ্ধ হয় তো এই সংকীর্ণ ইস্যুতেই হবে। বাপুজী এরকম ইস্যুর দায়িত্ব নেবেন না। কোথায় যুদ্ধ ও শান্তির মতো মহান প্রশ্ন আর কোথায় প্রদেশভঙ্গের মতো ক্ষুদ্র প্রশ্ন! এ নিয়ে যদি মাথা ঘামাতে

হয় তো বল্লভভাই ও জবাহরলাল ঘামাবেন। আমি যতদূর জানি বাপু প্রদেশভঙ্গের বিপক্ষে। কেন মুসলিম লীগকে এই নিয়ে খোঁচানো? ছেড়েই দাও ওদের তিনটে প্রদেশ, ওরাও ছেড়ে দিক তিনটে বিষয়। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ। অবশ্য কংগ্রেসকে নয়, দলনিরপেক্ষ কেন্দ্রকে। এখন নেতারা কী স্থির করেন তা দেখা যাক। আপাতত দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করাই শ্রেয়। সবাই মিলে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে বসা যাক। হয়তো একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান মিলে যাবে। আমরা কেন ধরে নেব যে ভারতীয়দের বিজ্ঞতা নিঃশেষ হয়ে গেছে ও দেশভাগ, প্রদেশভাগ বিনা গতি নেই? ভাবতে খুব খারাপ লাগছে যে কূলে এসে নৌকাডুবি হবে। স্বাধীন হতে না হতেই আমরা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সারা বাংলায় না হোক পূব বাংলায় আমরা হিন্দুরা হব এলিয়েন। আর সারা ভারতে না হোক পাকিস্তান বাদ দিয়ে বাকী স্থানে মুসলমানরা হবে এলিয়েন। তোমরা কমিউনিস্টরা যদি একটা ফয়সালা বাতলে দিতে তা হলে আমরা তোমাদেরই ডিকটেটর করে দিতুম, বোন।” সৌম্য সহাস্যে বলে।

“আমাদের উপর ভার দিলে আমরা ভারতকে চৌদ্দ ভাগে বিভক্ত করতুম। এক একটা ভাগ হতো এক একটা রেপাবলিক। তার পরে তারা একজোট হয়ে গড়ত ইউনিয়ন অভ্ সোশিয়ালিস্ট পঞ্চায়তী রেপাবলিকস। সংক্ষেপে ইউ. এস পি. আর.। হিন্দু মুসলমানের বৈরাজ্যের উপর ভিত্তি করে অখণ্ড ভারত গঠন করা যেন চোরাবালির উপর ইমারত নির্মাণ করা। ধর্মের ভিত্তিতে নয়, মতবাদের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র তৈরি হতো।” বাবলী স্বপ্ন দেখে।

সৌম্য হেসে বলে, “ইস্পাতের কাঠামোটা কিন্তু রেড আর্মি।”

সৌম্য জুলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে যায় নোয়াখালী। শ্রীরামপুরে দর্শন পায় বাপুর। বিহারের বিবরণ শোনায় তাঁকে। কিন্তু একটি কথা তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখে। সেটা বিহারী হিন্দুদের কয়েকজনের মুখে শোনা। “খুনকা বদলা খুন। লুটকা বদলা লুট। আগকা বদলা আগ।” আর সবচেয়ে বিশ্রী “ফেলসানিকা বদলা ফেলসানি।” অমনি করে বদলা নিতে পারলে নাকি পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের পক্ষে নিরাপদ হবে। মুসলমানরা নাকি আর কোনো ভাষা বোঝে না। তাদের একহাতে কোরান আরেক হাতে তরবারি।

গান্ধীজীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত সেবাকর্মীরাও রয়েছেন। অনেকেই সৌম্যর চেনা। সে কিন্তু ভাবতেই পারেনি যে তাঁদের মধ্যে সোনাদিও থাকবেন। অবাক হয়।

"কেন, অবাক হবার কী আছে?" সোনাদি বলেন, "বাপুর বয়স কত হলো খেয়াল আছে? এখন তো 'বা' বেঁচে নেই। বাপুর হেফাজত করবে কে? ওই বুড়োকে চোখে চোখে রাখা চাই। কখন আবার অনশন শুরু করবেন। আমরা তটস্থ হয়ে পাহারা দিচ্ছি।" সোনাদি বলেন।

কস্তুরবাকে সংক্ষেপে বলা হতো 'বা'। সৌম্য আক্ষেপ করে, "অবশ্য 'বা' থাকলে ভাবনা কী ছিল? ভয় তো বাপু ওই একজনকেই করতেন।"

কথাপ্রসঙ্গে সোনাদি বলেন, "গ্রীক দার্শনিক ডাইয়োজেনিস ঘুরে বেড়াতেন দিনের আলোয় লণ্ঠন হাতে মানুষ খুঁজতে। সৎ মানুষ। তিনি একজনও সৎ মানুষ খুঁজে পান না। বাপুও খুঁজছেন প্রত্যেকটি গ্রামে একজন উত্তম হিন্দু ও একজন উত্তম মুসলমান। আমরা বাইরে থেকে যারা এসেছি তারা তো এখানে থাকব না। থাকবে যারা তারাই শান্তি স্থাপন করবে। কিন্তু কোথায় সেইসব উত্তম হিন্দু ও উত্তম মুসলমান? উত্তম হিন্দু হচ্ছে সেই যে মুসলমানকে ম্লেচ্ছ বা যবন বলে ঘৃণা করবে না, আপন জনের মতো ভালোবাসবে। আর উত্তম মুসলমান হচ্ছে সেই যে হিন্দুকে কাফের বা মালাউন বলে ঘৃণা করবে না, তার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হবে।"

সৌম্য আশ্বাস দেয় যে বাপু যেমনটি চান তেমনিটি উত্তম হিন্দু ও উত্তম মুসলমান খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু সমস্যাটা তো তাঁদের আয়ত্তে নয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জন্যে লড়বে স্থির করেছে। লড়াই শুরুও হয়ে গেছে কলকাতায়। সে লড়াই অহিংস নয়। অহিংসায় কারো বিশ্বাসও নেই। উত্তম মুসলমানও তো লীগপন্থী হতে পারে। তা না হলে লীগপন্থীরা তাকে একঘরে করবে। উত্তম হিন্দুও আত্মরক্ষার খাতিরে বন্দুক ধরতে পারে। ধরেওছে। মেরেওছে ও মরেওছে। বাপুও বলেছেন কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা ভালো। কিন্তু সে রকম দৃষ্টান্ত আর ক'টা! বেশীর ভাগই দুর্বৃত্তের ভয়ে স্থানত্যাগ করেছে। অন্তরে বহুগুণ ঘৃণা বহন করছে। বাপু যদি এদের স্বস্থানে সুস্থিত করতে না পারেন এরা নাচার হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাবে আর সেখান থেকে মুসলমানদের খেদাবে। এমনি করে একটা ভিসাস সার্কল সৃষ্টি হচ্ছে, সোনাদি। সময়মতো একে ভাঙতে না পারলে এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবই

একদিন ভারত ভাঙবে, তথা বাংলাদেশ ভাঙবে। বাপুর বিহারে যাওয়া জরুরি।"

সোনাদি কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তার পর বলেন, "নোয়াখালী থেকে জীবন নিয়ে বেরোতে পারলে তো বিহারে যাবেন। এত বড়ো অগ্নিপরীক্ষা তাঁর জীবনে আসেনি। তিনি বলেন এই পরীক্ষায় যদি বাঁচেন তবে তাঁর নবজন্ম হবে। যা শুনছেন যা দেখছেন তা যে কোনো মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। বিহারী হিন্দুরা উন্মাদ হয়েছে। তবু তো তারা কোনো মুসলমানকে গোবর খাইয়ে হিন্দু বানায়নি। এরা গোমাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়েছে। এরাও উন্মাদ। পুলিশ দিয়ে, মিলিটারি দিয়ে এদের উন্মত্ততা সারানো যাবে না। হিন্দুদেরই গোমাংসের ভয় কাটিয়ে উঠতে হবে। তেমনি মেয়েদেরও কাটিয়ে উঠতে হবে ধর্ষণের গ্লানি।"

"উদ্ধারকার্য কতদূর হয়েছে?" জানতে চায় সৌম্য।

"যতদূর সম্ভব। মুসলমানদের মধ্যেও সহমর্মী আছেন। তাঁরাও সহযোগিতা করছেন। যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তারা কিন্তু সহযোগিতা করছে না। অপরাধীদের নাম বলছে না। অপরাধও চাপা দিচ্ছে। একটাও কেস ধোপে টিকবে কি না সন্দেহ। তাদের গুরুজনদেরও ইচ্ছা নয় থানা পুলিশ কোর্ট কাচারি করা। বাপুরও ইচ্ছা নয়। ওদের ভবিষ্যৎটা তো দেখতে হবে। ধর্মান্তরিতরাও স্বধর্মে ফিরে আসছে। হিন্দুসমাজ আগের মতো অনুদার নয়। অনুদার হলে হিন্দুর সংখ্যা আরো কমবে। সংখ্যার যে কী গুরুত্ব সেটা এতদিন পণ্ডিতদের মাথায় আসেনি। এই দুর্যোগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও ঘটে যাচ্ছে। অভিশাপও আশীর্বাদের কাজ করছে। হিন্দুসমাজের। মুসলিম সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটছে কি না বুঝতে পারছিনে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ওরা মনে প্রাণে হিন্দুপ্রভাব কাটিয়ে উঠছে। পাকিস্তান সেদিক থেকে দরকারী। হিন্দু মুসলমান মিলে এক নেশন হলে সেটা হতো না। মুসলমানরা যেখানে মেজরিটি সেখানে সমাজসংস্কার তত কঠিন নয়। নারীপ্রগতি তত মন্থর নয়। সময় এসেছে যখন আমাদের পার্টিশনবিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদের ধারণা হিন্দুরা এইজন্যেই অখণ্ড ভারত চায় যে সেখানে তারাই মেজরিটি। মাইনরিটি হলে তারাও পার্টিশন চাইত। সে ধারণা নেহাৎ ভুল নয়। বাংলাদেশে হিন্দুরা মাইনরিটি বলে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও কতক লোকের

মুখে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশ দু'ভাগ হলেই হিন্দুর দিক থেকে মঙ্গল। আমি তো বহুদিন থেকেই বাংলাদেশের বাইরে। এখানকার লোকে কী ভাবছে তা এতদিন আমার ঠিক জানা ছিল না। এখন জানতে পাচ্ছি। হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন আজ বাঙালীকে আচ্ছন্ন করেছে।" সোনাদি গালে হাত দিয়ে বলেন।

"বাঙালী হিন্দু এখন বাপুর দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে। তিনি যদি ব্যর্থ হন তবে চরমপন্থী নেতাদের দিকে তাকাবে। তাদের কেউ বা দক্ষিণপন্থীর চরম, কেউ বা তার বিপরীত, বামপন্থীর চরম। নৈতিকতার কথা কেউ ভাবতে চান না। রাজনীতি ভিন্ন আর কোনো গণনা নেই। সে রাজনীতিও ত্যাগের রাজনীতি নয়। ক্ষমতার রাজনীতি। সত্যাগ্রহী খুঁজতে হলে দিনের আলোয় লণ্ঠন হাতে নিয়ে খুঁজতে হবে। গান্ধীজী আজ বাংলাদেশে এক অচল মুদ্রা। যদি না তিনি নোয়াখালীতে একটা ভোজবাজি দেখান।" সৌম্যর মন খারাপ।

"কী জানি ভাই, আমার তো বিশ্বাস হয় না যে নোয়াখালীর প্রান্তরেই হবে সেই যুদ্ধ যা একহিসাবে ভারতের জন্যে যুদ্ধ। যাতে অংশগ্রহণ করতে এখানে আমার আসা। এখনপর্যন্ত কোনো লক্ষণই আমি দেখতে পাচ্ছিনে তেমন কোনো যুদ্ধের।" সোনাদি বলেন সংশয়ের স্বরে।

"হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে বাপু অমন কথা। তাঁর উক্তির তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেননি। তাঁর মনে যা ছিল তা গণসত্যাগ্রহ নয়। গণসত্যাগ্রহ হলে কার বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ? মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে? তার উত্তরে মুসলিম লীগ জেহাদ ঘোষণা করত না? বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে? তার নীট ফল কী হতো? ব্রিটেনের অপসরণ নয়, কংগ্রেসেরই অপসরণ। ওদিকে বল্লভভাই হুঙ্কার ছাড়ছেন, তরবারির সঙ্গে মোকাবিলা করবে তরবারি। অর্থাৎ হিংসার সঙ্গে প্রতিহিংসা। বাপু কি গণসত্যাগ্রহ করতে গিয়ে গণহত্যা ডেকে আনবেন? তা হতে পারে না, সোনাদি। তাঁর উক্তির প্রকৃত অর্থ তাঁর নোয়াখালী অভিযান হচ্ছে মুসলিম জনগণের হৃদয়জয়ের অভিযান। তাদের যদি অন্তঃপরিবর্তন হয় তবে তাদের নেতাদেরও অন্তঃপরিবর্তন হবে। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসে উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা সমাধানে উপনীত হবেন। কেউ জয়ী হবে না, কেউ পরাজিত হবে না। জয় হবে সত্যের। সত্যটা এই যে হিন্দু

মুসলমান একই মায়ের সন্তান। যে মায়ের নাম ভারতমাতা তথা বঙ্গমাতা।" সৌম্য ব্যাকুলভাবে বোঝায়।

"ওঃ এই কথা! তুমি কি মনে করো জিন্না সাহেব এতদূর এগিয়ে কী পাবেন তা না জেনে পিছু হটবেন? তিনি পাকিস্তানের জন্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। পাকিস্তান না পেলে তিনি লড়াই বন্ধ করবেন না। যেমন স্বাধীনতা না পেলে বাপুও লড়াই বন্ধ করবেন না। বাতাসে বারুদের গন্ধ। এবারকার স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংস হবে না। জয়প্রকাশ, রামমনোহর, অরুণা ও তাদের দলবল ওৎ পেতে বসে আছে কখন আরেক দফা লড়াই বাধবে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই। সর্দারজী অবশ্য বলছেন ব্রিটেনের সঙ্গে লড়াই এখন কাবার। কিন্তু বাপু কি সেকথা বলেছেন? তাঁর মনে কী আছে তা কে বলতে পারে? যতদূর বুঝতে পারি, তিনি অসময়ে কিছু করবেন না। এখন ইংরেজের সঙ্গে লড়বার সময় নয়। সেটা আসবে কংগ্রেস নেতারা যখন গদী ত্যাগ করে আবার তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তার সম্ভাবনা কি নেই?" সোনাদির জিজ্ঞাসা।

সৌম্য স্বীকার করে, "আছে। সরকার চালাবার জন্যে কংগ্রেস নেতারা বড়লাটের শাসন পরিষদে যাননি। কথাবার্তা চালাবার জন্যেই গেছেন। কথাবার্তা যদি সফল না হয় তবে পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস নেতাদের তূণে ও ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। আর যা আছে তা বাপুর তূণে। বাপু তাঁদের তাড়া দিতে চান না। সময় দিতে চান। ব্রিটিশ সরকারকেও। তাড়া যিনি দিচ্ছেন তিনি জিন্না সাহেব। বেশী দেরি হলে মুসলিম লীগ সদস্যরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যোগ দেবেন। আলাপ আলোচনা সেইখানে বসেই হবে। কংগ্রেস নেতারা সেটা চান। তিনি সেটা চান না। সময় তাঁর দিকে নয়। তবে ইংরেজের দিকেও নয়। বাপুর মুশকিল সেইখানে। তিনি অপেক্ষা করলেও কেউ অপেক্ষা করবে না। তিনি একঘরে।"

॥ নয় ॥

সোনাদির মতো আহুত, অনাহুত, রবাহুত অভিযাত্রীদের সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। তাঁদের সকলের ধারণা নোয়াখালীতে দাণ্ডী অভিযানের মতো একটা কিছু হতে যাচ্ছে। গান্ধীজী চলবেন আগে আগে, অন্যেরা তাঁর পিছু পিছু। সরকার ধরে ধরে জেলে পুরবে, পুলিশ লাঠি চালাবে, গুলীও চালাতে পারে। দুনিয়ার লোক দেখবে, দেখতে ছুটে আসবে, বার্তা ছড়িয়ে পড়বে দেশে বিদেশে। যুদ্ধের বার্তা। না, ঠিক যুদ্ধের নয়, যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় সত্যাগ্রহের, যুদ্ধের নৈতিক বিকল্পের। যার নাম মরাল ইকুইভ্যালেণ্ট অভ্ ওয়ার।

কিন্তু যুদ্ধে তো একটা প্রতিপক্ষ থাকে। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ কে? মুসলিম লীগ সরকার? তাঁরা তো নিজেরাই বিব্রত। তাঁদের মতে নষ্টের গোড়া গোলাম সারওয়ার বলে এক ব্যক্তি, তাকে লীগের টিকিট দেওয়া হয়নি বলে সে আইন সভায় যেতে পারেনি, সেই আক্রোশ থেকে হিন্দুবিদ্বেষী কার্যকলাপে নেতৃত্ব করছে। যাতে শহীদ সুহরাবর্দীর বদনাম হয়। গান্ধীজী সুহরাবর্দীর ব্যাখ্যাই বিশ্বাস করেন। আর সুহরাবর্দীও পুলিশ দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখেন। নইলে কে জানে গোলাম সারওয়ারের গ্যাং হয়তো তাঁকেই খুন করে বসত।

না, শহীদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যায় না। অভিযানটা তবে কার বিরুদ্ধে হবে? কেনই বা হবে? গান্ধীজী চান হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি। সেটা যদি তিনি স্থাপন করতে পারেন তবেই তাঁর জয়। কাদের উপরে জয়? যারা অপ্রীতির সুযোগ নিয়ে দেশ ভাগ করতে চায় তাদের উপরে। তাঁর উদ্দেশ্য দেশভাগ নিবারণ। উপায় সম্প্রীতি পুনঃস্থাপন। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে খটকা বাধে। এঁদের উদ্দেশ্য কি পাকিস্তান অর্জন না পার্টিশন বর্জন? নির্ভরযোগ্য উত্তর তিনি কারো কাছেই পান না, শহীদের কাছেও না। সবাই জিন্নাসাহেবের ভয়ে তটস্থ। জিন্না হলো গুজরাটী 'ঝীণা'র ইংরেজী রূপান্তর। তার অর্থ 'ছোট'। সেই জিন্নাই হয়েছে এখন 'জিন্নাহ্'। যেমন আল্লাহ্। আরবী নয়, আরবীতর। আল্লাহ্ ও রসুলের পরে জিন্নাহ্। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে ফজলুল হকের মতো পাকা ঘুঁটিও কেঁচে গেছেন। ঝগড়া নয়,

মতান্তর থেকে শহীদ সুহরাবর্দীরও ত্রিশঙ্কু দশা। মাঝখান থেকে নাজিমউদ্দীনের প্রভাববৃদ্ধি।

গান্ধীজী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন সে উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যে উপায়ের চিন্তা করেছিলেন সে উপায় ছেড়ে তাঁকে অন্য উপায় খুঁজতে হচ্ছে। এর নাম অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলা। রবাহুতেরা একে একে সরে পড়ছেন। অনাহুতেরা আরো কিছুদিন পায়চারি করছেন। সোনাদিও তাঁদের একজন। সৌম্যকে বলেন, "ভাই, আমাদের বাপুর মতো মহাপুরুষ হাজার বছরে একজন জন্মান। সামনের হাজার বছরে তাঁর মতো একজন জন্মাবেন মনে হয় না। নোয়াখালীর মতো একটা অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে কেন তিনি বন্যহংসীর পশ্চাদ্ধাবন করে আয়ুক্ষয় ও বলক্ষয় করছেন? একজন মুসলমানেরও কি মন ভেজাতে পারছেন?"

''এর কারণ বিহারের হিন্দুরা তিনগুণ কি চারগুণ বদলা নিয়ে এখানকার মুসলমানদের মনটাকে পাথর করে দিয়েছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"তা হলে উপসর্গের চিকিৎসা না করে রোগের চিকিৎসা করাই শ্রেয়। নিতে হবে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ গ্রহণ বা জিন্নার শর্তে পার্টিশন।'' সোনাদি বলেন।

''সেই কঠিন সিদ্ধান্তটা কাদের খরচে হবে, সোনাদি? আমি তো ভেবে দেখছি ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মেনে নিলে আসামের হিন্দু ও ট্রাইবালদের আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের খরচে। মুসলিম লীগের দাবী মেনে নিলে বাংলাদেশের হিন্দুদের, আসামের হিন্দু ও ট্রাইবালদের, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের, সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুদের আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের খরচে। মাঝামাঝি একটা সিদ্ধান্ত সম্ভব। সেটা কিন্তু কংগ্রেসের একক সিদ্ধান্ত হতে পারে না। দেশভাগের শর্ত হবে প্রদেশভাগ। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ, প্রথমবার পাঞ্জাবভঙ্গ, আসামের পুনর্বিন্যাস। মুসলিম জনমত যে এর অনুকূল হবে তা নয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ তো প্রতিকূল হবেই। কলকাতা নিয়েও টাগ-অভ্-ওয়ার বাধবে। লাহোর নিয়ে তো রীতিমতো ওয়ার। প্রদেশভাগ এক বিপজ্জনক সমাধান। মাথাব্যথা সারাতে গিয়ে মাথা কাটা। রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ। বাপু কিছুতেই সায় দেবেন না, হয়তো সরাসরি বিরোধিতা করবেন। না, সত্যাগ্রহ নয়। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক ইস্যু। আদৌ নৈতিক ইস্যু নয়। মুসলিম

মাইনরিটির সঙ্গে তিনি লড়তে আগ্রহী নন, যদি মুসলিম মাইনরিটি এই ইস্যুতে লড়তে চায়। মুসলিম মাইনরিটিকে কাছে টেনে নিতেই হবে। ভালোবাসা দিয়ে। দরদ দিয়ে। সেইজন্যেই তিনি নোয়াখালীতে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যাচ্ছেন। মুসলিম মাইনরিটি মানে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মাইনরিটি। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মেজরিটি। তাই স্থানীয় হিন্দু মাইনটিকেও অভয় দিতে হচ্ছে। তারা এখন এমন ডিমরালাইজড যে তাদের পাহারা দেবার জন্যে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে। সেটা তাঁর অনুরোধে নয়, লাটসাহেবের আদেশে। জওয়ানরা এসে পড়েছে দেখছি। এটা তাঁর ইচ্ছায় নয়, বড়লাটের নির্দেশে। ইংরেজরা তো এখনো ক্ষমতার হস্তান্তর করেনি। চরম দায়িত্ব এখনো তাদেরই। মুসলমানদের এটা বোঝানো শক্ত। একই সঙ্গে হিংসা আর অহিংসা দেখে তারা বাপুকেই সন্দেহ করছে। তাই বিশ্বাস ফিরে আসছে না। বাপুর উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। ওদিকে লীগপন্থীরা রব তুলেছে, আগে বিহারে যান। সেখানকার মুসলমানদের বাঁচান। কিন্তু কী করে এখানকার কাজ আধখানা রেখে যাবেন? কার উপর দায়িত্ব দিয়ে যাবেন। এর উত্তর আমি তো খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি জানো?" সৌম্য সুধায়।

"না, আমারও জানা নেই। আমি বহুকাল সেবাগ্রামবাসিনী। আমি স্বস্থানেই ফিরে যেতে চাই। সেখানকার কাজ পড়ে রয়েছে। আমার কর্তাও বার বার লিখছেন ফিরে যেতে। নোয়াখালীকে স্বাভাবিক করতে কে জানে কতকাল লাগবে! দু' একমাসের মামলা নয়। বাপু শ্রীরামপুর ছাড়লে আমিও বাংলাদেশ ছাড়ব। তুমিই আমার জায়গা নাও।" সোনাদি সাধেন।

"তা কী করে সম্ভব, সোনাদি? আমার আশ্রম কে দেখবে? বাপুও বলছেন আমাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে। পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা এখন অগ্নিগর্ভ। নোয়াখালী কি একটি? নোয়াখালী অনেকগুলি। আমরা যে যেখানে আছি সে সেখানে থেকে বাপুর কর্মপন্থা অনুসরণ করব। রাজনীতি আমাদের জন্যে নয়। তবে সত্যাগ্রহের ডাক এলে সাড়া দেব।" সৌম্য মনে মনে প্রস্তুত।

"বাপুর জীবনে এত বড়ো চ্যালেঞ্জ আর আসেনি। চ্যালেঞ্জটা জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। কেমন করে এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে

হবে? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভায়োলেন্স ছিল স্টেট ভায়োলেন্স। তার সঙ্গে কেমন করে মোকাবিলা করতে হয় বাপু ভালো করেই জানেন। কিন্তু একেবারেই জানেন না কেমন করে মাস ভায়োলেন্সর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো ক'জন ব্যক্তি তিনি দেখেছেন যে তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবেন? বললে শুনছে কে? বীরের অহিংসা বা সাহসীর অহিংসা বলতে যদি স্টেট ভায়োলেন্সের সামনে দাঁড়ানো বোঝায় তবে তার পরীক্ষা কয়েকবার হয়েছে। পরেও হতে পারে। পুলিশ জানে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভায়োলেন্সের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। তার উপরে গভর্নমেণ্টের কণ্ট্রোল আছে। কিন্তু উন্মত্ত জনতার উপর অঙ্কুশ চালাবে কে? তার সামনে দাঁড়ালে নির্ঘাত মৃত্যু। তাই বুনো ওলের উত্তর বাঘা তেঁতুল। মুসলিম মাস ভায়োলেন্সের উত্তর হিন্দু মাস ভায়োলেন্স। যেমন দেখা গেল কলকাতায়। যেখানে তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তাদের জোর যেখানে বেশী সেখানে তারা বদলা নিয়েছে। সেটা পাল্টা অন্যায়। বাপুকে এসব ভাবতে হচ্ছে।" সোনাদি বলেন।

"ভাবতে হচ্ছে আমাকেও। আমার মতো সবাইকে। যারা একচক্ষু হরিণের মতো কেবল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের স্টেট ভায়োলেন্সই দেখতে অভ্যস্ত। যাদের কারবার পুলিশের সঙ্গে, ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে, মিলিটারির সঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাঝে মাঝে বেধেছে, কখনো গোহত্যা নিয়ে, কখনো মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। সেসব নিতান্ত অরাজনৈতিক। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশানো দাঙ্গাহাঙ্গামা একটা নিখিল ভারতীয় দলের দাবী আদায়ের হাতিয়ার হতে এই প্রথম দেখলুম। তাও যদি দুটো একটা শহরে সীমাবদ্ধ থাকত! এ যে ক্রমশই শহর থেকে গ্রামে, এক প্রদেশ থেকে অপর প্রদেশে, কয়েক জন থেকে বহু জনে সংক্রামিত হচ্ছে। কোথাও এক জায়গায় গণ্ডী না টানলে সর্বজনে প্রসারিত হবে। দেখতে দেখতে পূর্ববঙ্গ হয়ে যাবে হিন্দুবর্জিত বা পাণ্ডববর্জিত। তেমনি, বিহার মুসলিমবর্জিত বা কৌরব-বর্জিত। শেষ অঙ্কে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে জয়লাভ করে পাণ্ডবরা কি সুখী হয়েছিলেন? সুখী হলে মহাপ্রস্থান করতেন কেন? আর কী অপরিমিত লোকক্ষয়! গীতায় শ্রীভগবান লোকক্ষয়ের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলেন। যোদ্ধারা নিমিত্তমাত্র। আমরা কিন্তু একালের লোকক্ষয়ের নিমিত্ত হতে নারাজ। তেমন কোন অবতারকেও দায়িত্ব দিতে পারছিনে। বাপু তেমন

কোনো অবতার নন। জিন্না সাহেব হয়তো একজন নবী। দায়িত্ব নিতে চান তিনিই নিন। কিন্তু তৃতীয়পক্ষের শাসনকালে নয়। আমরা তৃতীয়পক্ষকেই দায়ী করব আর তার বিরুদ্ধেই আরো একদফা লড়ব, যদি দ্বিতীয়পক্ষ নিরস্ত্র না হয়। সোজাসুজি মুসলিম লীগের সঙ্গে নয়। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। খুঁটিকেই হটাতে হবে। তারপর দেখা যাবে মেড়ার দৌড় কতদূর।'' সৌম্য বলতে বলতে তেতে ওঠে।

''না, না। দেশ প্রস্তুত নয়। জনগণ প্রস্তুত নয়। কংগ্রেস প্রস্তুত নয়। বাপুও কি প্রস্তুত? তিনি দু'বছর সময় চান। কিন্তু ঘটনা ততদিন সবুর করলে তো?'' সোনাদি বলেন।

সৌম্য চুপ করে শোনে। তিনি বলে যান, ' তা ছাড়া ইংরেজরা তোমাদের চেয়ে কম ধূর্ত নয়। ওদের সঙ্গে আরো এক দফা লড়াইয়ে নেমে তোমরা দেখবে হিন্দুর কান মুসলমানের হাতে আর মুসলমানের কান হিন্দুর হাতে। ইংরেজরা কাছে পিঠে নেই। বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। কেন মিছিমিছি ওয়াটারলু ডেকে আনা? সময়ে দাঁড়ি টানাই বুদ্ধিমানের কাজ। মেনে নেওয়া উচিত যে এই পর্যন্ত সম্ভব, এর বেশী সম্ভব নয়। স্বাধীনতা পেলেই আমরা কৃতার্থ। হিন্দু মুসলিম একতা দূর অস্ত। অনিশ্চিতের জন্যে নিশ্চিতকে হারানো ভুল। আমরা জানি আমাদের দৌড় পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি নয়। স্থানীয় সমর্থন নেই। নোয়াখালী থেকে পুলিশ সরিয়ে নিলে, মিলিটারি সরিয়ে নিলে বাপুকেও সরে যেতে হবে। আমরা ওঁকে পাহারা দিয়ে বাঁচাতে পারব না। শাহাদত এর উত্তর নয়। রাজনৈতিক সমাধানই খুঁজতে হবে। দিল্লীতে বসে নেতারা সেই চেষ্টাই করছেন। তুমি তোমার আশ্রমে ফিরে যাও, আমিও আমার আশ্রমে ফিরে যাই। বাপুরও ইচ্ছা নয় যে গ্রাম পরিক্রমার সময় বেশী অনুচর তাঁর সঙ্গে থাকে। তাঁর মটো, একলা চল রে। তাঁর শক্তি যা তা ভিতর থেকেই আসছে। দলবল থেকে নয়। দলবল যেন ক্রাচ। তিনি ক্রাচ বগলে করে হাঁটবেন না। দলবলকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে পাঠাচ্ছেন। তাতে জনসংযোগ সুগম হবে। তারাও শিখবে কেমন করে বাপুর সাহায্য না নিয়ে সাম্প্রদায়িক অনর্থের সম্মুখীন হতে হয়! দলের মেয়েদেরও তিনি সে শিক্ষা দিচ্ছেন।"

মাত্র চারজনকেই গান্ধীজী সহযাত্রী করে পদযাত্রা করেন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বহু ব্যক্তি নোয়াখালীতে এসে তাঁর সহকর্মী হতে আগ্রহ প্রকাশ

করেছিলেন, তিনি তাঁদের সবাইকে লেখেন যে যার নিজের জায়গায় থেকে গঠনের কাজ করতে। নিতান্তই যদি কেউ আসতে চান তবে সারা জীবন নোয়াখালীতে থাকতে প্রস্তুত হয়ে আসবেন। তিনি নিজেও তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। ব্যর্থতা বরণের চেয়ে মৃত্যু বরণই তাঁর পক্ষে শ্রেয়। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

নির্মলকুমার বসু, মনু গান্ধী, পরশুরাম ও রামচন্দ্রন্ এই চারজনকে তিনি বেছে নেন, সঙ্গীদের আর সবাইকে হয় ফেরৎ পাঠান, নয় নোয়াখালীর অন্যান্য স্থানে মোতায়েন করেন। সোনাদিকে তিনি সেবাগ্রামে ফিরে যেতে বলেন। সোনাদি যাবার সময় সৌম্যকে বলেন, "তোমারও উচিত জুলির কাছে ফিরে যাওয়া। স্ত্রীরা এই সময়টা স্বামীদের সান্নিধ্য চায়।"

"টেলিগ্রাম পেলেই যাব। আপাতত আশ্রমে ফিরে না গেলে নয়। ওরাও তো অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"ভালো কথা, তুমি কি যুথিকা মল্লিক নামে কোনো মেয়েকে চেনো? বাপুকে আকুলভাবে লিখেছে নোয়াখালী থেকে হিন্দুর বৌঝিদের সবাইকে নিয়ে মোজেসের মতো দেশত্যাগ করতে। বাপু আমার উপর ভার দিয়েছেন ওকে জানাতে যে হিন্দু পুরুষদেরই পৌরুষের পরীক্ষা দিতে হবে। তাদের বৌঝিদের যে কোনো উপায়ে রক্ষা করতে হবে, হয়তো বা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হবে। পলায়ন কাপুরুষের কাজ।" সোনাদি বলে যান।

"ওর স্বামী মানস আমার প্রিয় বন্ধু। বাপুর বক্তব্য আমি ওকে জানিয়ে দেব। দেখাও করতে পারি। কাছাকাছি জেলায় থাকে।" সৌম্য সোনাদির কাছ থেকে বিদায় নেয় ও তাঁকে বিদায় দেয়।

বঙ্কিমদার প্রযত্নে আশ্রম ঠিকই চলছিল। কিন্তু তিনিও স্বস্থানে চলে যান। তাই অগোছালো হয়ে পড়ে। সৌম্য আবার খেই হাতে নেয়। কিন্তু জুলির অভাবে সব শূন্য মনে হয়।

"দিদিমণি কোথায়? কেমন আছেন? কবে আসবেন?" ইত্যাদি প্রশ্ন শুনতে হয় সকলের মুখে। কেউ কেউ আরো অন্তরঙ্গভাবে সুধায়, "কবে হবে?" সৌম্য বলে, "আমি কি ডাক্তার, না জ্যোতিষী? যতদূর বোঝা যায় মাস দুয়েকের মধ্যে। তার পরে ওদের নিয়ে আসব।"

এখন থেকেই 'ওদের'।

মুস্তাফীরা সৌম্যকে দেখে দারুণ খুশি। জুলির যাওয়ার পরে মিলিরও মন লাগে না। সে চলে যায় তার ছেলের জন্যে মনের মতো স্কুল খুঁজতে। ওকে ভারতেই পড়াবে। বড়ো হলে পরে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে পাঠাবে।

মুস্তাফী বলেন, "জুলিকেও নিয়ে এলে পারতে। আমরা তো রয়েছি। আমাদের সেবাপ্রতিষ্ঠান কলকাতার যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে।"

"ওর মা ওকে ছাড়বেন না। আর ওরও ইচ্ছা মায়ের কাছে থাকা। আর আমিও তো কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। পূর্ববঙ্গের যখন যেখানে গোলমাল বাধবে তখন সেখানে ছুটতে হবে। আশা করি আর বাধবে না। তবু তৈরি থাকতে হবে।" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

"আমরা আপাতত নিশ্চিন্ত। এখানে আবার ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। মিস্টার ক্যামেরন জবরদস্ত হাকিম। দুই পকেটে দুটো রিভলভার নিয়ে বেরোন। তাঁর আশঙ্কা কংগ্রেস যা দাবী করেছে তা না পেলে ফের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে নামবে। একটা রিভলভার কংগ্রেসওয়ালাদের জন্যে। তেমনি, লীগ যা দাবী করেছে তা না পেলে জেহাদ ঘোষণা করবে। অন্য রিভলভারটা লীগওয়ালাদের জন্যে। ভয়ে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারে না। তবে আমার সঙ্গে খুব ভাব।" মুস্তাফী বলেন।

"হ্যাঁ, পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হচ্ছে। কিংবা ইউরোপীয়ান এস. পি.। যাতে হিন্দুদের মনের জোর বাড়ে। হিন্দুদের এখন যে হাল তাতে তারা সাহেব তাড়ানো দূরে থাক সাহেবকেই আঁকড়ে ধরবে। মুসলিম অফিসারদের উপর হিন্দুদের আস্থা নেই। হিন্দু অফিসারদের উপর মুসলমানদের আস্থা নেই। ইউরোপীয় অফিসারদের উপরেই উভয়ের আস্থা। স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় এসেও হাত ফস্কে যাচ্ছে। গান্ধীজীর মন খারাপ। আমারও। আমরা কোন মুখে বলব আমরা এক নেশন? যখন হিন্দুরা বলছে পূর্ববঙ্গে একজনও হিন্দু নারী নিরাপদ নয়।" সৌম্য বলি বলি করে বলতে পারে না যে বিহারের মুসলমানদের মুখে শুনেছে সেখানে একজন মুসলিম নারীও নিরাপদ নয়।

"বিষম লজ্জার কথা। ঘেন্নার কথা। শেষে কিনা ইউরোপীয়ানরাই রক্ষক! ওরা কিন্তু ওদের মেমসাহেবদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।" মুস্তাফী বলেন।

"শুনতে পাচ্ছি আমাদের এখানকার হিন্দু ভদ্রলোকেরা নাকি তাঁদের স্ত্রীকন্যাদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।" সৌম্য জানতে চায় কথাটা কতদূর সত্য।

"ভুল শোননি। এক মাঘে শীত যায় না। আবার একটা কিছু বাধবে ভেবে সাহেবরা যা করছে হিন্দুরাও তাই করছে। ওদের ভারতত্যাগ, এদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ। কে কাকে অভয় দেবে?" মুস্তাফী সংশয় প্রকাশ করেন।

"আমি তো বুঝতেই পারছিনে মেমসাহেবরা কেন আগে ভাগে দেশে চলে যাচ্ছেন। আমরা কি কখনো তাঁদের কারো গায়ে হাত দিয়েছি?" সৌম্য বিচলিত।

"না, তোমরা অমন কাজ করনি। কিন্তু কেউ যদি অমন কাজ করে ওরা আগের মতো একজনের অপরাধে একশো জনকে দণ্ড দিতে পারবে না। সেটা জানার পর হিন্দু বা মুসলিম বা শিখ জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তখন কি হাজার জন মহিলার লাঞ্ছনার জন্যে এক লাখ জনকে দণ্ড দিতে পারবে? সে দণ্ডশক্তি আর নেই। ওরা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিচ্ছে।" মুস্তাফী ব্যাখ্যা করেন।

"তা নিক। আমরা বাধা দেব না। কিন্তু হিন্দু ভদ্রলোকদের কি বন্দুকের লাইসেন্স নেই? বন্দুক নেই? বেআইনী বন্দুক তো আজকাল অনেকের ঘরে। আত্মরক্ষার জন্যে বা নারীরক্ষার জন্যে বন্দুক ধরলে গান্ধীজী আপত্তি করবেন না। কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর বদলা নিলে নিন্দা করবেন। সেটা মহাপাপ।" সৌম্য তফাৎটা বোঝায়।

"আত্মরক্ষার জন্যে বা নারীরক্ষার জন্যে তুমি না হয় একবার গুলী চালালে। কিন্তু ওরা যদি দলবদ্ধ হয়ে দশটা গুলী চালায় বা শড়কি ছুঁড়ে মারে তা হলে তুমি কী করবে? শহরে তুমিও দলবল জোগাড় করতে পারো, কিন্তু গ্রামে তুমি নিঃসঙ্গ। ও ভাবে হিন্দুদের মানরক্ষা হবে না, সৌম্য। গান্ধীজী বাঙালী হিন্দুদের রাজপুত ঠাওরেছেন। তাই রাজপুতদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আমরা বহুকাল থেকে নিরস্ত্র। রাজপুতরা কোনো কালেই তা হয়নি। বন্দুক হাতে পেলেও চালাতে জানিনে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। আমাদের ভরসা পুলিশ আর মিলিটারি। তাদের উপর আস্থা না থাকলে শ্রীচরণ ভরসা। আমাকেও স্থানত্যাগ করতে হবে। অসংখ্য মুসলিম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আছেন। কিন্তু জেহাদের দিন তাঁরাও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। আমার

বা তোমার আর কোথাও যাবার জায়গা আছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান যে ডুববে।" মুস্তাফী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন।

"আমার আশ্রমেরও একই দশা হবে, আমি যদি অন্যত্র যাই। কিন্তু জাহাজ ডুবলেও আমি কাসাবিয়ঙ্কার মতো শেষপর্যন্ত খাড়া থাকব।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"আমিও কি খাড়া থাকতে চাইনে? এ বয়সে আর একটা সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব কোন মন্ত্রবলে? ডাক্তারি অবশ্য যে কোনো স্থানে করা যায়। কিন্তু আমি কি শুধুই ডাক্তার? তাতেই কি আমার জীবনের সার্থকতা? আর আমার নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটিকেই বা কার হাতে সঁপে দিয়ে যাব? সরকার নিজের হাতে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন আশা করি। কিন্তু সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করা অন্য জিনিস। হিন্দু নার্সরা কেউ থাকতে চাইবে না। মুসলিম নার্স কোথায়? খ্রীস্টান নার্সই ভরসা।" মুস্তাফী কতকটা সান্ত্বনা পান।

"আপনি কি মনে করেন গান্ধীজীর মিশন সফল হবে না? হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না?" সৌম্য সুধায়।

মুস্তাফী একটু চিন্তা করে উত্তর দেন, "গান্ধীজীকে এককালে বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রোফেটের মতো মান্য করত। কিন্তু এখন আর করে না। ওদের বিশ্বাস দেশের স্বাধীনতার নাম করে তিনি যার জন্যে লড়ছেন তা নিজের দলের ক্ষমতা। সেটা প্রধানত হিন্দুদের দল। বাংলাদেশে সেই হিন্দুরা জমিদার, মহাজন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। মুসলমানদের জন্যে তারা বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকার করবে না। যখনি প্রজা ও খাতকের প্রতি ন্যায়ের খাতিরে আইন সংশোধনের প্রস্তাব উঠেছে তখনি কংগ্রেস সদস্যরা বাধা দিয়েছেন। প্রজা ও খাতকরা প্রধানত মুসলমান। সুতরাং কংগ্রেসের ভোট মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভোট। গান্ধীজী কি এসব জানেন না? আগে ইংরেজ যাবে, তার পরে মুসলমানরা যা পাবার তা পাবে, এটা ওদের স্তোক দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। গদীতে গ্যাঁট হয়ে বসলে কংগ্রেস জমিদার ও মহাজনদের পক্ষই নেবে। আর হিন্দু মধ্যবিত্তরাই চাকরি বাকরিতে সিংহের ভাগ পাবে। জমিদারি ও মহাজনি উঠে না যাওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা কংগ্রেসের উপর প্রসন্ন হবে না। সুতরাং গান্ধীজীর উপরও না। একটা বড়ো গোছের অর্থনৈতিক পরিবর্তন না হলে কংগ্রেসের উপর মুসলামানদের আস্থা জন্মাবে না। গান্ধীজীর উপরেও না।

ওদের অবশ্য পিটিয়ে সিধে করা যায়। হিন্দু তথা মুসলিম জমিদারগণ এতদিন সে কর্ম করেছেন। কিন্তু তাদের মন পাওয়া অন্য জিনিস। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির বদলে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেও মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে। কারণ পাকিস্তান হলে হিন্দু শোষক ও শাসক শ্রেণীর হাত থেকে ওরা নিষ্কৃতি পাবে। গান্ধীজী তো সত্যের পূজারী। তিনি কি হিন্দুদের বলতে পারছেন না যে তোমরা প্রজা ও খাতকদের সঙ্গে সন্ধি করো? নয়তো সময় থাকতে সরে পড়ো? জমিদারি ও মহাজনি সরকারের হাতে যাক। ইংরেজরা যদি এত বড়ো সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে পারে তোমরাই বা কেন তার চেয়ে ঢের ছোট জমিদারি বা তেজারতি ত্যাগ করতে পারবে না? তাঁর ওই গঠনমূলক কর্মে নোয়াখালীর ভবী ভুলবে না, সৌম্য। আমার সেবামূলক কর্মেও এখানকার ভবী ভুলছে না।" মুস্তাফী বাস্তববাদী।

সৌম্য বিমর্ষ হয়। "তা বলে পলায়ন বাপু সমর্থন করেন না। গণপলায়ন তো নয়ই। হিন্দুদের দিকেও সত্য আছে। তাদের সবাই কিছু জমিদার বা মহাজন বা মধ্যবিত্ত নয়। বেশীর ভাগই চাষী বারুই জেলে তেলী মাঝি মাল্লা কামার কুমোর ধোপা নাপিত শাঁখারী কাঁসারী সোনার ইত্যাদি খেটে খাওয়া মানুষ। তা ছাড়া দিন মজুর। শ্রেণী শত্রু বলে কী করে এদের চিহ্নিত করা যায়? এরা চলে গেলে সমস্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাটাই ধ্বসে পড়ে। পাকিস্তান যদি এদের রাখতে না পারে তবে তার অর্থ নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। জিন্না সাহেব রাজনীতি করতে গিয়ে অর্থনীতিকে ডোবাতে যাচ্ছেন। গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি দিয়ে ডুবন্ত অর্থনীতিকে ভাসাতে চাইছেন। আজকের মুসলমান যদি এটা না বোঝে কালকের মুসলমান নিশ্চয়ই এটা বুঝবে। ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু নেই। পাকিস্তানও শেষ কথা নয়। গণ পলায়নের পর গণ প্রত্যাবর্তনও সম্ভবপর। আপনাকেও ফিরে আসতে হতে পারে। রুগীরাই সাধাসাধি করবে।" সৌম্য ভবিষ্যদ্বাণী করে।

"আমরা না গেলে মুসলিম ডাক্তাররা সুযোগ পাবেন না। ওঁদের খাতিরেই আমাকে সরে যেতে হবে।" মুস্তাফী বলেন।

মোহিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বলেন, "আমিও চোখে অন্ধকার দেখছি। পাকিস্তানের দাবী এখন শিক্ষিত মুসলমান মহলে নিবদ্ধ নয়। গ্রামে গঞ্জে হাটে ঘাটে ওই একই দাবী। আমার আফসোস এই যে জিন্নার মতো

অত বড়ো একজন প্রতিভাকে আমরা ঠিকমতো চিনতে পারলুম না। টিলক আর জিন্না এই দুই মহারথী না থাকলে ১৯১৬ সালে লখনউতে কংগ্রেস লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতো না, সেই চুক্তি অনুসারে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া স্থির হয়। তার বিনিময়ে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে হিন্দুদেরও দেওয়া হয় ওয়েটেজ। প্রাদেশিক স্তরে সেই মর্মে বোঝাপড়া না হলে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস সুগম হতো না। স্বীকার করতেই হবে জিন্না সাহেবের কুশলতা। প্রাদেশিক স্তরের পরবর্তী স্তর হলো কেন্দ্রীয় স্তর। সেখানে যখন রিফর্মসের সময় আসবে তখন আরো একদফা ওয়েটেজ বিনিময়ের প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু কী করে? কেন্দ্র তো মাত্র একটাই। সেই এক কেন্দ্রকে যদি দুই কেন্দ্রে পরিণত করা যেত তা হলে কেন্দ্রীয় স্তরেও ওয়েটেজ বিনিময় সম্ভবপর হতো। এই চিন্তা থেকেই পাকিস্তানের দাবী। গিভ অ্যাণ্ড টেক বলতে ওয়েটেজ বিনিময়ই বোঝায়। কিন্তু কেন্দ্র যদি বিভক্ত না হয়, অবিভক্তই থাকে, তবে জিন্না সাহেবের বিকল্প দাবী হবে প্যারিটি। হিন্দু মুসলিম প্যারিটি। নিদেনপক্ষে বর্ণ হিন্দু মুসলিম প্যারিটি। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তায় পাকিস্তানও নতুন। প্যারিটিও নতুন। এসব তত্ত্ব শুনে আমরা হকচকিয়ে যাই। কিন্তু খোলা মন নিয়ে বিবেচনা করলে বুঝবে নতুন বলে এগুলি অহেতুক নয়। তাই যদি হতো তবে বেঙ্গল পার্টিশনের পাল্টা দাবী ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদের মুখে শোনা যেত না। এই উদ্ভট দাবী কংগ্রেসও সমর্থন করবে না, লীগও সমর্থন করবে না। জিন্না সাহেবের যুক্তিটা হলো দুই কেন্দ্র না হলে গিভ অ্যাণ্ড টেক হবে কী করে? বিকল্পে প্যারিটিও তো একপ্রকার গিভ্ অ্যাণ্ড টেক। তাতে দুই পাল্লা সমান থাকে। হিন্দু মুসলমান হবে সমান সমান। কংগ্রেস লীগ হবে সমান সমান। তা হলেই না *দুই পার্টনারের স্থায়ী পার্টনারশিপ হবে। পার্টনারশিপ না হলে পার্টিশনই* হোক। সেটাও স্থায়ী বন্দোবস্ত। মাঝামাঝি যেসব সমাধান বাতলানো হচ্ছে সেসব কারো মনঃপূত নয়। না কংগ্রেসের, না লীগের। না গান্ধীর, না জিন্নার। আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে তিন-চতুর্থাংশের সঙ্গে এক-চতুর্থাংশের প্যারিটি কেমন করে সম্ভব? তেমনি, এটাও আমার বুদ্ধির অগম্য দেশ বিভক্ত হলে প্রদেশ কেমন করে অবিভক্ত থাকবে? পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ, বাঙালী হিন্দু, এমন কী স্বর্গ হাতে পাবে যার জন্যে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পছন্দ করবে? এমনধারা বন্দোবস্ত ইংরেজের সঙ্গে মুসলিম লীগের হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের

সঙ্গে লীগের হতে পারে না। কংগ্রেস লীগ চুক্তি যদি অত্যাবশ্যক হয় তবে এই মর্মে বিধিবদ্ধ হতে পারে না। আর ইংরেজ লীগ চুক্তি যদি হিন্দু শিখের স্বার্থবিরোধী হয় হিন্দু শিখ ইঙ্গ-মুসলিম আঁতাতের সঙ্গে সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়বে। সে লড়াই অহিংস হবে না। আমি অবশ্য হিন্দু-মুসলিম আঁতাতের পক্ষপাতী। কিন্তু আজকের বঙ্গদেশে আমার মতো ফসিল আর কে আছে? ইংরেজরা শুনছি যাবার মুখে। দেখা যাক ওরা শ্মশান না গোরস্থান কী রেখে যায়। বোধহয় দুই। তাতে তাদের লাভই বা কী হবে?"

সৌম্য স্তব্ধ হয়ে শোনে। বলে, "পাকিস্তানও না, প্যারিটিও না, তৃতীয় পন্থা যদি কিছু থাকে সেইটেই এখন আমাদের ধ্যান।"

"তৃতীয় পন্থা?" মোহিনীবাবু উত্তর দেন, "তৃতীয়পক্ষের আরো দশ বিশ বছর অবস্থান। আমি জানি তোমাদের এটা ভালো লাগবে না। ইংরেজ যদি থেকে যায় তোমরা আবার এক গণ আন্দোলন করবে। তখন বাধবে গণ খুনোখুনি।"

॥ দশ ॥

অশেষ ব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় করে নিয়ে যূথিকাকে চিঠি লেখে সৌম্য। সেইসঙ্গে মানসকেও দু'চার কথা।

"স্নেহের বোন যূথী, বাপুকে যে চিঠি তুমি লিখেছিলে সে চিঠি তিনি সোনাদির হাতে দিয়ে বলেন উত্তর দিতে। সোনাদিরও সময় ছিল না, তাই তিনি দিয়ে যান আমার হাতে। তোমার হৃদয়টি কোমল, তুমি সেই হৃদয় দিয়েই সমস্যার সমাধান খুঁজেছ। কিন্তু এ বড়ো কঠিন সমস্যা, বোন। মস্তিষ্কেরও সাহায্য নিতে হবে। নোয়াখালীতে যা ঘটেছে অন্যান্য জেলাতেও তা ঘটতে পারত। এখনো পারে। আর তার বিপরীতে বিহারেও তা ঘটেছে। সেখানকার মাইনরিটির উপর মেজরিটির বদলা। সুদ সমেত। চক্রবৃদ্ধি হারে। আপাতত সেটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু আগুন নেবেনি, ধোঁয়াচ্ছে।

বাপুকে তুমি বলেছ মোজেসের মতো নোয়াখালীর নারীদের নিয়ে এক্সোডাস করতে। কিন্তু, বোন, নারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরুষরাই বা কেমন করে ঘরসংসার করবে? সারাদিন চাষবাস করে যখন ঘরে ফিরবে তখন

রেঁধে রাখবে কে? সবাই কি আমার মতো আশ্রমিক হবে নাকি? নারী যেখানে যাবে পুরুষও সেখানেই যাবে। নোয়াখালী হিন্দুশূন্য হবে। তারপর সেই ছিন্নমূল নরনারীকে কোথায় রোপণ করব আমরা? কোথায় তারা মূল পাবে? ঘরবাড়ী জুটতে পারে, জমিও মিলতে পারে, কিন্তু সেই পরিবেশ, সেই ভাষা, সেই ঐতিহ্য, সেই উত্তরাধিকার? মানুষ মনোজীবী। সে কি কেবল মাছ ভাত খেয়ে বাঁচে? মাছের কথা যদি বলো মাছই বা কোথায় পাবে পূর্ববাংলার মতো? যাদের আমরা বাঁচাব তারা প্রতিদিন আমাদের শাপান্ত করবে কেন স্বস্থানভ্রষ্ট করেছি বলে।

তাদের স্বস্থানভ্রষ্ট না করে অভয় দিতে চেষ্টা করছেন বাপু। তার জন্যে নিজেই নোয়াখালীতে বছরের পর বছর থাকতে রাজী। তিনি দিল্লীতে রাজত্ব করতে চান না। সেবাগ্রামে ফিরে যেতেও ব্যগ্র নন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে সাহায্য করবার জন্যে বিস্তর লোক নোয়াখালী আসতে চান। বাপু তাঁদের জানিয়েছেন যে যাঁরা আসবেন তাঁরা সারা জীবন অতিবাহিত করবার জন্যে তৈরি হয়ে আসবেন। এ সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। পাকিস্তানী মুসলমানরা শুধু মেজরিটি হয়েই সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় শতকরা একশো হতে। সোজা উপায় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা। তা না হলে মারধোর লুটতরাজ নারীহরণ গৃহদাহ ইত্যাদি উপায়ে তাদের খেদানো। ব্রিটিশ বেয়োনেট সরে গেলে এটা চরমে উঠবে। তা বলে কি আমরা ব্রিটিশ বেয়োনেটকে ধরে রাখতে চাইব? কক্ষনো না। জিন্না সাহেব খোঁচা দিচ্ছেন যে আমরা নাকি ব্রিটিশ বেয়োনেটের আশ্রয়ে থেকে ভারত শাসন করার মতলব এঁটেছি। মানুষটি সন্দেহ দিয়ে গড়া।

তার পর বিহারের দিকে তাকাও। তুমি কি মনে করো বাদশা খানের কর্তব্য মোজেসের মতো বিহারী মুসলিমদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাড়ি দেওয়া? বিহারকে মুসলিমশূন্য করা? অমন করলে হিন্দুরা হয়তো নিষ্কণ্টক ও মুসলমানরা নিরাপদ হবে, কিন্তু হিন্দু মুসলিম মিলে আমরা এক নেশন থাকব না, দুই নেশনে বিভক্ত হব। মুসলিম লীগের থীসিসই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আর সেটা কিনা আমাদের কৃতকর্মের দ্বারাই। স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কী করব, যদি তার জন্যে ভারতীয় নেশনকে দুই নেশনে ভাগ করতে হয়? দুই নেশন হলে দুই রাষ্ট্রও অবশ্যম্ভাবী। আমরা যারা স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছি তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

হিন্দু মুসলমান সাতশো বছর ধরে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। কখনো যে নোয়াখালীর মতো ঘটনা ঘটেনি তা নয়। কতক লোক ভয় পেয়ে পালিয়েছে, কতক অকুতোভয়ে প্রতিরোধ করেছে, কতককে বাঁচিয়েছে তাদের প্রতিবেশীরা, কতককে রক্ষা করেছেন সরকার আর অধিকাংশের রক্ষক ভগবান। এবারেও তাই হবে। ইহুদীদের মতো তাদের প্রব্রজ্যা করতে হবে না। বিহারের মুসলমানদেরও না। তাদেরকেও সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। তারা সরে আসবে বাংলাদেশে হিন্দুর শূন্যস্থান পূরণ করতে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ। ভাষা এক নয়, খাদ্য এক নয়, ঐতিহ্য এক নয়, সংস্কৃতি এক নয়। ওদের যারা ডেকে আনছে তারাই একদিন ওদের খেদাবে। বাপুর নীতি হলো যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। সেখানেই তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে। এ কাজ যেমন সরকারের তেমনি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরও। নোয়াখালীতে লীগ সরকারের তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের। বিহারে কংগ্রেস সরকারের তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের। জিন্না সাহেবকে দিয়ে তিনি একটা স্বীকার করিয়েও নিয়েছেন।"

এর পর পারিবারিক প্রসঙ্গ। জুলির কথা। যুথিকার কথা।

মানসকে লেখা চিঠিতে সৌম্য লেখে, "আমার অবস্থাটা এখন হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রকাশিত একখানি উপন্যাসের নায়কের মতো। হান্‌স ফালাডার 'লিটল ম্যান, হোয়াট নাউ।' পড়েছ নিশ্চয়। এত দিন যে জাতীয়তার সাধনা করলুম সে জাতীয়তা বিপন্ন। এক জাতি দুই জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। এতদিন যে অহিংসার সাধনা করলুম সে অহিংসাও এখন বিপন্ন। আমার প্রধান অবলম্বন ছিল হিন্দুর অহিংসা। বৌদ্ধর অহিংসা। জৈনর অহিংসা। সব মিলিয়ে ভারতের অহিংসা। গান্ধীর জীবনে যা মূর্ত। এখন দেখছি হিন্দুও আর মাইলড হিন্দু নয়। সে ওয়াইলড হিন্দু। তার মতে অহিংসা হচ্ছে কাপুরুষতার মুখোশ। আর হিংসাই হচ্ছে বীরত্ব। গান্ধীকে সে পিঁজরাপোলে পাঠাতে চায়। মুসলমানরা হিংসা ভিন্ন আর কোন ভাষা বোঝে না। তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। বল্লভভাই বলেছেন তরবারির সঙ্গে তরবারির ভেট হবে। সোর্ড উইল বি মেট বাই সোর্ড। সেটাই নাকি সব হিন্দুর মনের কথা। বাপুর প্রিয় গান এখন গুরুদেবের 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে।' আমারও প্রিয় গান।

আশ্রমে ফিরে এসে এবার মনে হচ্ছে এর অস্তিত্ব আর কদ্দিন! যেমন ক্যাপটেন মুস্তাফীর সেবাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। তিনি এটা ট্রাস্টীদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন। পাকিস্তানে তিনি মানসম্মান নিয়ে বাস করতে পারবেন না, যদি পাকিস্তান হয়। কিন্তু আমি যে কাসাবিয়াঙ্কা।

হোম মেম্বর পদ নিয়ে বল্লভভাই ভেবেছিলেন নোয়াখালীর উপরেও তাঁর এক্তিয়ার। কিন্তু নোয়াখালীর উপরে এক্তিয়ার বাংলাদেশের সরকারের। তার মানে সুহরাবর্দী সাহেবের। তিনি থাকতে গভর্নরও সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। তবে তাঁর কিছু রিজার্ভ পাওয়ার আছে। সেটা খাটাতে গিয়ে সুহরাবর্দীর সঙ্গে ঝগড়া করতেও তিনি নারাজ। সুহরাবর্দী গেলে তাঁর সরকারের পতন হয়। শূন্য স্থান পূরণ করবে কে? কংগ্রেস নয়। তবে কি গভর্নর স্বয়ং? তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে হবে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ইংরেজ মরবে। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে বাপুর মতো একজনের উপস্থিতি প্রয়োজন। তাঁর যে কোনো ক্ষমতা আছে তা নয়। তাঁর আছে নৈতিক প্রভাব যা দিয়ে তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনছেন। কিন্তু সেটা তো রাজনৈতিক সমাধান নয়। যেমন লীগপন্থী তেমনি কংগ্রেসপন্থী সকলেই চায় রাজনৈতিক সমাধান। তার মানে কী? কোয়ালিশন না পার্টিশন? পার্টিশন কোনো পক্ষই চান না। কিন্তু কোয়ালিশনই বা কেমন করে সম্ভব? জিন্না নারাজ। আগে বিহার, যুক্ত প্রদেশ ইত্যাদিতে কোয়ালিশন হোক। তারপরে বাংলায় হবে। এতে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আপত্তি। কেন্দ্রীয় সরকারে লীগ মেম্বরদের চাল দেখে তাঁরা শঙ্কিত। লীগ খেলোয়াড়রা টীম ওয়ার্কে বিশ্বাস করেন না। ফুটবল খেলায় তাঁরা সেমসাইড গোল করবেন। উদ্দেশ্য ভিতর থেকে লড়াই করে পাকিস্তান আদায়।

তাঁদের তাড়ালেও তাঁরা চুপ করে থাকবেন না। জেহাদের ডাক দেবেন। তার মানে গৃহযুদ্ধ। আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনি। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব? সেটা তো আরো বীভৎস। প্রতিবেশীই প্রতিবেশীকে মেরে তার ঘরবাড়ী জায়গা জমি দখল করবে। তার বৌঝিকেও হরণ করবে। গৃহযুদ্ধে যদি অনিচ্ছা থাকে তবে 'সোর্ড উইল বি মেট বাই সোর্ড' বলে কেন ওদের রাগিয়ে তোলা? সেটা আর যাই হোক রাজনৈতিক সমাধান নয়। তা ছাড়া ইংরেজরাই বা ওতে জড়িয়ে পড়তে চাইবে কেন? ওরা তো ওদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতেই কৃতসংকল্প। পাঁচ বছর আগে তেমন সুমতি ওদের ছিল না।

কতকটা রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধে ভারতের সহযোগিতার আশায়, কতকটা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামের ভয়ে ওরা ওদের পলিসি ঠিক করে ফেলেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে ওরা মিটমাট চায়, সেইসঙ্গে লীগের সঙ্গেও মিটমাট। লীগকে ওরা কংগ্রেসের করুণানির্ভর করবে না। করতে গেলে লীগ তেড়ে আসবে।

কংগ্রেস অনায়াসেই অ্যাবডিকেট করতে পারে, কিন্তু তার পরে কী করবে? সহসা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স শুরু করতে বাপুও অনিচ্ছুক। হিংসার প্রেস্টিজ এখন তুঙ্গে। অহিংস আন্দোলন রাতারাতি সহিংস হয়ে উঠবে। অথচ তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেও পারবেন না। সেটা তাঁর স্বভাবে নেই। কংগ্রেসকে তিনি ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু সেটা তো কোনো রাজনৈতিক সমাধান নয়। আর ইংরেজরা যদি দেখে তেমন কোনো সমাধানের আশা নেই তারা মিটমাট না করেই কুইট করবে। পাঁচ বছর আগে আমরা ওদের কুইট করানোর জন্যে অধীর হয়েছিলুম। কিন্তু এখন আমরা ওদের সঙ্গে মিটমাটের জন্যে অধীর। মিটমাট হয়ে যাবার পরে ওরা কুইট করবে। কিন্তু আগে জিন্নার সঙ্গে মিটমাট না হলে ওদের সঙ্গে মিটমাট হবার নয়। চাবীটা এখন জিন্নার হাতেই। বল্লভভাইয়ের হাতে নয়। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। এই হচ্ছে কংগ্রেসের হাল।"

উকীল সরকার রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার একদিন জেলা শাসক ক্যামেরন সাহেবকে নিয়ে আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। অমনি করে সৌম্যর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। দিনকয়েক বাদে রায় বাহাদুর তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। বলেন, "সাহেব সেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়েছেন। আরো কিছু প্রশ্ন করতে চান। সেটা গোপনীয়।"

একটু পরে ক্যামেরন এসে সৌম্যর সঙ্গে করমর্দন করেন। "শুনেছি আপনি মিস্টার গান্ধীর কাছের মানুষ। এই সম্প্রতি তাঁর কাছ থেকে এসেছেন। জানতে ইচ্ছে করে তিনি কী ভাবছেন। আবার ডাক দেবেন, 'কুইট ইণ্ডিয়া'?"

সৌম্য হেসে বলে, "তিনি যে কী ভাবছেন তা তিনিই জানেন। আর কারো সাধ্য নেই যে জিজ্ঞাসা করে। না, তিনিও জানেন না। বরাবরই দেখা গেছে তাঁর ইনার ভয়েস তাঁকে হঠাৎ একদিন জানায় কী করতে হবে। আমরা যুক্তি খুঁজে পাইনে, তর্ক করি। তিনি বলেন, ইনটেলেকট দিয়ে

পরে বুঝবে। এখন যা করতে বলছি তাই করো। পরে যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করেছি। ভুল করে থাকলে তিনি আপনি ভুল স্বীকার করেন।"

ক্যামেরনও হাসেন। "আপনি কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন, মিস্টার চৌধুরী। এদেশ কুইট করার জন্যে আমি ছটফট করছি। কথা ছিল এই জানুয়ারিতে জাহাজ ধরব। এখন শুনছি মার্চের আগে নয়। ইতিমধ্যে তিনি যদি আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেন তা হলে জাহাজও হাতছাড়া হবে, নতুন চাকরিতেও ওরা অন্য লোক নেবে। এই ঝুলে থাকা অবস্থায় নিজের জন্যে বা পরিবারের জন্যে কিছুই প্ল্যান করা যাচ্ছে না। উপর-ওয়ালাদের সুধালে তাঁরাও বলেন, আমাদেরও একই দশা। যারা কুইট করতে ষোল আনা প্রস্তুত তাদের এমন কী চমক আছে যা আপনারা দিতে পারেন?"

"না, নতুন কোনো চমক আমারও জানা নেই। তবে যতদূর বুঝতে পারছি নেহরুর জন্যেই গান্ধী পায়চারি করছেন। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি ছদ্মনামে ওই যে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সটি লণ্ডন থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে গান্ধীজীকে তা ভোলাতে পারে না, নেহরুকে ভুলিয়েছে। তিনিই তো চেয়েছিলেন কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি। ওটা তাঁরই শিশু। শিশুটি যদি দাঁড়াতে না পারে, হাঁটতে না পারে, দৌড়তে না পারে, তার বিকাশ বন্ধ করে দেন জিন্নার মুখ চেয়ে ওয়েভেল তবে নেহরুও ঠেকে শিখবেন যে 'আগে শাসনতন্ত্র পরে স্বাধীনতা' নয়, 'আগে স্বাধীনতা পরে শাসনতন্ত্র।' তখন তিনি গদী থেকে নেমে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে। এইপর্যন্ত আমি অনুমান করতে পারি। পরের ধাপটা বোধহয় মুসলিম লীগ সদস্যাদেরকে কংগ্রেসের পরিত্যক্ত আসনগুলি দেওয়া, কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় সরকারকে দুটি কেন্দ্রীয় সরকার করা নয়। লীগ রাজত্বে কংগ্রেসের আপত্তি হবে না, কিন্তু লীগের কথামতো ভারত ভাগে কংগ্রেস বাধা দেবে। আপনারা দেশে ফিরে যাবেন কেন, লীগ রাজত্বে পরম সুখে বাস করবেন। কিন্তু দেশে ফেরার তাড়া আছে বলে ধর্মের নামে দেশ ভাগ করে দিয়ে যাবেন আর আমরা চুপ করে বসে থাকব? গর্জে উঠব না? জাহাজ আটকাব না? প্লেন আটকাব না। ব্যাগেজ আটকাব না?" সৌম্য টিপে টিপে হাসে।

ক্যামেরন রাগতভাবে বলেন, "তা হলে গুলী চলবে কিন্তু।"

"তা কি আমরা জানিনে? গুলী চলতে চলতে ফুরিয়ে যাবে। তখন

শাদা নিশান তুলে আত্মসমর্পণ। আপনারা সবাই বাঁচবেন, একজনেরও সাজা হবে না। কিন্তু ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে। দুই দেশের মাঝখানে পড়ে থাকবে হাজার হাজার ভারতীয়ের লাশ। দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। সাত সমুদ্র যে ব্যবধান রচনা করেনি আর একটা জালিয়ানওয়ালাবাগ তা করবে। আমাদের সম্মতি না নিয়ে যে পার্টিশন ওয়াল তৈরি হবে আমরা সেটাকে ধূলিসাৎ করব। সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বরাবরের জন্যে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করতে হবে। এই কারণে আপনাদেরও হাজির থাকতে হবে। আপনাদের সরকারই আপনাদের আটকাবে।" সৌম্য রসিয়ে রসিয়ে বলে।

ক্যামেরন ভিতরে ভিতরে চটে যান। "ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে নিলেই তো পার্টিশন এড়ানো যায়।"

সৌম্যও মনে মনে রাগ করে। "আসাম কি মুসলমানদের প্রদেশ? সেটা কোন হিসাবে মুসলমানদের ভাগে পড়ে? অসমীয়ারা বিয়াল্লিশ সালে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। কেমন করে আমরা তাদের মুসলিম লীগের কবলে তুলে দিই? আপনাদের মাথায় ঘুরছে কংগ্রেস ও লীগের ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। হিন্দু মেজরিটির সঙ্গে মুসলিম মাইনরিটির ব্যালান্স। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের সঙ্গে মুসলিম সেপারেটিস্টদের ব্যালান্স। এ ধরনের ব্যালান্স উপর থেকে চাপানো। আপনাদের যতদিন চাপানোর ক্ষমতা ছিল ততদিন সম্ভব ছিল। এখন ক্ষমতার শেষ দশা। এখনো চাপানোর চেষ্টা! ভাগাভাগির ব্যাপারটা কংগ্রেস ও লীগের ঘরোয়া ব্যাপার। সেটা একভাবে না একভাবে হবেই। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করতে। সদ্ভাব রক্ষার জন্যে পাকিস্তানও দিতে পারি। কিন্তু সদ্ভাবের কোনো চিহ্নই নেই। গায়ের জোরের আস্ফালন। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। আর কী জঘন্য লড়াই? নিরীহ নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। নিরীহ স্ত্রীপুরুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলমা পড়ানো ও গোমাংস খাওয়ানো। ইংরেজ রাজত্বের আগে এসব মাঝে মাঝে হয়েছিল বলেই হিন্দুরা ইংরেজ রাজত্বকে তুলনায় পছন্দ করে। এখন ইংরেজ থাকতেই আবার সেই দৃশ্য। ওদিকে বিহারের হিন্দুরা একই মুদ্রায় শোধ দিতে গিয়ে সমান ঘৃণ্য কাজ করছে। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট। এই ভিসাস সার্কল ভঙ্গ করতেই হবে। এই নিয়েই আমরা চিন্তিত। আমরা যারা গান্ধীজীর কাছের মানুষ। আপনারাও

খেয়াল রাখবেন যে দুই শতাব্দী ধরে যে গুড উইল গড়ে তুলেছেন তাকে হারিয়ে ফেললে কী নিয়ে বাড়ী ফিরবেন।"

ক্যামেরন দুঃখিত হন। বলেন, "এ জেলায় তেমন কিছু ঘটবে না। আমি বদ্ধপরিকর। সেইজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

হালদার তারিফ করেন। "হ্যাঁ, আপনার আসার পর থেকে আমরাও নিশ্চিন্ত। মনে রাখবেন, মিস্টার ক্যামেরন, এই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আপনারই মতো একজন স্কটসম্যানের হাতে গড়া। হিউম সাহেবও আপনারই মতো সিভিলিয়ান ছিলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্গে হাত মেলান দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দীন তৈয়বজী, ডব্লিউ সি বনার্জী। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী। বনার্জীর সাহেবী চালচলন থেকে লোকে ধরে তিনি ছিলেন খ্রীস্টান। সেটা ঠিক নয়। তিনি হিন্দুই ছিলেন, তবে তাঁর স্ত্রী বিলেত বাস করার সময় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শেষ কন্যাটি খ্রীস্টান, অন্যান্য পুত্রকন্যা হিন্দু। এই হলো কংগ্রেসের ঐতিহ্য। কংগ্রেস কোনো দিনই হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমিও এককালে তার সদস্য ছিলুম। কলকাতায় অ্যানী বেসাণ্ট যেবার প্রেসিডেণ্ট হন সেবার জিন্নাকেও দেখেছি কংগ্রেসের মঞ্চে। ফজলুল হকও একসময় কংগ্রেসের জেনারল সেক্রেটারি ছিলেন। মহম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্ব যাঁদের সহ্য হয়নি তাঁরা একে একে কংগ্রেস থেকে সরে যান। পরে আলী ভ্রাতারাও তাই করেন। আমি কংগ্রেস ত্যাগ করি আদালত বর্জনে নারাজ হয়ে। আদালত ছাড়লে খাব কী? কংগ্রেস তখন মুসলমানদেরও আস্থাভাজন ছিল। আর মুসলিম লীগের সভাতেও হিন্দুরা যাতায়াত করতেন। জিন্না একবার কংগ্রেস লীগের মিলন ঘটিয়ে দেন। তাঁর ঘটকালিতেই লখনউ চুক্তি সফল হয়। সেটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করার জন্যে। তাঁর মতে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ আদায় করতে হলেও সেইরকম আরো একটা চুক্তি চাই। তার বদলে অসহযোগ করে কী হবে? দ্বিতীয়বার ঘটকালি করতে না পেরেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন। সম্পূর্ণ হতাশ না হলে তিনি পার্টিশন দাবী করতেন না। তাঁর মতে কংগ্রেস নেতৃত্বে ইণ্টারিম গভর্মেণ্ট গঠিত হতে যাচ্ছে বলেই তাঁর ডাইরেক্ট অ্যাকশন। পার্টিশন বা ডাইরেক্ট অ্যাকশন কোনোটাই আমি সমর্থন করিনে। এসবের জন্যে আমি ব্রিটিশ সরকারকেও দায়ী করতে পারিনে। আমরা ঝগড়া করতে করতে যেখানে এসে পৌঁছেছি সেটা একটা

পর্বতের চূড়া। পায়ের তলায় গভীর খাদ। আর একটু হলেই পদস্খলন ও পাতালে পতন। কী করে শেষ রক্ষা হয় সেই কথাই ভাবছি। সৌম্য, তোমাকেও ভাবতে হবে। লড়াই তো অনেক করলে। এখন সন্ধি করো। মুসলিম লীগের সঙ্গে করতে না চাইলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে করতে না চাইলে মুসলিম লীগের সঙ্গে। কারো সঙ্গে সন্ধি করবে না, এই ধনুর্ভঙ্গ পণ দেশকে ছারখার করবে। তুমি যদি মনে করো সেইটেই স্বাধীনতা তবে আমি নাচার।"

"রায় বাহাদুর, আপনার কথাই ঠিক। আর লড়াই নয়। এখন সন্ধি। আসুন হ্যাণ্ডশেক করা যাক।" ক্যামেরন হাত বাড়িয়ে দেন।

সৌম্য তাঁর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, "তথাস্তু।"

ক্যামেরন জানতে চান সে কখনো বিলেত গেছে কি না। সৌম্য বলে, "বিশ বছর আগে। দু'বছর ছিলুম। খুব ভালো ব্যবহার পেয়েছি। এখনো সেদেশের বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাই। তাঁরা সবাই প্যাসিফিস্ট ও ভারতমিত্র। মুরিয়েল লেস্টারের কিংসলী হলে গান্ধীজী অতিথি হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হয়ে বড়ো কোনো হোটেলে থাকেননি। ইস্ট এণ্ডের গরিবরাই তাঁর প্রতিবেশী। আর চার্চের লোকরাই তাঁর আপনার লোক। যেমন মড রয়ডেন।"

রায় বাহাদুর বলেন, "মিসেস চৌধুরীও বহুদিন বিলেতে ছিলেন। ফিরে এসে টেররিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন। এখন স্বামীর মতো গান্ধীপন্থী।"

"আলাপ হলে খুশি হব। কবে আসছেন এখানে?" ক্যামেরন সুধান।

সৌম্য সঙ্কোচ বোধ করে। রায় বাহাদুর বলেন, "ইণ্টারেষ্টিং কণ্ডিশন।" যে কথা মুখে আনা যায় না, ইঙ্গিতে বোঝাতে হয়।

"ওঃ!" সাহেব সহানুভূতির স্বরে বলেন।

ক্যামেরনের অন্যত্র কাজ ছিল। তিনি বিদায় নেন। কিছুক্ষণ পরে মোহিনীমোহন ধর আসেন। বলেন, "ক্যামেরনকে কেমন দেখলে, সৌম্য?"

"লোকটাতো ভালোই। ইংরেজরা কেই বা ভালো নয়? কিন্তু ওদের পলিসি নিয়েই আমাদের কারবার। আর পলিসি তো সেই সনাতন ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। তার থেকে আসে ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। ইচ্ছে থাক আর নাই থাক মিস্টার ক্যামেরনকেও সেই পলিসি অনুসরণ করতে হবে।"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে কী ভাবেন। বলেন, "দিল্লী ঘুরে এলুম। জানতে

কৌতূহল ছিল, কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি কী জিনিস। আর একটা লালকেল্লা না কুতব মিনার। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হলো। কিন্তু এত বড়ো যে যজ্ঞ তাতে শিব নেই। শিবহীন যজ্ঞ।"

রায় বাহাদুর সৌম্যর দিকে তাকান। সৌম্য মোহিনীবাবুর দিকে। তিনি পরিষ্কার করেন। "অর্থাৎ জিন্না নেই। সবচেয়ে পুরাতন পার্লামেণ্টারিয়ান। সব চেয়ে অভিজ্ঞ। সব চেয়ে সুদক্ষ।"

"সেকথা ঠিক।" বাসুদেব বলেন। "সেকালের কংগ্রেসে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি।"

"আমার মনে বড়ো দুঃখ হলো। দেখা করতে গেলুম তাঁর বাড়ী। সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমি বললুম, 'শিবহীন যজ্ঞ। তাই শিবকে দেখতে এসেছি।' তিনি বাঁকা হাসি হেসে বলেন, 'ওরা ভেবেছে ওদের ওই যজ্ঞ ফলপ্রদ হবে।' এর পরে তিনি একটা কৈফিয়ৎ দেন। 'যেতে কি আমার কম ইচ্ছে? কিন্তু গিয়ে ফল কী হতো? ওদের যা দস্তুর। সিদ্ধান্তগুলো ওরা নেয় ঘরোয়া বৈঠকে বসে। তার পর আইন সভায় ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নেয়। ব্রুট মেজরিটির জোরে। গান্ধীকে চেপে ধরলে তিনি জবাব দেন, 'কেন, বিলেতের পার্লামেণ্টে কী হয়? সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় লণ্ডনের কার্লটন ক্লাবে। পার্লামেণ্ট একটা রেজিস্টারিং বডি।' গান্ধীর দৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষ যেন কেউ নয়। তাঁর নিজের পার্লামেণ্টারি অভিজ্ঞতা নেই। তিনি তাতে বিশ্বাসই করেন না। নেহরু তো বিপ্লবী। আর বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁরা তো পার্টি ম্যানেজার। ভোট আর জোট এই নিয়ে এঁদের কেরামতি। শাসনতন্ত্রের এঁরা বোঝেন কী? আমার যা উদ্দেশ্য তা আমি ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিয়ে সিদ্ধ করব।' আমি দেখি তাঁর মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস।" মোহিনীবাবু বলে যান।

"তার পর তুমি কী বললে?" রায় বাহাদুর প্রশ্ন করেন।

"আমি বললুম, কায়দে আজম, কাগজে দেখলুম আপনি লোকবিনিময় দাবী করেছেন। তার মানে কি বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দু থাকবে না, শূন্যতা পূরণ করবে আড়াই কোটি পশ্চিমা মুসলমান? যাদের ভাষা উর্দু। বাঙালী মুসলমানরা কি বাংলা ছাড়বে, না পশ্চিমা মুসলমানরা উর্দু? ভাষা নিয়ে ঝগড়া বাধবে না? আর বাঙালী হিন্দুরাও যে বিহারে বা যুক্তপ্রদেশে স্বাগত হবে তা নয়। এমনিতেই যথেষ্ট বাঙালীবিদ্বেষ। তারা পশ্চিমে না

গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দাবী করবে ও কলকাতায় আরেক দফা লড়বে।' তিনি ধাক্কা খেয়ে বলেন, 'তাই তো। লোকবিনিময়টা দেখছি ড্রপ করতে হবে। কিন্তু গোটা বাংলাদেশটাই আমি চাই।' তাঁর বিশ্বাস তিনি যাহা চাইবেন তাহা পাইবেন। আমি মনে মনে হাসি।" মোহিনীবাবু বলেন।

"বাঁচালে।" বাসুদেব তারিফ করেন। "তুমি আমাদের লোকবিনিময়ের অভিশাপ থেকে বাঁচালে। কিন্তু মনে মনে হাসলে কেন?"

"সে অনেক কথা। ধৈর্য থাকে তো শোন। ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানরা যেমন লড়েছে হিন্দুরা তেমন নয়। কিন্তু লাভ হলো হিন্দুদেরই, মুসলমানদের নয়। সার সৈয়দ আহমদ খান্ তাঁর স্বধর্মীদের বোঝান যে শত্রুভাবের সাধনায় হারানো বাদশাহী ফিরে পাওয়া যাবে না। মিত্রভাবের সাধনা করতে হবে। আর কিছু না হোক চাকরি তো মিলবে। মিত্রভাবের সাধনাই তখন থেকে শিক্ষিত মুসমানদের নীতি। কংগ্রেসের চেয়ে লয়াল হতে হবে, এটাই হয় মুসলিম লীগের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মুশকিল বাধে যখন প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক যোগ দেয় জার্মান শিবিরে। খলিফা বিপন্ন হলে ইসলামও বিপন্ন হয়। মুসলমানরা যুদ্ধে কোন্ পক্ষে লড়বে? খলিফার পক্ষে না সম্রাটের পক্ষে? মুসলিম লীগ তো ইংরেজের আঁচলবাঁধা। মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শৌকত আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এঁরাই নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধের পরে এঁরা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে খেলাফতের ইস্যুর সঙ্গে স্বরাজের ইস্যুর ঘোঁট পাকিয়ে রাজদ্রোহী আন্দোলনে নামেন। মুসলিম লীগ থেকে মুসলমানরা সরে গিয়ে কংগ্রেসে ঢোকে। সার সৈয়দ আহমদ খানের পলিসির সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের সরিয়ে রাখতে। কারণ কংগ্রেসের রাজভক্তি সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। মুসলিম জনমত দ্বিধাবিভক্ত হয়। লীগপন্থী মুসলমানদের চেয়ে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের জনপ্রিয়তা বেশী।" মোহিনীবাবু দম নেন।

"তারপর?" বাসুদেব উৎকর্ণ। সৌম্যও।

"অপূর্ব কৌশলে কংগ্রেসের কোর্ট থেকে লীগের কোর্টে বল ফিরিয়ে আনেন জিন্না। তখন তিনি আর কংগ্রেস নেতা নন। তিনি ইতিমধ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি গঠন করে ব্রিটিশ তাঁবেদারি থেকে পরিত্রাণের উপায় দেখিয়েছিলেন। অথচ কংগ্রেসের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে শত্রুভাবের সাধনা শেখাননি। এক দরজা খোলা রেখেছিলেন

ইংরেজের দিকে, আরেক দরজা কংগ্রেসের দিকে। এই পলিসির অগ্নিপরীক্ষার দিন আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। মুসলিম লীগ রাজশক্তির সঙ্গে সেই দুর্দিনে সহযোগিতাও করে, অসহযোগও করে। এই দুমুখো পলিসির দরুন ব্রিটিশ সহানুভূতির অর্ধেক হারায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর বিবেচনায় গান্ধী যদি হন পূর্ণ শত্রু তো জিন্না হচ্ছেন অর্ধ শত্রু ও অর্ধ মিত্র। একজন যদি অখণ্ড ভারত না পান তো অন্যজন কেন অখণ্ড পাকিস্তান পাবেন? স্যার সৈয়দ আহমদ খান্ হলে যত বড়ো পাকিস্তান পেতেন মহম্মদ আলী জিন্না তত বড়ো পাকিস্তান পেতে পারেন না। যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মোহিনীবাবু থামেন।

বাসুদেব জেরা করেন, "তুমি কি বলতে চাও আবার বঙ্গভঙ্গ হবে?"

"সেইরকম একটা গুজবই শুনে এলুম অন্তরঙ্গ কংগ্রেস মহলে।" মোহিনী-বাবুর জবাব। "হয় কোয়ালিশন নয় পার্টিশন। জিন্নার যে পলিসি পাটেলেরও সেই পলিসি।"

॥ এগারো ॥

মিলি এসেছে জুলিকে দেখতে। কুশলসম্ভাষণের পর বলে, "তুই আমাকে চুম্বকের মতো টানছিস্, মেয়ে। তুই ওখানে থাকলে আমিও ওখানে থাকতুম। তুই এখানে তাই আমি এখানে। তবে রণকে আমি কলকাতায় রাখতে সাহস পাচ্ছিনে। ওকে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে দিচ্ছি। ওরও ভালো লাগবে।"

"আমার বর যেখানে আমিও সেখানে। ওকে ওর বাপু আদেশ দিয়েছেন ওর আশ্রম না ছাড়তে। ও কাসাবিয়াঙ্কার মতো বাপের আদেশ পালন করতে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন করবে। আমি গেলে আমিও বিপন্ন হব, মিলি। যে বেচারা আসছে সেও। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা বাপুও বিপন্ন। কাসিবিয়াঙ্কার বাবাও বাঁচলেন না, তা জানিস্। সবাই মিলে আমরা এক ট্র্যাজেডীর অভিমুখে চলেছি। থামতেও পারিনে, পেছোতেও পারিনে। তবে তোর দিক থেকে তুই ঠিকই করেছিস্। তোকে আর ওখানে ফিরে যেতে হবে না। কী দরকার?" জুলি জোর দিয়ে বলে।

মিলি খিল খিল করে হাসে। "তোর বদ্ধমূল ধারণা তোর বরকে আমি

ভুলিয়ে নিতে চাই। দূর, পাগলী! যে যার সে তার। সৌম্য তোর, আমার নয়। তা ছাড়া আমি আর ও মুলুকে ফিরে যাচ্ছিনে। সম্পত্তির লোভেও না। আমার বর বিলেতে আমার নামে বাড়ী কিনে রেখেছে। কোথায় বিলেত আর কোথায় পূর্ববঙ্গ! লণ্ডন হচ্ছে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থান। আর পাকিস্তান? হা হা হা হা! তাই নিয়ে লড়াই করবে কোন্ নির্বোধ। আমি তো নয়ই। আমার বাবাও না। তিনিও মানে মানে চলে আসতে চান। মা তো কবে থেকে চলে আসার ধুয়ো ধরেছেন। বাবার অসংখ্য পেসেণ্ট। পেসেণ্টদের অনুমতি না নিয়ে চলে আসা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু তাঁর পেসেণ্টরা তো তাঁকে প্রাণে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচালে বাঁচাবে দেশের গভর্নমেণ্ট। ষোলই আগস্ট বাংলা দেশের গভর্নমেণ্টই বাধিয়ে দিল দাঙ্গা। সেটা হলো প্রথম ঘণ্টাধ্বনি। ছুটো মাস যেতে না যেতে আবার ঘণ্টাধ্বনি। এবার নোয়াখালী ও ত্রিপুরায়। এর পরের বার পূর্ববঙ্গের অন্য কোনো জেলায়। বাবা তার জন্যে অপেক্ষা করতে নারাজ। বেশ বোঝা যাচ্ছে মুসলিম লীগ পাকিস্তান আদায় না করে ছাড়বে না। ইংরেজরা যে জিন্নাকে বা সুহরাবর্দীকে জেলে পুরবে তাও নয়। জেলখানাটা গান্ধী, নেহরু, সুভাষ, জয়প্রকাশের জন্যে বরাদ্দ।"

"তোর জন্যেও। আমার জন্যেও।" জুলি মনে করিয়ে দেয়।

"আমি তো চুনোপুঁটি। আমাকে কে পোছে! কথা হচ্ছিল, পাকিস্তান যখন হবেই, আর বাংলাদেশের সবটা না হোক পূর্বভাগটা তার সামিল হবেই, তখন কেন মিছিমিছি মায়া বাড়ানো? ইংরেজরা যেমন ভারতের মায়া কাটাচ্ছে আমরাও তেমনি পূর্ববঙ্গের মায়া কাটাব। বাবা লিখেছেন তিনি সৌম্যদাকে বলেছেন যে যোদ্ধারা বেছে নেয় কোন্‌টা হবে যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে তাদের শক্ত ঘাঁটি তারই উপর নির্ভর করে জয়। পাঁচ বছর আগে তোমরা বেছে নিয়েছিলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম। ঠিকই করেছিল। সে সময় ইংরেজরা ছিল অপসরণশীল। তোমরা অনায়াসেই ভাঙচুর করে এক হাতে জাপানীকে আরেক হাতে ইংরেজকে ঠেকালে। তখন পরিস্থিতি ছিল তোমাদের অনুকূল, এখন কিন্তু তা নয়। পূর্ববঙ্গ ও সীলেট এখন মুসলিম লীগের অনুকূল, যদি গৃহযুদ্ধ বাধে। তোমাদের উচিত পশ্চিমবঙ্গে অপসরণ করা। সেখানেই ঘাঁটি গাড়া। কাসাবিয়াঙ্কার মতো অটল থেকে মৃত্যুবরণ করা নিরর্থক। মুসলিম লীগ অত সহজে ভুলবে

না। সে চায় ইংরেজের হাত থেকে সার্বভৌম পাকিস্তান, কংগ্রেসের হাত থেকে অটোনমি নয়। ক্ষুদ্রই হোক, বৃহৎই হোক, সার্বভৌম পাকিস্তান সে আদায় করে নেবেই। তার পেছনে অধিকাংশ মুসলমান। তারাও চায় পাকিস্তান। লড়কে লেঙ্গে। মুসলমানের হৃদয় জয় করার চেষ্টা আমিও কি কম করেছি? আমার পেসেণ্টদের অধিকাংশই তো দুঃস্থ মুসলমান। তাদের কাছ থেকে আমি নামমাত্র একটা ফী নিই, যাতে তাদের আত্মসম্মান বজায় থাকে। কিন্তু তাদের নির্বাচিত গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপ দেখে আমি হৃদয়ঙ্গম করছি যে হিন্দু মুসলমান কেউ কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কলকাতার হিন্দুরাও কম দাঙ্গাবাজ নয়। আমাকে বিলেতেই শেষপর্যন্ত যেতে হবে। আমি হিন্দুস্থানেও টিকতে পারব না। তোমরা যে যাই বল না কেন ইংরেজরা এদেশকে দু'শো বছর এগিয়ে দিয়েছে। ওরা চলে গেলে দেশ আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যেতে পারে। আর আমাদের মুসলিম বন্ধুরা যাই বলুন না কেন আমরা বাংলাদেশের হিন্দুরা তাঁদের একশো বছর এগিয়ে দিয়েছি। আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে গেলে তাঁরা একশো বছর পেছিয়ে যাবেন। বাবার প্রথম উক্তিটা আমি মানিনে, কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিটা বিলকুল ঠিক। তোর কী মনে হয়, ছুঁড়ি?" মিলি পরিহাস করে।

"দূর, আমি ছুঁড়ি হতে গেলুম কেন? স্বচক্ষেই দেখছিস্ আমার বয়স এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। তোরও তাই। তা বলে তোকে আমি ছুঁড়ি বলে অপমান করব না। এ বয়সে একটু ভারিক্কি হতে হয়।" জুলি গম্ভীরভাবে বলে।

"এইজন্যেই আমি ইণ্ডিয়ান থাকতে চাইনে। এদেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি। আর ওদেশের মেয়েরা দু'কুড়িতেও ছুঁড়ি। তুই এত সীরিয়াস কেন? ভিতরে রসবোধ নেই কেন? আমি হলে ওই মিন্‌সের দাড়ি ধরে নাচতুম। কী করে যে তুই ফুলঝাড়ু সহ্য করিস্?" মিলি হাসির হুল্লোড় তোলে।

"ছি! পরস্ত্রী হয়ে পরপুরুষকে নিয়ে অমন ব্যঙ্গ করা ভালো দেখায় না। আমি কি কখনো বলেছি যে তোর বর সুকুমার একটা মেনিমুখো বাঁদর? জানি, তোর মনে লাগবে। হাজার হোক স্বামী তো।" জুলি অবিবেচক নয়।

"ওই বাঁদরকে তুই ফন্দী করে আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিস্। তোকে তাই

কোনোদিন ক্ষমা করতে পারিনি। তবে সমান ভালোবাসি। তোর মতো দুঃখ তো আমি পাইনি, তাই তোর সুখে আমি সুখী। তোর মতো মেয়েদের ওল্ড গার্ল বলাটা ভালোবাসারই নিদর্শন। ইয়াং লেডী বলাটা তো রীতিমতো শিষ্টাচার।" মিলি জুলির দুই গালে চুমু খায়।

জুলি ওর দুই গালে দুই চড় কসিয়ে দেয়। "তোর বয়স দেখছি দিন দিন কমছে। বিলেতে সাত বছর বাস করে তুই দেখছি বিজতীয় বনে গেছিস্। যদিও বিষম ব্রিটিশবিদ্বেষী। আচ্ছা, এখন একটু রাজনীতি হোক। জানতে পারি কি আপাতত তোদের প্রোগ্রামটা কী?"

"আমরা মুসলিম লীগের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইনে। যুদ্ধ আমাদের ওই জোরদার খুঁটির সঙ্গে, মেড়ার সঙ্গে নয়। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। খুঁটিটাকে হটাতে পারলে মেড়াটাকেও বাগে আনতে পারা যাবে। আমরা নজর রেখেছি ওয়েভেলের উপরে, অ্যাটলীর উপরে, চার্চিলের উপরে! জিন্নাকে ওঁদের কে কতখানি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সুকুমার আমাকে ভিতরের খবর পাঠাচ্ছে, ওর অনেক সোর্স আছে। ও লিখছে ভারতের পার্টিশন তো হবেই বাংলার পার্টিশনও হতে পারে, যদি না বাঙালী হিন্দু মুসলমান কোয়ালিশন ক্যাবিনেট গঠন করে, যদি না বাংলাদেশ উভয়ের ইচ্ছায় হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান ভিন্ন তৃতীয় এক রাষ্ট্র পত্তন করে। কলকাতায় এসে আমি এখন বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নাড়ী টিপছি। গৃহযুদ্ধে বিশেষ কারো উৎসাহ দেখছিনে, যদিও বৈরীভাব অধিকাংশের মনে।" মিলি যতদূর বোঝে।

জুলি তা শুনে বলে, "গৃহযুদ্ধে কারো বিশেষ উৎসাহ নেই, তবু হাতিয়ার জোগাড় করাতেও বিরাম নেই। অমন যে ভালোমানুষ দীপিকা বৌদি উনিও নাকি স্টেন গান কিনছেন। পাইপ গান তো আজকাল পাড়ায় পাড়ায়। পাঁচ বছর আগে আমরা যারা ছিলুম অ্যান্টি-ওয়ার আজ তারা প্রো-সিভিল ওয়ার হতে পারিনে। আমাদের বিশ্বাস ভায়োলেন্স দিয়ে কিছুই পাকাপাকিভাবে পাওয়া যায় না। না স্বাধীনতা, না পাকিস্তান, না সমাজতন্ত্র।"

"হীয়ার, হীয়ার। কস্তুরবা চৌধুরানী বলেছেন। বিয়ের পর সব মেয়েরই পদবী বদলে যায়, জানতুম। কিন্তু মতবাদও কি বদলে যায়? এটা হার মাস্টারস্ ভয়েস্ নয় তো?" মিলি ঠাট্টা করে।

জুলি ঠাট্টা বোঝে না। "সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে তোরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটত। তুইও একই কথা বলতিস্। ওর মতো পোড় খেয়েছে

ক'জন! ও অনেক দুঃখে শিক্ষা করেছে যে দেশের লোক যদি হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্ট বৃত্তে জড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতা হাওয়া হয়ে যাবে, পাকিস্তানও আসমনে ঝুলে থাকবে, আর সমাজতন্ত্র হবে আকাশকুসুম। ব্রিটিশ রুলের পরে আসবে মিলিটারি রুল। সেও একদিন যাবে, কিন্তু তার যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিদেশীরা এসে হাজির হবে। ইংরেজরাই যে সব চেয়ে খারাপ বিদেশী তা নয়, মিলি।"

"কথাটা সত্য। ওদের সঙ্গে সাত বছর থেকে আমারও বিশ্বাস হয়েছে যে ওরাই মন্দের ভালো। বাবা আমাকে বরাবরই এই কথা বলে এসেছেন, আমি গ্রাহ্য করিনি। তা বলে আমি তোর সঙ্গে একমত হতে পারব না যে অহিংসা দিয়েই স্বাধীনতা পাকাপাকিভাবে পাওয়া যাবে। ওই ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট পর্যন্তই তোদের দৌড়। ওর থেকে বেরিয়ে এলেও বিপদ, না এলেও বিপদ। যাকে বলে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। আমার কি কোনো কর্তব্য নেই? তোর কথা আলাদা। তোর সামনে কনফাইনমেণ্ট। আমার সে পাট চুকে গেছে।" মিলি কিসের ইঙ্গিত দেয়?

"কেন, তুই কি আর মা হতে রাজী নোস্? রণের একটি বোন হলে ভালো হতো না?" জুলি আশ্চর্য হয়।

"নো মোর। নো মোর। ওদেশের প্রগতিশীল মেয়েরা কেউ দ্বিতীয়বার মা হতে রাজী নয়। নয়তো নিজস্ব একটা কেরিয়ার বলে কিছু থাকে না। কেরিয়ারের খাতিরে একবার মা হতেও অনেকে নারাজ। স্বাধীনতা বলতে কি কেবল দেশের স্বাধীনতা বোঝায়? কত রকম স্বাধীনতা আছে। তার মধ্যে একটা হলো কেরিয়ারের স্বাধীনতা। পুরুষের বেলা এটা সর্বস্বীকৃত। যত আপত্তি শুধু নারীর বেলা। তোর নিজের ভবিষ্যৎটা কী হবে, মাইজী?" মিলি কৌতুক করে।

জুলি ঘাবড়ে যায়। "সৌম্যর যে ভবিষ্যৎ আমারও সেই ভবিষ্যৎ। কিন্তু স্বাধীনতার পরে ওরই বা কী ভবিষ্যৎ? ওর আশ্রমে ও অনেক টাকা দান করে ট্রাস্টি হয়েছে। কিন্তু আশ্রমটাই তো অচল হয়ে যাবে, যদি দেশ ভাগ হয়ে যায় আর আমরা এলিয়েন বনে যাই। বাচ্চাটাকে মানুষ করব কী করে?"

"তা হলে আর বাচ্চা না হওয়াই ভালো। তোদের তো বাঁধা গৎ ব্রহ্মচর্য। হা হা হা হা!" মিলি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

"আমার স্বপ্ন আরো একটি সন্তানের মা হওয়া। ছেলের পরে মেয়ে কিংবা মেয়ের পরে ছেলে। তার পরে না হয় তোর পন্থা অনুসরণ করব। তুটি না হলে জুটি হয় না। জুটি না হলে খেলাধুলা হয় না।" জুলি তার জন্যে প্রস্তুত।

"তুই কোন্ যুগে বাস করছিস্, বেবী ? রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে? বিলেতে থাকতে কত ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে। কেউ একটির বেশী চায় না, যদি আদৌ চায়। মা হওয়া যেমন কষ্টের, ছেলেমেয়েকে মানুষ করা তার চেয়েও কষ্টের। যুদ্ধের কি শেষ আছে? আবার যুদ্ধ বাধবে, ছেলেগুলো কন্সক্রিপ্ট হয়ে যুদ্ধে মরতে যাবে, মেয়েগুলোও আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে মরবে। তা হলে ওদের বহন করা কেন? লালনপালন করা কেন? উনবিংশ শতাব্দীতে এর একটা অর্থ ছিল। সেটা ছিল মোটের উপর শান্তির যুগ। আর এটা হলো মহা অশান্তির যুগ। ভারত স্বাধীন হয়েও কি এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে, ভেবেছিস্? ইংরেজরা যে আর আমাদের বন্দীরূপে দাবিয়ে রাখতে চাইছে না তার কারণ তারা ভাবী মহাযুদ্ধে আমাদের মিত্ররূপে পাবার আশা রাখে। আমাদেরও তো কমিউনিজমের ভয় আছে। না, নেই?" মিলি জুলির সমর্থন প্রত্যাশা করে।

"না, নেই। আমরা কাউকেই ডরাইনে। কেউ আমাদের শত্রু নয়। ইউরোপ একটা মিথ্যে ভয়ে ভুগছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি পনেরোটা রেপাবলিকের জায়গায় পঞ্চাশটা রেপাবলিকের সমবায় হয় তবে নিজের চরিত্র হারাবে। তার কমিউনিজমে প্রচুর খাদ মেশাতে হবে। ইতিমধ্যেই ন্যাশনালিজমের খাদ মেশানো হয়েছে। স্টালিন নেপোলিয়ন নন। নেপোলিয়নের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে পতন ডেকে আনবেন না। তোরা হয়তো ভাবী মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে লড়তে রাজী হবি, আমরা কিন্তু ওর মধ্যে নেই, মিলি। আমরা কারো শত্রুও নই, কারো মিত্রও নই। সামনে পড়ে রয়েছে দারিদ্র্যমোচনের কাজ, বিরাট গঠনকর্মের প্রোগ্রাম। গণশক্তির একটি কণাও আমরা বাজে কাজে অপচয় করব না। যুদ্ধ একটা বাজে কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যাগ্রহ আবিষ্কারের পর যুদ্ধবিগ্রহের আর কোনো প্রয়োজনও নেই। সত্যাগ্রহই তার মরাল ইকুইভ্যালেণ্ট। শুধু যুদ্ধের নয়, বিপ্লবেরও। এদেশে যদি বিপ্লব হয় তবে সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই হবে। রক্তপাতের মাধ্যমে নয়।" জুলির কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

মিলির কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ। "হেলে ধরতে জানে না, কেউটে ধরতে যায়! জিন্নার সঙ্গেই এঁটে উঠতে পারছিস্‌নে, স্টালিনের সঙ্গে পারবি! গান্ধীজী যে একজন সাধুসন্ত সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আমি তাঁকে শতকোটি প্রণাম জানাই। কিন্তু তাঁর রাজনীতি আর অর্থনীতি আধুনিক যুগের উপযুক্ত নয়। দেশের লোক যতই আধুনিক হবে ততই তাঁর প্রতি বিমুখ হবে। তখন তাদের সামনে থাকবে দুটিমাত্র বিকল্প। পাশ্চাত্য ক্যাপিটালিজমযুক্ত ডেমোক্রাসী। অথবা প্রাচ্য কমিউনিজমযুক্ত ডিকটেটরশিপ। মাঝখানে তৃতীয় কোনো মতবাদ নেই রে, পাগলী। স্বাধীনতা চেয়েছিলি, স্বাধীনতা পাবি। তবে তার থেকে খানিকটা কাটা যাবে মুসলিম লীগকে বখরা দিতে। ব্যস্‌, এইপর্যন্ত তোদের দৌড়। এর পরে রঙ্গমঞ্চ থেকে তোদের প্রস্থান। তার বাইরে সাধু সন্ত হিসাবেই তোদের অবস্থান। আশ্রমটা তুলে দিস্‌নে। ওটাকে এপারে সরিয়ে নিয়ে আসিস্‌। সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সেইরকম কিছু করতে হবে। বাবার শেষবয়সের অবলম্বন। ওটাই ওঁর প্রাণ। ওঁর জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন। এত বয়সে উনি আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে জমিয়ে বসতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গে ওঁর মতো ডাক্তার শত শত।" মিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

"বিলেত গিয়ে প্যানেল কিনে জাঁকিয়ে বসতে পারেন।" জুলি পরামর্শ দেয়।

"বিলেত দেশটা বুড়োবুড়ীদের জন্যে নয়। যুবকযুবতীদের জন্যে। বাবা দু'দিনেই হাঁফিয়ে উঠবেন। এইসব মানুষই পার্টিশনের ভিকটিম। জিন্না নিজেও তাই হবেন। গান্ধীজীও। ট্র্যাজেডী!" মিলি আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

"কেন? পার্টিশন কি বিধির বিধান যে আমাদের সেটা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে?" জুলি ফোঁস করে ওঠে।

"না, বিধির বিধান নয়। কিন্তু নেসেসারি ইভিল। নরনারীর দাম্পত্য জীবনে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন সেপারেশন ছাড়া উপায় থাকে না। নিত্য কলহ, নিত্য মারামারির চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক সম্পর্কেরও এখন সেইরকম অবস্থা। তাই রাজনৈতিক সেপারেশনই মন্দের ভালো। সেটা লেবার গভর্নমেণ্ট থাকতেই চুকে যাক। ওদের সঙ্গে দরাদরি না করলে ওরা সারা বাংলা মুসলিম লীগ

গভর্নমেণ্টের হাতে স'পে দিয়ে যাবে। দরাদরি করলে কংগ্রেসের হাতেও একটা ভাগ তুলে দেবে। এই কথাটাই জানিয়েছে সুকুমার।" মিলি প্রকাশ করে।

"তোদের মধ্যে সেপারেশন হচ্ছে না তো?" জুলি জেরা করে।

"না, আইনত নয়। তবে কার্যত তাই। আমার বিয়ের সাধ মিটে গেছে। এ জীবনে আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। ও যদি আর কাউকে বিয়ে করতে চায় তবে আমি পথ রোধ করব না। ডিভোর্স দেব।" মিলি উত্তর দেয়।

"জানিস্ তো ওর স্বভাব। তোর শূন্য স্থান অপূর্ণ থাকবে না।" জুলি শঙ্কিত।

"ডিভোর্সের মামলায় ওই তথ্যটা আমার অনুকূলে যাবে।" মিলি নিঃশঙ্ক।

"কিন্তু তোর ছেলে কত কষ্ট পাবে! সে তার বাপকেও চাইবে, তার মাকেও চাইবে। তুই বিলেত ফিরে যা। কিংবা সুকুমারদা দেশে ফিরে আসুক। চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটে যাবেই।" জুলি আশ্বাস দেয়।

"বাবার দিক থেকে স্ট্যাণ্ডিং অফার রয়েছে। তাঁর মেডিকাল সাপ্লাই কনসার্নের ডিরেক্টর পদের জন্যে একজন আপনার লোকের দরকার। কলকাতায় হেড অফিস। ও রাজী নয়। পাছে লোকে বলে ঘরজামাই। তা ছাড়া ওর যা স্বধর্ম। ও মিশবে পলিটিসিয়ান আর ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে। বেশীর ভাগই বামপন্থী। অথচ কমিউনিস্ট নয়। ভিতরের খবর ওর মতো আর ক'জন রাখে? কোনো এক পত্রিকা যদি ওকে স্পেশাল করেস্‌পণ্ডেণ্ট করে তা হলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যায়। দিল্লীকে কেন্দ্র করে ও সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করবে। আমি কিন্তু দিল্লীতে বাসা বাঁধতে নারাজ। রণ যদি শান্তিনিকেতনে পড়ে আমার বাস কলকাতায়। এখানে নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। তার একটা ফ্ল্যাট খালি। আমরা যে যখন আসি তখন উঠি। বাসা বাঁধতে হলে সেইখানেই বাঁধব। নিজের জন্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেব। রাজনীতিতে আর আমার রুচি নেই। তবে আগে থেকে একটা কমিটমেণ্ট আছে। ইংরেজদের সঙ্গে যদি আরো এক দফা লড়তে হয় তবে আমাকেও নামতে হবে।" মিলি এর বেশী ভেঙে বলে না।

"আরো একবার লড়তে হলে কংগ্রেসই লড়বে। আর বাপুজীই সেনাপতি হবেন। আর রণপদ্ধতি হবে অহিংস অর্থাৎ ভায়োলেন্সবর্জিত। আমাদের অহিংস সংগ্রামের কভার নিয়ে তোরা যে তোদের খুশিমতো ভায়োলেণ্ট

কাণ্ডকারখানা করবি তার অবকাশ থাকবে না। তোদের উপর তবু বিশ্বাস রাখা যায়। কিন্তু বাবলীদের উপর রাখতে পারিনে। যদিও বাবলী নিজে আমার প্রিয় বান্ধবী। সে প্রায়ই আসে আমাকে দেখতে। আমার জন্যে এটা ওটা এনে দেয়। মজার কথা ওরা এখন আর সোভিয়েট ইউনিয়নকে পিতৃভূমি বলে না। এই ভারতই ওদের মাতৃভূমি। অথচ ভুলেও একবার 'বন্দে মাতরম্' বলবে না। যাক, 'দেশ' 'দেশ' করতে করতে ওরা সত্যি একদিন দেশকে ভালোবাসবে। তবে ভায়োলেন্স কোনোদিন ভুলবে বলে মনে হয় না। শেষপর্যন্ত ওইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের বিভেদ। বাবলীকে বলেছি, তোকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তোর ভায়োলেন্সকে ভালোবাসিনে। ওঃ কত লোককেই না ওরা কোতল করেছে রাশিয়ায়!" জুলি শিউরে ওঠে।

"ভারতেও করবে, যদি সুযোগ পায়।" মিলির বদ্ধমূল ধারণা।

"তবে একটা বিষয়ে আমি ওদের প্রশংসা না করে পারছিনে। বহু মুসলমানকে ও বহু হিন্দুকে ওরা প্রাণে বাঁচিয়েছে। এটা ঠিক বাপুজীর মনের মতো কাজ। যারা দেশবাসীকে ভালোবাসে তারা দেশকেই ভালোবাসে। আর যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে আমরা তাদের ভালো না বেসে পারি কই?" জুলির যুক্তি এই।

"হ্যাঁ, মানতেই হবে যে ওরা মহৎ কাজ করেছে। ওদের উপর আমার তেমন রাগ নেই যেমন মুসলিম লীগপন্থীদের উপর। সাতশো বছর ভারতে থেকে এইসব বুরবঁ (Bourbon) কিছুই ভোলেনি ও কিছুই শেখেনি। রোমে বাস করতে হলে রোমানদের মতো ব্যবহার করতে হয়। এরা করবে আরবদের মতো বা তুর্কদের মতো ব্যবহার। তার জন্যে রোমের একখণ্ড কেটে নিয়ে তাকে অঙ্গহীন করবে। নামটা পালটে দিলেই নাকি দেশটা বদলে যাবে, নদনদী পাহাড় পর্বত বদলে যাবে, জনগণের স্বভাবচরিত্র বদলে যাবে, আর্থিক অবস্থা বদলে যাবে। ইচ্ছে হয় এদের আচ্ছা করে পিটিয়ে সিধে করতে, কিন্তু ফল হবে চিরস্থায়ী শত্রুতা। সেটা হবে মস্ত বড়ো ভুল। পাপও বটে। তাই আমি দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদে রাজী হচ্ছি। হ্যাঁ, এটাও একটা ভুল। গান্ধীজী হয়তো বলবেন হিমালয়প্রমাণ ভুল। কিন্তু চিরস্থায়ী শত্রুতার চেয়ে ক্ষুদ্রতর ভুল। দু'তিন পুরুষ বাদে ওরাই উপলব্ধি করবে যে এটা সত্যিই হিমালয়প্রমাণ ভুল। তখন স্বেচ্ছায় এটা সংশোধন করবে। আপাতত আমাদের পূর্ববঙ্গের মায়া কাটাতে হবে। পূর্ববঙ্গ থেকে অপসরণ করে

পশ্চিমবঙ্গেই ঘাঁটি গাড়তে হবে। মিলিটারি নেসেসিটি। পূর্ববঙ্গের মাটিতে লড়াই করে আমরা জিততে পারব না। পশ্চিমবাংলার মাটিতে লড়াই করে আমরা হারতে পারব না। কংগ্রেস আর লীগ নেতারা যদি এই সত্য মেনে নিয়ে সন্ধি করেন তো ইংরেজদের রোয়েদাদের দরকার হবে না। নয়তো ওটাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু ইংরেজরা যদি রোয়েদাদের নামে কারচুপি করে তা হলে ওদেরই একদিন কি আমাদেরই একদিন। কলকাতা যদি পাকিস্তানকে দেয় তবে আমাদের মাথায় খুন চড়বে।" মিলির মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। তাকে ভয়ঙ্কর দেখায়।

জুলি কী বলবে ভাষা খুঁজে পায় না। একটু ভেবে নিয়ে বলে, "না, মাথায় খুন চড়বে না। আমরা ঠাণ্ডা মাথায় অ্যাবডিকেট করব। মুসলিম লীগ দেশ চালাবে। দেশের সবটাই। খাজনা আদায় করতে গিয়ে দেখবে হিন্দুর সহযোগিতা পাচ্ছে না। যথেষ্ট খাজনা জোগাবার সামর্থ্য মুসলমানের নেই। অত বড়ো একটা সৈন্যদলও বিনা বেতনে বা বিনা খোরাকে শান্ত থাকবে না। লুটপাট করে দিন গুজরান করবে। পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে তখন মুসলিম লীগও অ্যাবডিকেট করবে। ইংরেজকেই আবার শাসনভার নিতে হবে। যদি ধারে কাছে থাকে। কিন্তু ওরাও ভালো করে বুঝেছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি না করলে ওরাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি মানে দেশভাগ প্রদেশভাগ নয়।" জুলি সৌম্যর কাছে যা শুনেছে।

মিলি দুই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়। "ভগবানের অশেষ করুণা ওই গান্ধীটুপীওয়ালার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। নইলে এইসব গাঁজাখুরি কথা শুনে আমি একদিন ক্ষেপে যেতুম। ক্ষেপে গিয়ে ওর দাড়ি ধরে নাচতুম। ওরে বেবী, আজকের এই হিন্দুরা কি পঁচিশ বছর আগেকার সেই হিন্দু? এরা সাতশো বছর বাদে দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পেয়েছে। সহজে ছাড়বে না, ছাড়তে বাধ্য হলে সিপাইবিদ্রোহের সিগনাল দেবে। হিন্দু আর শিখ সৈন্যরা এখন নেহরুর মুঠোর মধ্যে। মুসলিম সৈন্যদের কতকও তাঁর ভক্ত। সিপাই-বিদ্রোহে যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তবে গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহের হাতের পাঁচ তো থাকবেই। তবে এবার সেটা ঘোরতর ভায়োলেণ্ট হবে। দিল্লী আমরা রাখবই। কলকাতাও জিতে নেব। তবে কতক জায়গা মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিতে হবে। চিরস্থায়ী শত্রুতা কে চায়?"

কখন এক সময় বাবলী এসে মিলির পিছনে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে ওর চোখ টিপে ধরে বলে, "আমি কে ? কে আমি ?"

"তুই বাঁদরী। তুই পোড়ার মুখী। তুই বাবলী।" মিলি হেসে জবাব দেয়।

বাবলী এবার জুলির কাছে গিয়ে ওর পেটে হাত বুলিয়ে দেয়। "নড়ছে চড়ছে। লাথি মারছে। বেশ বড়ো সড়ো হয়েছে। শুধু বুঝতে দিচ্ছে না ছেলে কি মেয়ে।"

মিলিও ইতিমধ্যে পরখ করে দেখেছে। বলে, "ছেলেই হবে। রণের বেলাও এরই মতো আঁচ পাওয়া গেছল।"

জুলির মুখটি হাসিতে ভরে যায়। বলে, "তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

"আমি কিন্তু বাজি রাখছি। এ মেয়ে না হয়ে যায় না। আমি এর মাসী। আমি জানব না তো জানবে কে ?" বাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী।

"আমার মা-ও তাই বলছেন।" জুলি শুকনো মুখে বলে।

"ওঁর চেয়ে আর কে ভালো বোঝে ? উনি তিন মেয়ের মা। জুলি, মেয়ের জন্যে এখন থেকেই জামাকাপড় তৈরি রাখছিস্ তো ? কে জানে কখন এসে পড়ে। সৌম্যদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেব ?" বাবলী সুধায়।

"টেলিগ্রামের চেয়ে ট্রাঙ্ক কল আগে পৌছবে। যুদ্ধের দৌলতে আজকাল ট্রাঙ্ক কল করতে পারা যায়। আমিই কল করব বাবাকে।" মিলি আগ বাড়িয়ে জবাব দেয়।

"ওর ওখানে বিস্তর কাজ। কেন ওকে এখানে এনে বসিয়ে রাখা ? তোরা তো রয়েছিস। ভয়টা আমার কিসের ? মরে যাব ?" জুলির মুখ শুকিয়ে যায়।

"না, না, প্রশ্নই ওঠে না। তুই খুব শক্ত মেয়ে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাবধানের মার নেই।" বাবলী আর মিলি ভাগ করে বলে।

জুলি জানতে চায় নোয়াখালীর মেয়েদের মিলি কার জিম্মা রেখে এসেছে।

"ওরা যে যার ঘরে ফিরে গেছে। ওদের আত্মীয়রাই নিয়ে গেছে। পরে যদি দেখা যায় পোয়াতী টোয়াতী হয়েছে তবে অ্যাবরশন ট্যাবরশন দরকার হবে। তখন প্রসূতীর প্রাণ সংশয় বলে সার্টিফিকেট দিয়ে তার গুরুজনের অনুমতি নিয়ে অপারেশন টপারেশন করা যাবে। সিম্পল কেস।" মিলি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

জুলি চোখ কপালে তোলে। "ইমমরাল হবে না?"

"মরালিটি জিনিসটা রিলেটিভ। যে মেয়ে রেপ ভিকটিম তার বেলা অ্যাবরশন ইমমরাল নয়। এবারকার মহাযুদ্ধে নাৎসী রেপ ভিকটিম শত সহস্র। তাদের বেলা যা ইমমরাল নয় নোয়াখালীর মেয়েদের বেলা তা ইমমরাল হবে কেন? কেনই বা তারা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হবে?" মিলি পাল্টা প্রশ্ন করে।

"হিন্দুসমাজকে আরো উদার হতে হবে। হিন্দুর মেয়ের গর্ভে যারই সন্তান জন্মাক সে সন্তান হিন্দু বলেই গণ্য হবে। যেমন মুসলমানের মেয়ের গর্ভে গোরার সন্তান জন্মিয়ে মুসলমান বলে গণ্য হয়েছে।" জুলি যতদূর জানে।

"সমাজসংস্কার এক লাফে অতদূর এগোবে না, জুলি। হিন্দুসমাজ যে ওই মেয়েদের সীতার মতো আগুনের উপর দিয়ে হাঁটায়নি এটা বড়ো কম বৈপ্লবিক নয়। সমান বৈপ্লবিক কলমা পড়া গোমাংস খাওয়া নারী ও পুরুষদের হিন্দুধর্মে ফেরৎ নেওয়া। তাদের কাউকে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়নি। বরাত ভালো তাদের কারো অঙ্গে সুন্নতের চিহ্ন নেই। হিন্দুদের এমনতর সুবুদ্ধি যদি সাতশো বছর আগে থাকত তবে কি আজ মুসলিম সংখ্যা এত বেশী হতো যে তার জন্যে দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ প্রয়োজন হতো? বলতে ভুলে গেছি, কয়েকটি বিধবা এখনো ফিরে আসেনি, তাদের হদিস নেই। মনে হয় মুসলিম বিয়ে করে তারা সুখী হয়েছে।" মিলি অনুমান করে।

"অল্পবয়সী হিন্দু বিধবারা সারাজীবন বৈধব্য সইতে না পেরে স্বেচ্ছায় বহুক্ষেত্রে মুসলমান বিয়ে করেছে। এটা তো সাতশো বছর ধরে চলে আসছে। এটাও মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।" বাবলীর মন্তব্য।

"এর পরেও যদি হিন্দুসমাজের চোখ না ফোটে তবে আর কবে ফুটবে? যাক, মুসলিম বিয়ে করে যদি ওরা সুখী হয় তবে আমার কোনো খেদ নেই।" ইতি জুলি।

"আমার আছে। ওরা আর ওদের সন্তানসন্ততি শুধু যে মুসলমান হবে তাই নয় আরবী নাম ধারণ করে অভারতীয় বনে যাবে। পাকিস্তান হলে ওদের পরিচয় হবে পাকিস্তানী। অন্য নেশন।" মিলির টিপ্পনী।

"অন্য নেশন বলে স্বীকার না করলেই হয়। আমার অসহায় দশার সুযোগ

নিয়ে তোরা দেশভাগ প্রদেশভাগ প্রচার করছিস, যেন একটা আরেকটার ক্ষতিপূরণ। সমর্থ থাকলে আমি গর্জে উঠতুম। বাংলাদেশকে, বাঙালী জাতিকে একবার তো দু'ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ধোপে টিকল না কেন? কারণ হিন্দু মুসলমান সকলেই উপলব্ধি করেছিল সেটার কুফল বহুদূরপ্রসারী। বহুপুরুষব্যাপী। মুসলমান নেতারাই বলেন যে ধর্মে আমরা পৃথক হলেও হিন্দুদের সঙ্গে মিলে আমরা এক নেশন। সেটাই এখনকার মুসলিম লীগপন্থীদেরও মনোভাব। তাঁরা ভারতভাগ চান, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ চান না। অবশ্য ভারতভাগটাও ভুল। ওদের যত্ন করে বোঝাতে হবে। দীর্ঘ পথ। রাতারাতি পার্টিশনে রাজী হতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে উঠতে দে।" জুলি অনুনয় করে।

বাবলী তাকে মনে করিয়ে দেয় যে তার বর্তমান অবস্থায় উত্তেজনা ভালো নয়। মিলি বলে, "ফেব্রুয়ারিতে তুই খালাস হবি, যদি অকালে ডেলিভারি না হয়। উঠে দাঁড়াতে আরো তিনমাস লাগবে। সিদ্ধান্ত কি ততদিন সবুর করবে? বাঙালী হিন্দু তোর বাপুজীকে একটা স্বল্পমেয়াদী সুযোগ দিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী নয়। অলৌকিক ঘটনা যদি তিনি ঘটান তো এই জানুয়ারিতে বা ফেব্রুয়ারিতেই ঘটাতে হবে। নয়তো প্রদেশভাগের সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কংগ্রেসওয়ালারা কোয়ালিশনের জন্যে হাঁ করে বসে আছেন সাত মাস ধরে। কোয়ালিশন না হলে পার্টিশন তাঁদের ক্ষমতার স্বাদ দেবে। ত্যাগ কি তাঁরা কম করেছেন বিহারীদের চেয়ে? তবে বিহারেই বা কেন চাঁদের হাট, বাংলায় কেন নিষ্প্রদীপ? কংগ্রেসী মহলে অসন্তোষ ঘনাচ্ছে। মহাসভাপন্থীরাও প্রদেশভাগ চান। কোয়ালিশনের আশা একান্ত ক্ষীণ। যে সমস্যা কোয়ালিশন হলেই মিটে যেত সেটা মেটাতে না পেরে বা না চেয়ে জিন্না সাহেব লোকবিনিময় দাবী করছেন। যেন নোয়াখালীর হিন্দু মাইনরিটি বিহারে ও বিহারের মুসলিম মাইনরিটি নোয়াখালীতে স্থানান্তরিত হলেই উভয় পক্ষ কৃতার্থ হবে। ওদিকে গান্ধীজীর নীতি ঠিক বিপরীত। আমাদের নেতারা কি কোনোদিন কোনো বিষয়ে একমত হবেন? পাঁচ বছর সময় দিলেও না। ইংরেজ কি ততকাল পায়চারি করবে? আর আমরাই বা কেন তাদের পায়চারি করতে দেব? আমরা চাই ত্বরিত সিদ্ধান্ত।"

"আমাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় রেখে?" জুলি যুদ্ধং দেহি ভাব দেখায়।

বাবলী তাকে চেপে ধরে। "দেশের কী হবে চিন্তা না করে তোর কী হবে,

তোর খোকার বা খুকুর কী হবে এইটেই চিন্তা কর। তবে আমি নিজে সৈনিক বনে গেছি। বুর্জোয়ারা দেশভাগ প্রদেশভাগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সিভিল ওয়ারকে তারা যমের মতো ডরায়। পাছে আমরাই সেটাকে শ্রেণীযুদ্ধে রূপান্তরিত করি। অবশ্য আমাদেরও ততখানি জোর নেই যে স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লব ঘটাতে পারব। পাঁচ বছর সময় পেলে তো আমাদেরই সুবিধে। কিন্তু ইংরেজরা ততদিন সবুর না করে বুর্জোয়াদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। আমাদের সূত্র থেকে আমরাও খবর পাচ্ছি যে খুব একটা দেরি হবে না।"

॥ বারো ॥

বাংলার লাট সার ফ্রেডারিক বারোজ নাকি মফঃস্বলে গিয়ে মানসকে ও যূথিকাকে ডিনার টেবিলে বসে বলেছেন, "হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব? আমরা চলে যাচ্ছি।" তিনি একথাও নাকি বলেছেন যে আয়ারল্যাণ্ড থেকে চলে যাওয়ার ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে, এদেশেও তাই হবে।

তবে কলকাতা ওঁরা সহজে ছেড়ে যাবেন না, শোনা যাচ্ছে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলো থেকে অপসরণ করলেও মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলোতে আরো কিছুকাল 'বিশ্রাম' করবেন। তাই বিস্তর গোরা সৈন্য আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুলিসেও গোরাদের প্রাচুর্য। ওদের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও ইউরোপীয়দের প্রাণরক্ষা তবু প্রাথমিক দায়িত্ব দাঙ্গা বাধতে না দেওয়া ও বাধলে তৎক্ষণাৎ দমন করা। অলিতে গলিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ অবশ্য অন্য কথা। লড়াই সেখানে আজও বন্ধ হয়নি, কালও বন্ধ হবে না। যতদিন হিন্দুপ্রধান এলাকায় একটিও মুসলমান থাকবে ও মুসলিমপ্রধান এলাকায় একটিও হিন্দু ততদিন এ লড়াই চলতে থাকবে। এই হলো আমাদের 'ওয়ার্কিং মডেল অভ্ স্বরাজ'।

বড়দিনের পর দীপিকাদি হঠাৎ একদিন বলেন, "চল, ফিরে যাই। নিজের বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ীতে ভাড়াটে হয়ে থাকতে কতদিন ভালো লাগে!"

স্বপনদা বলেন, "সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে, রানু। তুমিই তো আমার তারিণী। বন্দুক ধরতে হলে তোমাকেই ধরতে হবে।"

"এবার বন্দুক নয়, স্টেনগান। মেরি কলকত্তা নেহি দুঁগি। ওরা আবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যাক। সেইখানেই নবাবী করুক। আমরা যে ওদের একটা বখরা দিতে চাইনে তা নয়। একটা ন্যায্য রোয়েদাদ হলে আমরাও রাজী। আগেরটার মতো অন্যায্য হলে চলবে না কিন্তু।" দীপিকাদি তা না হলে লড়বেন।

"হ্যাঁ, জনমত ক্রমশ সেইদিকেই ঝুঁকছে। পেছিয়ে রয়েছে শুধু আমার মতো কয়েকজন অবুঝ। বাংলা ভাগ হলে বাঙালী জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। স্টেনগান দিয়ে তুমি ইংরেজ মারবে না, মুসলমান মারবে। আর ওরাও কি ইংরেজ মারবে? না, ওরা হিন্দু মারবে। দু'পক্ষে বাঙালীই মরবে। বাঙালীর সংখ্যাই কমবে। এর নাম যদি ট্র্যাজেডী না হয় তো কার নাম ট্র্যাজেডী? চুম্বকের মতো এ ট্র্যাজেডী প্রত্যেকটি ঘটনাকে টানছে।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

ফিরে যান ওঁরা এল্‌ফকে নিয়ে ওঁদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে। এল্‌ফের কী আনন্দ! হাঁকডাক করে পাড়াশুদ্ধ কুকুরকে জানান দেয় যে সে তার রাজ্যে ফিরেছে। রামদীন বেয়ারা এতদিন দিনমান খৈনী খাচ্ছিল আর সারারাত 'রামা হো' 'রামা হো' বলে তার ভোজপুরী স্বজনদের নিয়ে গলা সাধছিল। পাড়ার হিন্দুদের কত বড়ো ভরসা! তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। তবে তার লাঠিখানায় সে সমানে তেল লাগিয়ে যায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস দাঙ্গা ফের বাধবে। এটা একটা বিরতি।

স্বপনদার ত্বর সয় না, তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে গিয়ে এ বইটার এক পৃষ্ঠা পড়েন তো ও বইটার দেড় পৃষ্ঠা। গোটা দশেক বই নাড়াচাড়া করার পর Michelet প্রণীত ফ্রান্সের ইতিহাস পেড়ে নিয়ে বুঁদ হয়ে যান। গত শতাব্দীতে লেখা ক্লাসিক। এখনো বাসী হয়নি। দীপিকাদি বিস্ময় প্রকাশ করলে বলেন, "আজকের বাংলাদেশকে বুঝতে হলে চারশো বছর আগেকার ফ্রান্সের ইতিহাস গুলে খেতে হবে। ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে যদি শিক্ষা লাভ করি তো আমাদের ভবিষ্যৎ আছে।"

আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বপনদার হাত পায়ের কাঁপুনি ক্রমশ কমে যায়। বিনা চিকিৎসায়। খুশি হয়ে দীপিকাদি একটা পার্টি দেন। স্বপনদার গ্রুপের বন্ধুরা তাঁদের জায়াদের নিয়ে উপস্থিত হন। দুশ্চিন্তা প্রত্যেকের মনে। কিন্তু মুখে হাসি ঠাট্টা। হাতে ড্রিঙ্কস্‌।

একমাত্র মীর সাহেবকে বিমর্ষ দেখা গেল। স্বপনদার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেন, "বিহারী হনুমানরা নোয়াখালীতে কলির রামচন্দ্রের মিশন মাটি করেছে। গান্ধী যে সফল হবেন তার বিন্দুমাত্র আশা নেই। মুসলিম জনমত একেবারে এককাট্টা। আমাকে সবাই বলছে কালো ভেড়া। আমার অপরাধ আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে বিশ্বাস করি। শুনেছেন বোধহয় বিহারী মুসলমানরা তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। বাঙালী মুসলমানরা তাদের আদর করে ঢোকাচ্ছে। খাল কেটে কুমীরকে ঢোকানোর পরিণাম কী হবে তা কি ওরা অনুমান করতে পারছে? আমি মুখ ফুটে বলতে গেলে মার খাব। তাই চুপ করে দেখে যাচ্ছি। লীগওয়ালাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গকেও অমনি করে মুসলিমপ্রধান বানাতে পারলে কেল্লা ফতে। তামাম বাঙ্গালা পাকিস্তানের সামিল হবে।"

"উর্দুভাষীতে বাংলাদেশ ভরে গেলে বাঙালী মুসলমানের স্বকীয়তা কতটুকু থাকবে? না ওরা মুসলমান হয়েই ধন্য হবে, বাঙালী হয়ে নয়?" স্বপনদা বলেন।

"এই প্রশ্নটাই বাঙালী মুসলমানের পক্ষে জীবনমরণ প্রশ্ন। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাতে খুব কম লোককেই দেখছি। পাকিস্তান হওয়া না হওয়াটাই প্রায় সকলের কাছে এখন জীবনমরণ প্রশ্ন। এক অর্থে মুসলমানের কাছে, আরেক অর্থে হিন্দুর কাছে। বাঙালীকে এর আগে আর কোনো প্রশ্নে এমনভাবে বিভক্ত হতে দেখা যায়নি। মুসলমান ভাবছে পাকিস্তান হলেই জীবন, না হলেই মরণ। হিন্দু ভাবছে পাকিস্তান হলেই মরণ, না হলেই জীবন। অথচ এই ইস্যুতে গৃহযুদ্ধে নামতে কারো উৎসাহ নেই। শহীদেরও না, নাজিমেরও না। হক সাহেবেরও না। যদিও তিনি আবার ভোল পালটেছেন। মুসলিম লীগে ভিড়েছেন।" মীর সাহেব দুঃখ করেন।

"নেতা বলতে ওই একজনই ছিলেন, যাঁকে হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিশ্বাস করত। এখন উভয়েই অবিশ্বাস করে। চিত্তরঞ্জনের উপর উভয়ের আস্থা ছিল। তিনিও নেই। তাঁর শিষ্য সুভাষচন্দ্রেরও খোঁজখবর নেই। নেতৃহীন এই দেশ কার দিকে তাকাবে? রবীন্দ্রনাথ থাকলে তাঁর কথার ওজন থাকত। কাজী নজরুল অবশ্য তত বড়ো নন, তবু প্রকৃতিস্থ থাকলে তাঁর কথারও দাম থাকত। আইনের ভাষায় বলতে গেলে আমাদের কেসটা যাচ্ছে বাই ডিফল্ট। দেখবেন আপনি অবাঙালী হিন্দু মুসলমানরাই বাঙালীর

নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবে। ইংরেজের রোয়েদাদে।" স্বপনদা এতদিনে উপলব্ধি করেছেন।

"আপনি কি মনে করেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার কোনো সম্ভাবনা নেই? শহীদ ও শরৎ কিন্তু তা মনে করেন না।" মীর সাহেব বলেন।

"এঁরা যদি একটা কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গড়ে তুলতে পারতেন তা হলে এঁদের স্বপ্ন হয়তো সার্থক হতো। কিন্তু কোয়ালিশনের নামগন্ধ নেই। কেন্দ্রের ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট যদি কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট না হয় তো বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেণ্টগুলো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে না। আর কংগ্রেস গভর্নমেণ্টগুলো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট না হলে লীগ গভর্নমেণ্ট-গুলোও কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে না। কেন্দ্রের ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টের অবস্থা এখন টলটলায়মান। যে কোনো দিন ভেঙে পড়তে পারে। বড়লাটকেই সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে হবে। যতদিন পারেন চালাবেন। না পারলে কংগ্রেসের হাতে একাংশ, লীগের হাতে একাংশ, শিখদের হাতে একাংশ ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়বেন। তার পর হয় গৃহযুদ্ধ, নয় দেশ ভাগাভাগি ও প্রদেশ ভাগাভাগি। হ্যাঁ, হিন্দুদের মেজাজ যা দেখছি তারা প্রদেশ ভাগাভাগি চাইবে ও তার জন্যেই দরকার হলে লড়বে।" স্বপনদা দীপিকাদির মেজাজ বুঝে বলেন।

মীর সাহেব ম্লান মুখে বলেন, "তা হলে কি আমাকেও পাকিস্তানে যেতে হবে? জিন্না সাহেব লোকবিনিময় দাবী করছেন।"

"জিন্না সাহেব অবশ্যই পাকিস্তানে যাবেন। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কেন যাবেন? ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা কেন যাবেন? ইউনিয়নিস্ট মুসলমানরা কেন যাবেন? লীগপন্থীরা ইউরোপের লোকবিনিময়ের ইতিহাস পড়েননি। আমি মিশ্‌লের ফরাসী দেশের ইতিহাস পড়ছি। লোকবিনিময় ভদ্রভাবে হয় না। ক্যাথলিকরা প্রটেস্টাণ্টদের পিটিয়ে তাড়ায়, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। প্রটেস্টাণ্টরাও বদলা নেয়। শিলারের ত্রিশ বছরের যুদ্ধের ইতিহাস পড়লে দেখবেন জার্মানরা অতটা নির্মম হয়নি। তাদের নিয়ম ছিল রাজা প্রটেস্টাণ্ট হলে প্রজারাও প্রটেস্টাণ্ট হবে। রাজা ক্যাথলিক হলে প্রজারাও ক্যাথলিক হবে। যাদের তাতে আপত্তি তারা স্বেচ্ছায় রাজ্য-ত্যাগ করবে। পাকিস্তানের হিন্দুরা মার খেয়ে বা মারের ভয়ে পালিয়ে আসতে পারে। মুসলমান হয়ে মারধর এড়াতেও পারে। মুসলমান হতে

বাধ্য না হলেও স্বেচ্ছায় দেশান্তরী হতে পারে। তবে এপারে আমরা মধ্যযুগের ফরাসী বা জার্মানদের মতো আচরণ করব না। আমাদের রাষ্ট্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী সকলেই সমান নাগরিক অধিকার পাবে। যেমন পরবর্তী যুগের ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্মানীতে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম একটা নতুন যুগের প্রবর্তন। মুসলিম সেপারেটিজম একটা পুরাতন যুগের পুনরাবর্তন। তার আদর্শ মধ্যযুগীয় তথা মধ্যপ্রাচ্য। ভারতের মাটিতে আর একটা আফগানিস্থান কি তুর্কিস্থান প্রতিষ্ঠাই তার অভিষ্ট। আমরা এতে সায় দিতেও পারিনে, বাধা দিতেও পারিনে। আমরা এটা গ্রহণও করব না, বর্জনও করব না। ইংরেজরা নতুন এক রোয়েদাদ হিসেবে এই বস্তুটিই দুই পক্ষের সামনে রাখবে। নইলে যেটা করবে সেটা আরো খারাপ। বলকানীকরণ।" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

মীর সাহেব চিন্তাকুল ভাবে বলেন, "সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কংগ্রেস লীগ চুক্তি, যেমনটি হয়েছিল লখনউতে ১৯১৬ সালে। এই জিন্না সাহেবই ছিলেন তার একজন উদ্যোক্তা। অপরজন বাল গঙ্গাধর টিলক। টিলক মহারাজ নেই, গান্ধী মহারাজ রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন না।"

"তিনিও পারবেন না। একে তো হিংসার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে, তার উপর হিন্দু মুসলিম দ্বৈরাজ্যবাদের কাছে। অথবা হিন্দু মুসলিম দুই রাজ্যবাদের কাছে। মুসলিম লীগ আর মাইনরিটির প্রতিনিধি নয়। সেও অপর এক মেজরিটির প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিতে চায়। দেশ ভাগ করলে সত্যিই সে এক মেজরিটির প্রতিনিধি। কিন্তু সেক্ষেত্রে গান্ধীজীর কোনো ভূমিকা থাকে না। কারণ তিনি অবিভক্ত ভারতের হয়ে আটাশ বছর ধরে সংগ্রাম করে এসেছেন। আবার করতে পারেন। গান্ধী জিন্নাকে বন্ধনীভুক্ত করা যায় না, এটা আপনিও মানবেন, মীর সাহেব। সেইজন্যে তিনি দূরে সরে গেছেন। এখন মোকাবিলা জিন্নাতে জবাহরলালে। মিস্টার অ্যাটলী এঁদের দু'জনের সঙ্গেই কথাবার্তা চালাচ্ছেন। বড়লাটও তাই করছেন। শেষপর্যন্ত যদি একটা চুক্তি হয় তবে সেটা হবে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। তা না হলে সিভিল ওয়ার। তারই মাঝখানে ব্রিটিশ অপসরণ।" স্বপনদা কম্পিত কণ্ঠে বলেন।

"না, না, সিভিল ওয়ার নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে। তবু কোনো

সমাধান হবে না। হিন্দুরা জিততে পারে, কিন্তু মুসলমানরা বশ্যতা স্বীকার করবে না। প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করবে। তৃতীয় পক্ষকে ডেকে আনবে। সোভিয়েত রাশিয়াই যে সেই তৃতীয় পক্ষ হবে না তা কে বলতে পারে? খোদা না করুন।" মীর সাহেব মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করেন।

স্বপনদা বলেন, "এটা একটা ওয়ার অভ্ সাকসেসন। একদিন না একদিন দুই পক্ষের মধ্যে সীজ-ফায়ার হবে। সেই সীজ-ফায়ার লাইনটাই হবে ইণ্টারন্যাশনাল বাউণ্ডারি। ইংরেজরা স্বীকৃতি দিলে আর সবাই স্বীকৃতি দেবে। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি কলকাতা হিন্দুস্থানের দখলে থাকবেই। তবে মুর্শিদাবাদ হয়তো থাকবে না। আমার মামার বাড়ী পড়বে লাইনের ওপারে। মোগল আমলের সঙ্গে ওঁরাই আমার লিঙ্ক। লিঙ্ক কেটে যাবে। অনুমান করতেই পারছেন আমি কতখানি উদ্বিগ্ন।"

"মুর্শিদাবাদ আপনার মামার বাড়ী। পাবনা আমার যে পৈত্রিক ভদ্রাসন। আপনার মোগল আমলের সঙ্গে লিঙ্ক। আমার যে সুলতানী আমলের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। আমার বেদনা আপনি বুঝবেন না, গুপ্ত সাহেব। আমার এক পা আমাকে পূব বাংলায় টানছে। আরেক পা পশ্চিমবাংলা ছাড়তে নারাজ। আমি কলকাতায় পড়াশুনা করে, ব্যারিস্টারি করে ক্যালকেশিয়ান বনে গেছি। বাড়ীও করেছি। আরো বাড়ী কিনছি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বাড়ী। ওরা এদেশ থেকে আস্তানা গুটিয়ে নিচ্ছে। ওদের কাছ থেকে কিনে আমি পরে ভাড়া দেব। প্র্যাকটিসের আয়ে ঘাটতি পড়লে ভাড়া থেকে পুষিয়ে নেব।" মীর সাহেব কানে কানে বলেন।

স্বপনদা হেসে বলেন, "পাকা বুর্জোয়া।"

ওদিকে দীপিকাদি গল্প করছেন টুকটুকের সঙ্গে। একটু আড়ালে। হাতে ফ্রুট জুস।

"তোর হস্‌পিসের হালচাল কী, টুকলি?" দীপিকাদি সুধান।

"আমি আর চালাতে পারছিনে, দিদি। অর্থাভাবে নয়। অর্থ একটা প্রশ্নই নয়। প্রত্যেকটি মেয়ে চায় বর আর ঘর। ওদের কাছে এটা একটা ওয়েটিং রুম! আমরা ওদের পড়িয়ে শুনিয়ে কাজকর্ম শিখিয়ে লায়েক করে দিতে চাইলে কী হবে, ওদের মন অন্য জায়গায়। বিয়ে। বিয়ে ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবতে পারে না। তার জন্যে হিন্দুর মেয়ে মুসলমান হতে রাজী, মুসলমানের মেয়ে খ্রীস্টান হতে রাজী। ধর্ম একটা প্রশ্নই নয়। আজকের এই

ধর্ম নিয়ে হানাহানি কাটাকাটির মরুপ্রান্তরে আমার হস্‌পিস যেন একটা ওয়েসিস। কিন্তু এদের বিয়ের পাত্র আমি পাই কোথায়? যারা আসে তাদের মতলব ভালো নয়।" টুকটুক ভেঙে বলে না।

"মীর সাহেবকে তোর সমস্যাটা জানিয়েছিস্?" দীপিকাদি জিজ্ঞাসা করেন।

"জানিয়েছি বইকি। তিনি যা বলেন তা শুনে আমি চিন্তির। বলেন, এ মেয়েরা পুরুষের স্বাদ পেয়েছে। এরা সে স্বাদ বেশীদিন ভুলে থাকবে না। সেইজন্যে এরা বিয়ের কথা ভাবছে। এদের যেমন করে হোক বিয়ে দিতে হবে। অবশ্য অন্যপূর্বার সঙ্গে বিবাহে পাত্রের সম্মতি নিয়ে। তা না হলে হিন্দুর মেয়েরা ফিরে যাবে হারেমে আর মুসলমানের মেয়েরা মাসীর বাড়ী। সেটা হবে আমাদের পক্ষে পরাজয়। আমরা কেন পরাজয় মেনে নেব? 'আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমা'র সঙ্গে কথাবার্তা চালাও। ওঁরাই নিন এই মেয়েদের ভার। খ্রীস্টান সমাজেই বিয়ে দিন। যদি সৎপাত্র জোটে। সিস্টাররা আসাযাওয়াও করছেন। কিন্তু সেটাও হবে আমার পক্ষে পরাজয়। সবচেয়ে ভালো হতো যদি এই মেয়েদের গুরুজনরা এদের ঘরে ফিরিয়ে নিতেন। যাদের সন্তানসম্ভাবনা হয়নি ও হবে-না তেমন মেয়েদের কারো কারো ফিরে যাওয়ার আশা আছে। তিনটি কিছুদিন পরে ছ'টি হবে। তাদের কী আশা? আমি কি তাদের নিয়েই দায়গ্রস্ত হব, না সিস্টারদের হাতে তাদের সঁপে দেব? আমার নাচ গান শিকেয় তোলা রয়েছে। আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি।" টুকটুক দুঃখ করে।

"আমি তো দেখছি তুই আরো নবীন হয়েছিস্। আরো আকর্ষণীয়। বিয়ের কনের মতো দেখতে। বর আসবে এখুনি। নিয়ে যাবে তখুনি। না, তোকে এ দায় চিরদিন বইতে হবে না। দেশের নানান জায়গায় নানান প্রতিষ্ঠান আছে। চাঁদার বিনিময়ে তারা এ দায় নেবে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মিশ্র প্রতিষ্ঠান আর একটাও নেই। আওয়ার লেডীকেও মিশ্র প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। আমরা যে নেশন গড়তে চাই তার আদল হচ্ছে তোর হস্‌পিস। বাচ্চা হলে তাদের সব ক'টাকেই আমরা ভারতীয় হিসাবে মানুষ করব, হিন্দু হিসাবে বা মুসলমান হিসাবে নয়। কেনই বা ওরা খ্রীস্টান হিসাবে মানুষ হবে? অবশ্য সাবালক হয়ে স্বেচ্ছায় খ্রীস্টান হতে পারে। তিনটে সমাজই তুই ভিতর থেকে দেখেছিস্। হিন্দু আর মুসলিম আর খ্রীস্টান।

তোর চেয়ে অভিজ্ঞ আর কে আছে যে এ দায় বহন করতে পারে? তবে এটাও আমি বলব না যে এর জন্যে তোর বিয়ের বিঘ্ন হোক বা তোর নাচগানের ক্ষতি হোক। তোর নিজের জীবনটাকেও নতুন করে গড়ে তোলার দায় আছে।" দীপিকাদি সহানুভূতিভরে বলেন।

"না, না, বিয়ে আর নয়। তেমন পুরুষ কেউ নেই যার সঙ্গে জোড় মিলবে। আমার মা বাবার ইচ্ছাও নয় যে আমি আবার চোখ বুঝে ঝাঁপ দিই। নাচ গানের বেলা তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু কলকাতায় থেকে তাঁদের বুড়ো বয়সে দেখাশুনা করতে হবে। যাক, পরে তোর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব। তোরা যে এ পাড়ায় ফিরেছিস্ এইটেই সৌভাগ্য। আসিস্ আমাদের ওখানে। হস্‌পিসে তো অবিলম্বে।" টুকটুক আমন্ত্রণ করে।

এমন সময় কফির পেয়ালা হাতে বাবলী এসে যোগ দেয়। "তোমরা দুই সখীতে মিলে কিসের চক্রান্ত করছ?"

"বিপ্লবের। সত্যি বলছি। এটাও একজাতের বিপ্লব। এইসব অপহৃতা নারীদের বিবাহ বা পুনর্বিবাহ। দোষ তো এদের নয়। কেন এরা সারা জীবনের জন্যে সাজা পাবে? আমরা এদের বিয়ে দিতে চাই। কিন্তু বহু বাধা। তোমরা এ ভার নেবে?" দীপিকাদি প্রস্তাব করেন।

"এটা একটা সমস্যাই নয়, বৌদি। নিম্নতর বর্ণে বা নিম্নতর শ্রেণীতে বিয়ে করতে রাজী হলে পাত্রের অভাব হবে না। অবশ্য একটু আধটু মিথ্যা বলতে হবে। পাত্রপক্ষও বলে। সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্বর্ণের অনুপান থাকলে কার্যসিদ্ধি সুগম হয়। আর যদি সমান বর্ণে বা সমান শ্রেণীতে বিয়ে দিতে হয় ভয় তবে পণযৌতুক ডবল করতে হবে। 'অপহৃতা' এই তথ্যটা বেমালুম চেপে যেতে হবে।" বাবলী পরামর্শ দেয়।

"এটা তো ঠিক কমিউনিস্টের মতো কথা হলো না, বাবলী। পাবলিকের টাকায় আমাদের হস্‌পিস চলছে। সে টাকা কি আমরা এইভাবে অপচয় করতে পারি? মিথ্যার আশ্রয় একেবারেই নেওয়া হবে না।" দীপিকাদি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন।

"তা হলে ওদের বিয়ে না দিয়ে আমাদের হাতে তুলে দাও। আমরা ওদের সব সময়ের কর্মী করব। মাসোহারা দেব। বিপ্লবের পরে ওদের বিয়ে হবে। বুর্জোয়ারাই লুফে নেবে।" বাবলী বাঁকা হাসি হাসে।

"যৌবনের ধর্ম বলে একটা কথা আছে। কখন কী করে বসে তার

দায়িত্ব কি তোমরা নেবে? না আমাদের উপরেই চাপাবে?" দীপিকাদি জেরা করেন।

"এর উত্তর আমি দেব না। তোমরা বুর্জোয়ারা কি জানো না কেমন করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হয়? নিত্য নূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছ, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিত্য নূতন জন্মনিবারকও উদ্ভাবন করছ। আর নারীহরণের কথা যদি উঠল তবে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের বিবাহপ্রথাটাই বা একপ্রকার নারীহরণ ছাড়া আর কী? বর এসে কনেকে ধরে নিয়ে যায় ওর সম্মতির বয়সের আগেই, কিংবা ওর নিজের সম্মতি না নিয়েই। সবই তো বেচাকেনার ব্যাপার। ম্যারেজ মার্কেট।" বাবলী টিটকারী দেয়।

টুকটুক এতক্ষণ নীরব ছিল। বলে, "আচ্ছা, বাবলীদি, আমি যদি হতাশ হয়ে হিন্দুর মেয়েদের আবার হারেমে পাঠিয়ে দিই ও মুসলিম মেয়েদের আবার মাসীর বাড়ী ফেরৎ দিই তা হলে কি সেটা ভালো হবে? আমার কাছে মাসীর বাড়ী থেকে কুটনী আসছে আর হারেম থেকে খোজা। ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি হলে কী করতে? ওদের হাতেই মেয়েগুলোকে তুলে দিতে?"

বাবলী জবাব দিতে পারে না। দীপিকাদির দিকে তাকায়।

"তুমি, আমি, টুকটুক সব আগে নারী। তার পরে কমিউনিস্ট বা বুর্জোয়া বা আর কিছু। নারীর এই বিপদে আমরা সবাই এককাট্টা। এই মেয়েরা যদি আত্মনির্ভর হতো তা হলে আমাদের ভাবনার কারণ থাকত না, কিন্তু সে শিক্ষা এদের নেই, সেদিকে মনোযোগও নেই। বাঙালীর মেয়ের একমাত্র লক্ষ্য বিয়ে। বিয়ের পর স্বামী ও সংসার। এরা সর্বক্ষণ বিয়ের চিন্তাই করছে। কারো কারো বিয়ে হয়েও গেছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবার মুখ নেই। নতুন করে বিয়ে দিতে হবে। নইলে বিপথে যাবে। এরা কেউ তোমার সহকর্মী হবে না, বাবলী। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো। যদি কাউকে তোমার পছন্দ হয় তুমি তার কাছে প্রস্তাব করতে পারো। সে যদি রাজী হয় তবে আমরা কমিটিকে বলে রাজী করাব।" দীপিকাদি বলেন।

"দেখি আমার কমরেডরা কী বলেন। আমার একার মত অনুসারে তো কাজ হবে না। দলভুক্ত হওয়ার এই এক অসুবিধে।" বাবলী কবুল করে।

টুকটুক হুঁশিয়ারি দেয়, "আমি থাকতে এরা হারেমে বা মাসীর বাড়ী

যাবে না, কিন্তু ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের কনভেন্টে যেতে পারে। মীর সাহেবেরও সেই মত।"

"তাতে কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম সমাজে বিপ্লব আসবে না, টুকটুক। আমি চাই হিন্দু সমাজ মুসলিম সমাজ এই মেয়েদের সসম্মানে ঘরে ফিরিয়ে নিক। বা ঘর সংসার দিক। এ রকম কেস তো নোয়াখালীতে, বিহারে ও অন্যান্য স্থানেও হয়েছে। অবলারাই হয়েছে গুণ্ডাদের সহজ শিকার। আমাদের এই মেয়েরা টেস্ট কেস।" দীপিকাদি বলেন।

"বৌদি, ওসব হলো সমাজসংস্কারের ব্যাপার, সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপার নয়। সমাজসংস্কার অপেক্ষা করতে পারে, সামাজিক ন্যায় তা পারে না।" বাবলীর মতে।

"নারীর লজ্জা যাদের বুকে বাজে না তাদের মুখে সামাজিক ন্যায়ের খই ফোটে। কিন্তু সমাজের অর্ধেকই তো নারী। নারী যদি একবাক্যে বলে আর গর্ভধারণ করবে না তা হলে সেইদিনই সমাজের বাকী অর্ধেকেরও শেষ।" বৌদি মনে করিয়ে দেন।

"ভালো কথা," বাবলীর মনে পড়ে যায়. "স্বপনদা কি জানেন যে তাঁর ক্যারামেল এখন নার্সিং হোমে? সৌম্যদাকে ট্রাঙ্ক কল করা হয়েছে।"

"তাই নাকি?" বৌদি লাফিয়ে ওঠেন। "দ্যাট ইডিয়ট সৌম্য। এমন সময় কেউ পদ্মার ওপারে থেকে আশ্রম চালায়? আসতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে। চল, আমরা দেখে আসি।"

"ওর ক্যাবিনে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, বৌদি।" বাবলী জানায়।

"তা হলে তো অবস্থা সঙীন। কী করা যায়, বল তো? বাড়ীর পার্টি ছেড়ে কোথাও যাওয়াটাও মানায় না। আমিই যখন হস্টেস।" বৌদি ছটফট করেন। খবরটা স্বপনদাকে শোনাবেন কি না চিন্তা করেন।

টুকটুক বলে, "এইজন্যেই আমি মা হতে চাইনি। সেইজন্যেই বেঁচে আছি।"

বৌদি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে টেলিফোন করতে যান। কিছুক্ষণ পরে উদ্ভাসিত বদনে ফিরে আসেন। "গেস, বয় অর গার্ল।"

"গার্ল।" বাবলীর অনুমান। "বয়।" টুকটুকের অনুমান।

"বোথ।" বৌদি হেসে লুটিয়ে পড়েন।

নিজের বাড়ীতে নিজের স্টাডিতে বসে স্বপনদা দেশকাল ভুলে মিশ্‌লের ফরাসী ইতিহাসে ডুবে রয়েছেন, হঠাৎ একদিন সুকুমার এসে হাজির হয়। টেবিলের উপর একটি বোতল রেখে বলে, "বর্দো। আপনার সমবয়সী।"

"অ্যা! বল কী হে, বর্দো! তুমি কেমন করে জানলে যে মঁতেন আমার প্রিয় লেখক আর তাঁর প্রবন্ধ আমার প্রিয় পাঠ্য? তাঁর যুগটাও এমনি এক বিশৃঙ্খলার যুগ ছিল। অনেক ধন্যবাদ। আমিও তোমাকে খালি হাতে ফিরতে দেব না, সুকুমার। তোমাকে তো করে খেতে হয়। মাশুলও দিয়েছ নিশ্চয়।" স্বপনদা মূল্য দিতে চান।

"মাফ করবেন, স্বপনদা। ওটা নিছক উপহার। তবে আপনার মূল্যবান পরামর্শ পেলে আমি কৃতার্থ হব। এসব ঘরোয়া ব্যাপার আর কোনো ব্যারিস্টারের কাছে ভাঙতে যাব না। আপনি বলতে গেলে আমাদের আপনার লোক।" সুকুমার গদগদ স্বরে বলে।

বইখানা সরিয়ে রেখে স্বপনদা ঘুরে বসেন। "ব্যাপার কী, সুকুমার?"

"সীরিয়াস। দেশ ভেঙে যেতে বসেছে, সেটা তো সকলের ভাবনা। বিশেষ করে আমার নয়। কিন্তু আমার যে ঘর ভেঙে যেতে বসেছে। সেই ভাবনায় আমি পাগল। আমার ছেলের কী হবে, স্বপনদা?" সুকুমার কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে।

"আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে, ভাই। খুলে বল। ডাক্তারকে আর ব্যারিস্টারকে সব কিছু খুলে বলতে হয়। অ্যাডাল্টারি?" তিনি গলা খাটো করেন।

"না, না। মিলি সে রকম মেয়ে নয়। আর আমি যদিও শুকদেব নই তবু বিয়ের পর থেকে একনিষ্ঠ পতি।" সুকুমার উত্তর দেয়।

"তা হলে ডিভোর্স চাও না। আর কী চাও?" স্বপনদা সুধান।

"চাই আমার ছেলেকে। আমার একমাত্র সন্তানকে। মিলি স্থির করেছে এখন থেকে তার বুড়ো বাপ মার দেখাশুনা করবে। তাঁদের নিয়ে লণ্ডনে চলে আসুক। বাড়ী মজুত। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস চালু হলে ওঁরা বিনা খরচে চিকিৎসা পাবেন, ওষুধপত্র পাবেন। একটা রেভোলিউশনারি স্টেপ। আমরাই নিচ্ছি, আমরা লেবার পার্টির লোক। শ্বশুরঠাকুর রাজী, কিন্তু শাশুড়ীঠাকুরানী নারাজ। ওদেশে গঙ্গা নেই। কাশী নেই। তাই মরেও শান্তি নেই। তাঁর মেয়ে এই সব কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

মা থাকবেন গঙ্গাতীরে, সুতরাং সেও থাকবে কলকাতায়। ছেলেটাকে দিচ্ছে শান্তিনিকেতনে। সেখানে পড়ে ওর ভবিষ্যৎ কী? ওদিকে লণ্ডনের সেণ্ট পলস স্কুলে ওর জন্যে সীট রাখতে আমি গলদ্‌ঘর্ম। নেহাৎ ব্রিটিশ বর্ন বলেই সে এই দুর্লভ সুবিধা পাবে। আমার প্ল্যান ওকে যথাকালে অক্সফোর্ড কি কেমব্রিজে দেওয়া। নেহরু বলো, সুভাষ বলো, সুহরাবর্দী বলো, নাজিমউদ্দীন বলো, কে না অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে পড়েছেন? মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ, তিনিও কেমব্রিজের ছাত্র। মিলি নিজের জীবন নিয়ে যা খুশি করুক, কিন্তু রণের জীবন নিয়ে এ ছেলেখেলা কেন? আমার জীবনটা যে ব্যর্থ সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কলকাতায় আমাকে কেউ চাকরি দেবে না। লীগ তো নয়ই, কংগ্রেসও না। দিল্লীতেও আমার তেমন 'পুল' নেই। একমাত্র কৃষ্ণ মেনন। শুনছি তাঁকে লণ্ডনেই রাখতে চান নেহরু। পাটেল যদিও বিমুখ। মেননের অপরাধ তিনি বামপন্থী। অথচ লেবারের সঙ্গে কংগ্রেসের তিনিই তো যোগসূত্র। যতদূর দেখছি আমাকে মেননের প্রসাদে লণ্ডনেই চাকরি করতে হবে। দিল্লী দূর অস্ত্‌।" সুকুমার হাত কচলাতে থাকে।

"তার মানে ডিভোর্স নয়, সেপারেশন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে নেয় ছেলে কার কাছে কত বয়স অবধি থাকবে। কোর্টে মাকে অগ্রাধিকার দেয়, কিন্তু বরাবরের জন্যে নয়। বলা বাহুল্য, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। এমনও তো হতে পারে যে ছেলে মায়ের কাছে থাকলে মূর্খ হবে, বাপের কাছে থাকলে পণ্ডিত হবে। ছেলের যাতে মঙ্গল হয় কোর্ট সেটাই বিবেচনা করবেন। তোমারও বিবেচনা করা উচিত তুমি ওকে ওর মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে ওর মায়ের অভাব পূরণ করবে কী করে। তা ছাড়া তুমি পুরুষমানুষ। নারী যে আর কখনো তোমার জীবনে আসবে না তা নয়। ডিভোর্স হচ্ছে সেপারেশন থেকে এক পদক্ষেপ দূরে। তুমি চলে এস, সুকুমার। এই কলকাতা শহরেই তোমার একটা হিল্লে হতে পারে।" স্বপনদা আশা দেন।

"ভাবছি। বিলেতের কয়েকটা পত্রিকার স্পেশাল রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে দিল্লীতে থাকা যায় ও কলকাতায় ঘোরা যায়। বিশেষত এই যুগসন্ধির সময়। একরাশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই এক বছর কি দেড় বছরের মধ্যে। অ্যাটলীর ঘোষণা শুনেছ নিশ্চয়। ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের

আগেই ভারত ত্যাগ করবে। ভারতীয়রা একমত হলে এক কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। নয়তো একাধিকের হাতে। তার মানে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে পারে, বাঙালীরা যদি একমত হয়। নয়তো পার্টিশন ভারতেরও, বাংলাদেশেরও। সিভিল ওয়ার কোনো পক্ষ চায় না, কিন্তু আপনা আপনি বেধে যেতে পারে, ইতিহাসে তার বহু নজীর রয়েছে। তবে লেবার গভর্নমেণ্টের ভিতরের খবর ইণ্ডিয়াতেও একপ্রকার আইরিশ সেটলমেণ্ট সম্ভবপর। সেখানে যেমন আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের জন্যে আইরিশ ফ্রী স্টেট আর ইউনিয়নিস্টদের জন্যে নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড, এখানেও তেমনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের জন্যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন আর মুসলিম সেপারেটিস্টদের জন্যে পাকিস্তান। মনে আছে বোধহয় যে আলস্টার পুরোপুরি কোনো পক্ষ পায়নি। তেমনি, বাংলাদেশও পুরোপুরি কোনো পক্ষ পাবে না। কলকাতা হয়তো ফ্রী সিটি হবে। কিংবা জয়েণ্ট সিটি। দেশ বিভক্ত হলেও, প্রদেশ বিভক্ত হলেও, কলকাতা অবিভক্ত থাকবে। কলকাতা নিয়ে সিভিল ওয়ার কেন বাধবে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবে তার জন্যে তৈরি থাকাই সমীচীন।" সুকুমার এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"হঠাৎ স্রোতের মাঝখানে ঘোড়াবদল হলো কেন? ওয়েভেল কেন যাবেন, মাউণ্টব্যাটেন কেন আসবেন? মাত্র কয়েক মাসের তো রাজত্ব।" স্বপনদা জানতে চান।

"ওয়েভেল থাকলে কংগ্রেস নাও থাকতে পারে। সম্পর্কটা অনেকটা মিলির সঙ্গে আমার মতো। কংগ্রেস যা বলে ওয়েভেল তা শোনেন না। ওয়েভেল যা বলেন কংগ্রেস তা শোনে না। লেবার গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে সেপারেশন পছন্দ করেন না। আমাদের মাঝখানে তৃতীয় কোনো নারী বা পুরুষ নেই। লেবার ও কংগ্রেসের মাঝখানে মুসলিম লীগ রয়েছে। লেবার লীগকেও হাতছাড়া করতে চায় না। করলে বার্গেনিং পাওয়ায় কমে যাবে। দু'কূল বজায় রাখার জন্যে মাউণ্টব্যাটেনকে পাঠানো হবে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মেয়ের ঘরের নাতির ছেলে বলে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি। ব্যক্তিগত চার্মও প্রচুর। কংগ্রেসকে তিনি এক পকেটে ও লীগকে আরেক পকেটে পুরবেন। শিখদের নিয়েই সংশয়। তার চেয়েও বেশী গান্ধীজীকে নিয়ে। ওই বৃদ্ধকে পকেটস্থ করা কারো সাধ্য নয়। মাউণ্টব্যাটেন যদি সফল

হন তবে অসাধ্যসাধন করবেন।" সুকুমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে দোলায়িত।

স্বপনদা সুকুমারকে অভয় দেন। "তোমাদের দু'জনের মাঝখানে যখন কেউ নেই তখন সব ঠিক হয়ে যাবে, সুকুমার। রণ আপাতত ওর মায়ের জিম্মাই থাকুক। পরে দেখা যাবে কোথায় থাকে। তুমিও চেষ্টা করো দিল্লীতে চলে আসতে। তোমার মতো লেবারের ঘরের মাসী আর কংগ্রেসের ঘরের পিসীর জন্যে ঠাঁই না থাকে তো কার জন্যে আছে? মাউণ্টব্যাটেনের দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়তে পারলে আরো ভালো হয়। আমরা ভিতরের খবর আরো বেশী পাব। চীয়ারিও।" স্বপনদা বর্দোর গ্লাস তুলে মুখে ছোঁয়ান।

"চীয়ারিও।" সুকুমার তাই করে।

॥ তেরো ॥

চাঙ্গা হয়ে স্বপনদা জমিয়ে বসেন। "এখন বলো প্যারিসে আর কী দেখলে? কেমন আছে প্যারিস? যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত?"

"একেবারেই না। বোঝাই যায় না যে ওর ওপর দিয়ে একটা মহাযুদ্ধের পাঁচ বছর গেছে। ও তেমনি সুন্দরী, তেমনি চিরযৌবনা। কিন্তু এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় প্যারিসের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতিকে। হিটলার তো আদেশ দিয়েছিলেন, প্যারিস ত্যাগের আগে তাকে পুড়িয়ে খাক করে দাও। Von Choltitz কিন্তু সে আদেশ আদেশ অমান্য করেন। প্যারিস যে মানব সভ্যতার হৃৎপিণ্ড। তাকে কি প্রাণ ধরে ধ্বংস করা যায়! নইলে সে যা হতো তা আর একটি বার্লিন। অপূরণীয় ক্ষতি।" সুকুমার যতদূর জানে।

স্বপনদা প্রায় কেঁদে ফেলেন। ধরা গলায় বলেন, "মানুষ আছে! মানুষ আছে! মানবজাতির আশা আছে! আশা আছে! হিউমানিজম লোপ পায়নি।"

"তার পর, বার্লিনের কী হাল? ঘুরে এসেছ আশা করি।" স্বপনদা উৎসুক।

"বার্লিন এখন এক ধ্বংসস্তূপ। চ্যান্সেলারি একেবারে সমভূম। ওখানে

ছিটলার থাকত একটা বাঙ্কারে। মাটির তলায়। এ যেন সাপ মারতে গিয়ে বাস্তু ভেঙে ফেলা।" সুকুমার তুলনা করে।

"নিয়তি! নিয়তি!" স্বপনদার বাগ্‌রোধ হয়। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, শুনছি বার্লিন নাকি ভাগাভাগি হবে। লাইন টানা হবে কোথায়?"

"শুনছি ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট বরাবর।" সুকুমার উত্তর দেয়।

"তা হলে উন্টার ডেন লিণ্ডেন পড়বে কাদের ভাগে? পূব দিকে যখন তখন রুশ ভাগে নয় তো?" স্বপনদা ভয় করেন।

"যা বলেছেন। আমাকে তো ঢুকতেই দিত না। আমার যে ব্রিটিশ পাশপোর্ট। খুলে দেখাই আমার জন্ম ইণ্ডিয়ায়। চার দিক কড়া পাহারা। কিছুই উপভোগ করা যায় না। কে বলবে যে এ সেই বার্লিন!" সুকুমারের খেদ।

"তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করছি কেন, জানো?" স্বপনদা চমক দেন।

"না তো। কী করে জানব?" সুকুমার ঘাবড়ে যায়।

স্বপনদা কাঁপা গলায় বলেন, "কলকাতারও সেই দশা হতে পারে। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে জেলা ভাগ, শহর ভাগ। ভাগাভাগির কোথায় দাঁড়ি টানবে? দিল্লী আর কলকাতা এই দুটো শহরেরই বিপদ। সিভিল ওয়ারের উপর ছেড়ে দিলেও বিপদ, অ্যাওয়ার্ডের উপর ছেড়ে দিলেও বিপদ। কী করে আমি বিশ্বাস করব যে ইংরেজরা বাংলাদেশের একাংশ হিন্দুদের দিতে গিয়ে কলকাতার একাংশ মুসলমানেদের দিয়ে যাবে না? আমার তো আশঙ্কা শিয়ালদা বরাবর লাইন টানা হবে। মূল শহরটা পড়বে হিন্দুদের ভাগে, পূব দিকের বস্তিগুলো মুসলমানদের ভাগে। বরাবর আমি প্রদেশভাগের বিপক্ষেই ছিলুম। তোমার বৌদির সঙ্গে মতভেদ ছিল। ষোলই আগস্টের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর নির্বাসিত হয়ে আমার মন ভেঙে গেছে। যেটুকু মায়া ছিল নোয়াখালীর হাঙ্গামার পর সেটুকুও আর নেই। এখন ভাঙন আসছে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদি না হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাঙালীত্ব প্রবল হয়। যেমন ফরাসীদের মধ্যে, যেমন জার্মানদের মধ্যে দুই শতাব্দী পরে প্রবল হয়েছিল। আমাদের বেলা হয়তো দুই শতাব্দী নয়, এক শতাব্দী। হয়তো আরো কম। আধ শতাব্দী। কিন্তু আপাতত হয় সিভিল ওয়ার নয় পার্টিশন।" স্বপনদা আকুল কণ্ঠে বলেন।

"অ্যাটলীকে বিশ্বাস করুন। মাউন্টব্যাটেনকে চান্স দিন।" সুকুমার ভরসা দেয়।

"তুমি তো জানোই, আমি ইংরেজদের বিশ্বাস করি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। প্রথমে সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে। পরে সুভাষ আর তার আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্যে। বাধ্য হয়ে ওরা মুসলিম লীগের দিকে ঝোঁকে। মুসলিম লীগও ওদের দিকে। এই যে আঁতাত এর থেকে ইংরেজরা বেরোতে পারবে না। হিন্দুদের আরো আসন দিতে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড চেয়েছিলেন, ইউরোপীয় সিভিলিয়ানরা গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরেন। স্টীয়ারিং হুইল চেপে ধরলে ড্রাইভারের হাত বেঁকে যায়। তেমনি ম্যাকডোনাল্ডের হাত এদিক ওদিক হয়ে যায়। নইলে তিনি বাঙালী হিন্দুদের উপর অমন অবিচার করতেন না। এবারেও কি ইউরোপীয়ান সিভিলিয়ানরা স্টীয়ারিং হুইলে হাত লাগাবেন না? তা ছাড়া বেসরকারী ইউরোপীয়নরাও সেবারকার মতো এবারেও মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে জোর ওকালতী করবেন। সম্প্রদায় এখন নেশন বলে পরিচয় দিচ্ছে। হোমল্যাণ্ড সে আদায় করে নেবেই, সেটাও হবে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক। সেইজন্যেই তো আমার আশঙ্কা কলকাতার বেলা অ্যাটলী অথবা মাউন্টব্যাটেনের হাত বেঁকে যাবে। কে জানে হয়তো আমার এই বাড়ীখানাও পড়বে পাকিস্তানে। তোমার বৌদি ইংরেজদের আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাই স্টেনগানের জোগাড় দেখছেন। উনি কোনো মতেই অমন অন্যায় রোয়েদাদ মেনে নেবেন না। বলছেন, মেরি কলকত্তা নেহি দুঁগি। ঝাঁসীর রানীর মতো কথা।" স্বপনদা মুচকি হাসেন।

"ঝাঁসীর রানীর ভূমিকাটা তো মিলির, যেমন জোন অভ্ আর্কের ভূমিকাটা জুলির। বৌদি যদি এদের কারো ভূমিকায় নামেন এরা যাবে কোথায়? ওসব অবাস্তব জল্পনাকল্পনার দিন গেছে। এখন শুধু ইংরেজরা নয়, মুসলমানরাও লড়াইয়ে নেমেছে। দুই ফ্রণ্টে লড়তে গেলে হিটলারের দশা হবে। জুলি অমন কাজ করবে না, তার দুই বাচ্চা নিয়ে সে নাজেহাল। রণকে ফেলে মিলিও যে আগুনে ঝাঁপ দেবে তা মনে হয় না। এখন বৌদিকে আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত ও নিরস্ত্র করুন, স্বপনদা।" সুকুমারের সবিনয় অনুরোধ।

"হা হা! নিরস্ত ও নিরস্ত্র করলে করবে আমি নয়, এলফ। ওর মুখ চেয়েই উনি ওই জঙ্গী ভূমিকা ছাড়বেন। সোজা কথাটা এই যে ইংরেজদের

দিতে হবে সর্বপ্রকার অভয়। প্রাণের, ধনের, ধর্মকর্মের, ব্যবসা বাণিজ্যের। তা হলে ওরাও রাজনৈতিক সুবিচার করবে।" স্বপনদা পরামর্শ দেন।

"চমৎকার! আরো ভালো হয় যদি আরো দুটি বাক্য জুড়ে দেন। ডোমিনিয়ন স্টেটাসে রাজী হতে হবে আর কমনওয়েলথে যোগ দিতে হবে। দেখবেন আস্ত কলকাতা আপনাদের ভাগে পড়বে, সমেত গ্রেটার ক্যালকাটা। ওদিকে দিল্লী, সমেত গ্রেটার ডেলহি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে দিয়ে একবার পাশ করিয়ে নিতে পারলে সেই বাউণ্ডারিই হবে পারমানেণ্ট বাউণ্ডারি।" সুকুমার গ্যারাণ্টি দেয়।

"তা হলে বাঙালী জাতি আর কোনোদিন এক হবে না। বাংলাদেশ আর কোনোদিন এক হবে না।" স্বপনদার চোখে জল এসে পড়ে।

"ইতিহাসে কিছুই ফাইনাল নয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সত্যিকার ঐক্যবোধ জন্মালে ভাঙা দেশ ও ভাঙা প্রদেশ আবার জোড়া লাগবে। মারামারি করে গায়ের জোরে একাকার করা একটা প্রমাদ। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করে হিন্দু মুসলিম প্যাক্টও তেমনি ঐক্যের নামে ছলনা। তৃতীয় পক্ষের নির্বন্ধে বিবাহ না করে তৃতীয় পক্ষের সালিশীতে বিবাহভঙ্গই এক্ষেত্রে বিজ্ঞতা।" সুকুমার নিজের সমস্যার কথা ভেবে বলে।

"ওয়েট অ্যাণ্ড সী।" স্বপনদা একসঙ্গে দুই সমস্যার উত্তর দেন।

সুকুমার থাকতেই সৌম্য এসে উপস্থিত। যদিও একুশ দিনে নয়, তার কয়েকদিন পরে, তবু উপলক্ষটা একই। নবজাতকদের মুখদর্শন। স্বপনদাকে ও বৌদিকে সাদর নিমন্ত্রণ। সুকুমার ও মিলিকে আগেই করা হয়ে গেছে। জুলির কনফাইনমেণ্টের তারিখ আন্দাজ করে সুকুমার লণ্ডন থেকে উড়ে এসেছে। জুলিকে একবার শেষবারের মতো দেখতে, যদি না বাঁচে। মিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারত সম্বন্ধে একটা এসপার কি ওসপার হতে যাচ্ছে বলেই তার আসা। আর এমনি বিধাতার কৌতুক যে বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ওদেশে মিস্টার অ্যাটলীর সেই যুগান্তকারী ঘোষণা আর এদেশে জুলির যমজ সন্তান লাভ।

"ওহে সৌম্য, তোমাকে একটা কথা বলব বলে কয়েকদিন থেকে খুঁজছি। কিন্তু তার আগে বলো, এ কী অঘটন! তোমার এমন চেহারা কেন? তোমার সেই সুপুষ্ট দাড়ি কোথায়?" স্বপনদা সহাস্যে সুধান।

"আর বলেন কেন, স্বপনদা? আমার মানত ছিল ভারত যেদিন স্বাধীন

হবে সেইদিন আমি আমার দাড়ি বিসর্জন দেব। আমার বাচ্চাদের কোলে নিতে গেলুম, নার্স বলে কি না দাড়িতে কত কী বীজাণু আছে, বাচ্চাদের পক্ষে ছোঁয়াচে হতে পারে। যান, আগে দাড়ি কামান, তার পর ওদের কোলে নেবেন। কত বড়ো একটা মরাল ক্রাইসিস! ভেবে দেখি স্বাধীনতা তো একরকম মুঠোর মধ্যে। মিস্টার অ্যাটলী কথা দিয়েছেন। অনিশ্চিত যেটা সেটা স্বাধীনতা নয়, অখণ্ডতা। তা হলে দাড়ি ফেলে দিয়ে বাচ্চাদের আদর না করি কেন?" সৌম্য হাসতে হাসতে বলে।

"বেশ করেছ। এখন তোমাকে রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে। দাড়ি রাখার বয়স তো চলে যাচ্ছে না। বুড়ো বয়সে আবার রেখো, যদি ঋষিকল্প হতে চাও। এখন শোন তোমাকে কী বলতে চেয়েছি। তোমাদের যমজ সন্তান লাভ একটি প্রতীকী সূচনা। ভারতবর্ষ ভেঙে যমজ রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে। অ্যাটলীর ঘোষণা যেদিন তোমাদের যমজ সন্তান লাভ সেইদিন। এটা কি নিছক কাকতালীয়? না বোধ হয়।" স্বপনদার ধারণা।

"যাঃ! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! আমাদের বাচ্চা দুটি কী অপরাধ করেছে যে দেশের ভাঙন সূচনা করবে? ওটা ব্রিটিশ পলিসি। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল থেকে ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। জিন্নার সঙ্গে চার্চিলের যোগসাজস। শেষে অ্যাটলীও এক কোপ দিলেন। এট টু ব্রুটে! তুমিও, ব্রুটাস!" সৌম্য ক্ষোভ জানায়।

সুকুমার অ্যাটলীর পক্ষ নেয়। "ভারতের অখণ্ডতা তো তিনি নাকচ করছেন না। সেটা ভারতীয়দের উপরেই ন্যস্ত করছেন। ভারতীয়রা যদি দ্বিমত হয় তবে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হবে। যদি বহুমত হয় তবে বহুধা বিভক্ত হবে। ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবে। তার বেয়োনেট সরিয়ে নেবে।"

সৌম্য এই নিয়ে তর্ক করতে আসেনি। সে এখন খোশ মেজাজে আছে। বলে, "স্বপনদা, এদের দুটোর কী নাম রাখা যায়, বলুন তো?"

"তোমার বৌদি বলেন, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা। মহাভারতের দুই প্রধান চরিত্র। তাঁরা অবশ্য যমজ ছিলেন না। আমি এখনো ভেবে দেখিনি।" স্বপনদা বলেন।

সুকুমার খোঁচা দেয়। "সৌম্য, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। জুলিকে তুমি দ্বিগুণ কষ্ট দিলে। ও যদি মারা যেত তোমাকে জেলে পোরা উচিত হতো।"

সৌম্য বলে, "আমি তো জেলে যাবার জন্যে সব সময় তৈরি।"

স্বপনদা হাসেন। "প্রকৃতির প্রতিশোধ। এতকাল ধরে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের এই হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম! আরো দেরি করলে ট্রিপলেটস জন্মাত।"

"তা হলে ফাঁসী দেওয়া উচিত হতো।" সুকুমার রায় দেয়।

দীপিকাদি অন্য ঘরে ছিলেন। সৌম্য ও সুকুমারকে নিয়ে স্বপনদা তাঁর কাছে যান। সব শুনে তিনি বলেন, "সব ভালো যার শেষ ভালো।"

অতএব সবাইকে মিষ্টিমুখ করতে হবে। বৌদি তার আয়োজন করেন। স্বপনদা বলেন, "শোন, সৌম্য, তোমাকে আমার আরো কিছু বলার ছিল। তাই নিয়ে আমার মন ভারাক্রান্ত। পাঁচবছর আগে ইংরেজ রাজের উপরে তোমরা কুইট নোটিস জারী করেছিলে। সে নোটিস সে সময় কার্যকর হয়নি। হতে যাচ্ছে আজ থেকে পনেরো মাসের মধ্যে। রেড আর্মিকে রুখতে হলে পশ্চিম জার্মানীতে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা চাই। অগত্যা ভারত থেকে তাদের অপসারণ করতে হবে। তার পরে কী? পাওয়ার ভ্যাকুয়াম। শূন্যতার সুযোগ নিয়ে সর্বব্যাপী অরাজকতা। অথবা একরাশ বলকান রাজ্য। যেমনটি বার বার ভারতের ইতিহাসে দেখা গেছে। শূন্যতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমাদেরও আছে, কিন্তু পূর্ণতা দিয়ে সে শূন্যতা ভরার ক্ষমতা এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেইজন্যে আহ্বান করা হয়েছে কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী। যার কাজ সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাতে না থাকছেন গান্ধী, না থাকছেন জিন্না। গান্ধীর দলের লোক থাকছেন, কিন্তু জিন্নার দলের লোক অদৃশ্য। রাজন্যরাও কেউ আসছেন না। আপনাদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত না করে প্রত্যেকের নজর এখন তৃতীয় পক্ষের উপর। তৃতীয় পক্ষ যাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে যাবেন তিনিই রাজরাজেশ্বর হবেন। কিন্তু মুকুটের দাবীদার কি একজন? তৃতীয় পক্ষ যদি কংগ্রেসকে দেন লীগ হবে চিরশত্রু। যদি লীগকে দেন কংগ্রেস হবে চিরশত্রু। কেনই বা তাঁরা চিরশত্রু পেছনে রেখে যাবেন? যখন বাণিজ্যের জন্যে আবার ফিরে আসতে হবেই। বাণিজ্য বিনা কি ওইটুকু দেশ বাঁচতে পারে? মুকুট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবেই। এই পরিস্থিতিতে গণ সত্যাগ্রহ হচ্ছে গণ হত্যাগ্রহ। জেনোসাইড। সেই জেনোসাইডের দিন তোমার মতো দু'চারজন পাগল শহীদ হলেই জেনোসাইড বন্ধ হবে না, সৌম্য। তোমাদের বাপুর আমরণ অনশনও ব্যর্থ হবে। শূন্যতা পূরণের ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই

পারবেন জেনোসাইড রুখতে বা থামাতে। শূন্যতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর আছে, শূন্যতা পূরণের ক্ষমতা তাঁর নেই। নেই তাঁর অনুগামীদেরও। এই যে নীরেট সত্য একে বিনম্র ভাবে মেনে নেওয়াই সত্যের প্রতি আগ্রহ। মুসলিম লীগ ইংরেজের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে অধিকাংশ মুসলমানদের প্রতিভূ। তারা তাকে ভোট দিয়েছে, তার ইঙ্গিতে জান নিয়েছে। জান দিয়েছে। এই পিশাচ নৃত্য হিন্দুকেও পিশাচ করে তুলছে। আমাদের সকলেরই মাথা উঁচু হয়েছিল গান্ধীর জন্যে, সুভাষের জন্যে। এখন সকলেরই মাথা হেঁট জিন্নার জন্যে। আমাদের পিশাচে পরিণত করার ক্ষমতা জিন্নার আছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ইংরেজরাও অত নিচে নামতে পারত, কিন্তু নামবে না বলেই মানে মানে চলে যাচ্ছে। মুসলিম লীগ মানে মানে চলে যাবে না। কংগ্রেসকেই মানে মানে ভারতের এক অংশ থেকে চলে আসতে হবে। এই যে সিদ্ধান্ত এর আর কোনো বিকল্প নেই, সৌম্য। ক্যারামেলকে আর তার বাচ্চাদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি। তুমিও বাপুর অনুমতি নিয়ে সরে এসো। তাতে যদি তোমার পৌরুষে বাধে তবে অবশ্য অন্য কথা। আর ক্যারামেল যেমন পতিব্রতা সে কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটবে। তা বলে বাচ্চা দুটোকেও নিয়ে যাবার অধিকার কি ওর আছে? কী বলো, রানু?"

"কক্ষনো না। বাচ্চা দুটোকে বাঁচাতে হবে। ওদের জন্যে আমি ফীডিং বটল কিনে রেখেছি। মা-টাকে ওরা দুটোতে মিলে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। সেও ওদের সব সময় বুকে করে রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কোলছাড়া করবে না। অমন করলে ওর মাই শুকিয়ে যেতে কতক্ষণ! ফীডিং বটলই এ প্রশ্নের উত্তর।" বৌদি বলেন।

"শ্রমিকের ঘরে ওসব মানায় না, বৌদি। আমরা আশ্রমিকরাও শ্রমিক।" সৌম্য পাশ কাটায়।

নির্দিষ্ট দিনে স্বপনদা ও দীপিকাদি দু'জনে দুটি মোহর দিয়ে নবজাতকদের মুখ দর্শন করেন। দীপিকাদি শিশু দুটিকে এক এক করে কোলে তুলে নেন ও একটু আদর করে স্বপনদার দিকে বাড়িয়ে দেন। দাদা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একজনের বেলা বলেন, "না, না, হিজি করবে।" আরেক জনের বেলা বলেন "এ রাম! পচ করবে!"

জুলি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো ক্ষয় হতে হতে আধখানা হয়ে গেছে। কিন্তু

ওর বাচ্চা দুটি বয়সের তুলনায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মায়ের দুধই ওদের একমাত্র খাদ্য। ফীডিং বটলের প্রস্তাব জুলি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

বাবলী, মিলি, টুকটুক সবাই এসে যে যা পারে দিয়ে নবজাতকদের মুখ দর্শন করে যায়। কোলে তুলে নেয়। আদর করে। কিন্তু সুকুমার ও তল্লাট মাড়ায় না। জুলির মাকে একান্তে বলে, "আহা, বেচারি জুলি! অপাত্রে পড়লে যা হয়।"

মিসেস সিন্‌হা কান দেন না। মেয়ের ডেলিভারির দিন থেকে তাঁর মুখে কেবল একটি কথা, "গড ইজ গ্রেট! আল্লা হো আকবর! ভগবান পরম মহিমাময়!" সুকুমারের বক্তব্য না শুনে তাঁকেও সেই কথা বলেন। "গড ইজ গ্রেট! আল্লা হো আকবর! ভগবান পরম মহিমাময়!" সুকুমার তো তাজ্জব।

রণও এসেছিল জুলি মাসীকে ও তার বাচ্চা দুটিকে দেখতে। দীপিকাদি তাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করেন। "কী রণ? কৃষ্ণাকে তোমার পছন্দ হয়? পছন্দ হলে বলো। এখন থেকে বুক করে রাখি। তোমারই ফার্স্ট চয়েস।"

তা শুনে মিলি মুখ ভার করে। "বৌদি, এ কেমনতর রঙ্গ? এই বয়স থেকেই রণ বিয়ের কথা ভাববে?"

"উঁহু! শাস্ত্রমতে এটা ব্রহ্মচর্যের বয়স।" স্বপনদা টিপ্পনী কাটেন।

সৌম্য হাত জোড় করে সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। প্রকাশ্য আনন্দের সঙ্গে তার মনে প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ। কবে এদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। আদৌ পারবে কি না। জুলি যদি রাজী না হয়। তার মা যদি মত না দেন। ডাক্তারদের যদি অমত থাকে। সৌম্যই বা ক'টা দিক সামলাবে! আশ্রমের গঠনমূলক কর্ম। জেলার সাম্প্রদায়িক শান্তি। গৃহস্থের পারিবারিক সমস্যা।

মিলি ওর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে। "সৌম্যদা, বাবার মন উঠে গেছে। উনি আর ওদেশে থাকতে চান না। হ্যাঁ, দেশই বটে। মুসলিম নেশনের বাসভূমি। মা তো অনেকদিন থেকেই বিমুখ। উনি শ্রীরামপুরের মেয়ে। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। গঙ্গাজল সব সময় ঘরে মজুত। হালদার বাড়ীতেও। আমরা যদি না থাকি তোমরা কাদের কাছে সমাজ পাবে? তোমাদের ওই আশ্রম উঠিয়ে নিয়ে চলে এলে কেমন হয়? তবে সেবাপ্রতিষ্ঠান যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। শুধু ট্রাস্টি বদল হবে।"

"আশ্রমের বেলাও কি ট্রাস্টি বদল হতে পারে না? ভেবে দেখব। আমি কিন্তু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসতে চাইনে। আমরা থাকলে হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা থাকবে। নয়তো ওরাও চলে আসতে চাইবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চলে আসা মানে মহানিষ্ক্রমণ। লোকে বলবে ইংরেজরা মহানিষ্ক্রমণ করেছে বলে আমরাও তাই করেছি। যেন ব্রিটিশ বেয়োনেটই ছিল আমাদের রক্ষাকবচ। নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ব্যাপারের পর দু'লাখ শরণার্থী জড়ো হয়েছে পদ্মাপারের ত্রাণ শিবিরে। বাপু না গেলে তাদের সংখ্যা আরো বেশী হতো। এপারে এসে ওরা থাকবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? জীবিকা জুটবে ক'জনের? বিয়ে করেছি বলে, বাপ হয়েছি বলে কি আমি হুট করে চলে আসতে পারছি? সরকারী কর্মচারীদের মতো আমারও একটা চার্জ আছে। তুমি ভেবে দেখো, বোন। তোমারও কি নেই?" সৌম্য আবেদন করে।

মিলি অন্তরঙ্গ স্বরে সুধায়, "সৌম্যদা, তোমার কি ইচ্ছে আমি ওখানে থাকি?"

"আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে অবান্তর। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ হিন্দুর মেয়েদের মনের জোর বজায় রাখতে হলে তোমার মতো সাহসী মেয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমার মতো বীরাঙ্গনার পালিয়ে আসা যেন যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া। তুমি যদি যুদ্ধে ভঙ্গ দাও তা হলে হিন্দু শরণার্থীর স্রোত রোধ করতে পারা যাবে না। ওদিকে বিহারী হিন্দুরাও বদলা নেবে। বিহারী মুসলমান শরণার্থীতেও বাংলাদেশ ভরে যাবে। দুই দিক থেকে শরণার্থীর স্রোত, কলকাতা কি ভাসবে না ডুববে?" সৌম্যও পাল্টা সুধায়।

"কলকাতার কী হবে না হবে, জানিনে। কিন্তু বাবা বলছেন পূর্ববঙ্গ একটা ডুবন্ত জাহাজ আর তিনি সেই ডুবন্ত জাহাজের প্রথম ইঁদুর। জানো তো, জাহাজডুবির সময় ইঁদুরই সকলের আগে টের পায়, তাই সকলের আগে পালায়। বাবা যেখানে থাকবেন না আমি সেখানে কেমন করে থাকি? কোন্ সুবাদে থাকি? তুমি যদি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকাতে পারো তা হলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু তা হলে রণের কী হবে? সে কোথায় থাকবে? রণকে আমি পূর্ববঙ্গে রাখব না। রণের বাবা এসেছে, জানো। ওর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। রণের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।" মিলি সুকুমারকে গ্রাহ্য করে না।

সৌম্য সুকুমারকে ইশারায় ডাকে। সে এক ভদ্রমহিলাকে মাউণ্টব্যাটেনের কুলজি শোনচ্ছিল। তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আসে।

"সুকুমার, তুমি বিলেত সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিবহাল তেমন আর কেউ নয়। তাই এই অজ্ঞ দেশকে জ্ঞান দেবার জন্যে তোমার এখন এই দেশেই থেকে যাওয়া সমীচীন। তোমার ছেলে রণ যদি শান্তিনিকেতনে পড়ে তোমার থাকা উচিত তার কাছাকাছি কলকাতায়। কিন্তু মধুমালতীর কর্মক্ষেত্র এখন পূর্ববঙ্গ। সেখানে নিপীড়িতা নারীদের পাশে দাঁড়াবার জন্যে তাঁর মতো সাহসিকার প্রয়োজন আছে। মঞ্জুলিকারও কর্তব্য তাই, তবে ওঁর অবস্থা তো দেখছ। উনি আমার সঙ্গে থাকতে চাইলেও ওঁর মা ওঁকে অনুমতি দেবেন না। কারণ ডাক্তারদের মত নেই। ক্যাপটেন মুস্তাফী কার চেয়ে কম? আমি তাঁর ভরসায় জুলিকে আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছিলুম, তিনি কিন্তু আর সেখানে থাকতে রাজী নন। সময় থাকতে মানে মানে সরে আসবেন, ইংরেজ যেমন সময় থাকতে মানে মানে সরে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গ যে পূর্ব পাকিস্তান হবে এটা তো মোটামুটি নিশ্চিত। যদি না বাঙালী হিন্দু মুসলমান ঝগড়া ভুলে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম করে।" সৌম্য বলে যায়।

"ক্যাপটেন মুস্তাফী ওখানে না থাকলে তাঁর কন্যা থাকবেন কার তত্ত্বাবধানে? এটা কি ইংলণ্ড যে উনি স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবেন? এদেশে হয় স্বামী, নয় পিতা, নয় অন্য কোনো গুরুজন সঙ্গে থাকা চাই। নিপীড়িতা নারীর জন্যে সমবেদনা আমারও কম নয়, কিন্তু তার ত্রাণের দায়িত্ব সমগ্র সমাজের, সমগ্র রাষ্ট্রের, সমগ্র সভ্যতারও বলতে পারো। একক ভাবে আমরা কে কী করতে পারি? আমরা কি মহাত্মা গান্ধী, যিনি একাই একশো? ক্যাপটেন মুস্তাফীর মতো প্রভাবশালী ডাক্তার যেখান থেকে চলে আসছেন সেখানে তাঁর কন্যার তিষ্ঠনো সহজ হবে না। তবে, তাঁকে 'না' বলার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার সন্তানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হবার অধিকার আমার আছে।" সুকুমার স্বাধিকার সচেতন।

সৌম্য আঁচতে পারে ওদের দু'জনের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। ওদের সিদ্ধান্ত ওদের উপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। বলে, "রণের জন্যে ভাবনাই সকলের আগে। আরো ছুটো রণ আছে। ইংরেজদের সঙ্গে রণ, লীগপন্থী মুসলিমদের সঙ্গে রণ। সেসব রণের কথা পরে। তার জন্যে অন্য অনেকে রয়েছে।"

বাড়ী ফেরার সময় সুকুমার বলে, "মিলি, তুমি সত্যিই অসাধারণ মেয়ে। তোমার এক ফোঁটাও পজেসিভনেস নেই। তুমি অনায়াসেই তোমার স্বামীকে ইংরেজ মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারলে। তারা ভুল বলে যারা বলে মেয়েদের স্বভাবই হলো জেলাসী। এমন স্ত্রীর স্বামী হওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য। তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমি আর কাউকে বিয়ে করব না, কারণ আর কেউ তোমার মতো মহান হবে না। তুমি কি নারী? তুমি একটি এন্‌জেল!"

"কিন্তু তুমি তো জেলাস। তুমি তো পজেসিভ। তুমি তো আমাকে সৌম্যদার সঙ্গে মিশতে দেখলে বিশ্বাস কর না। জুলি যখন ওখানে থাকবে না তখন ওকে কেই বা দেখবে শুনবে, আমি যদি মাঝে মাঝে গিয়ে না দেখি, না শুনি? এটা কি আমার বাল্যসখী জুলির প্রতি আমার কর্তব্য নয়? আর সৌম্যদাও তো একটি এন্‌জেল। ও কি তোমার মতো পুরুষ যে নারী বিনা বাঁচতে পারে না? ওর সঙ্গে মেয়েরা সবাই নিরাপদ। আমিও ব্যতিক্রম নই। ওর জন্যে জুলিকে ষোল সতেরো বছর তপস্যা করতে হয়েছে। বোকা মেয়ে যৌবন বইয়ে দিয়েছে। দেখলে তো কী বিশ্রী হয়েছে ওকে দেখতে। কেমন অস্থিচর্মসার! আমরাও তো মা হয়েছি, তা বলে এমন হাড়গিলের মতো চেহারা! সৌম্যদা বলেই ওকে ভালোবাসে। তা না হলে জুলি একটা রূপসী বিদ্যাধরী নয়।" মিলি মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে বলে যায়।

সুকুমার টিপে টিপে হাসে। "এর নাম জেলাসী।"

"জেলাসী? আমি জেলাস? কার বেলা জেলাস? জুলির বেলা? মরণ! বরং তুমিই জেলাস। সৌম্যদার বেলা। কবুল করো।" মিলি তর্জনী উঁচায়।

"আচ্ছা, কবুল করছি। আমি সৌম্যকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ওর সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করি। ওর জন্যে জুলিকে হারিয়েছি। আর তুমিও যেমন আত্মহারা তাতে আমি মনে মনে শঙ্কিত। যদিও কায়িক অর্থে নয়।" সুকুমার কবুল করে।

"তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি। তুমি আমাকে সন্দেহ করো। তা হলে বিচ্ছেদই শ্রেয়। কী বলো?" মিলি রুক্ষ স্বরে বলে।

"ওটা তোমার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি, মিলি। আমি তো প্রাণ থাকতে

রণকে সৎমা দেব না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করব না। তুমি করতে পারো। সেইজন্যে বিচ্ছেদ দাবী করছ।" সুকুমার খোঁচা দেয়।

"কী সাংঘাতিক লোক রে, বাবা! কবে আমি বিচ্ছেদ দাবী করলুম? আমিও কি আবার বিয়ে করতে চাই নাকি? রণকে আমি সৎবাপ দেব? এ জন্মে নয়। তবে তোমার সঙ্গে বসবাস আর নয়।" মিলি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়।

"আমার দুর্ভাগ্য। এমন রত্ন আমি নিজ দোষে হারালুম। বিলেতেই ফিরে যাব, ভাবছি। তবে রণকে এদেশে ফেলে রেখে যাব না। বাপের অধিকার খাটাব। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। কেন আমার অধিকার খোয়াব? রণ আমার ছেলে, সে আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে।" সুকুমারও স্পষ্ট জানিয়ে দেয়।

"তা বলে আমার ছেলে আমার জিম্মা থাকবে না? আইনে কী বলে? চল স্বপনদার কাছে যাই।" মিলি প্রস্তাব করে।

"স্বপনদার ওখানে আমি ঘুরে এসেছি। ওঁর পরামর্শ নিয়েছি। তুমি যদি চাও তো আবার তোমার সঙ্গে যেতে পারি। ছেলে বিলেতে পড়াশুনা করবে, ফী বছর দেশে এসে মার সঙ্গে দেখা করে যাবে। রণ ব্রিটিশ বর্ন, কাজেই ওটাই ওর স্বদেশ। ওর জন্মের সময় সেকথা তুমি জানতে।" সুকুমার মনে করিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ, জানতুম। তখন উপায় ছিল না।" মিলি স্বীকার করে।

"বেশ, এখন উপায় হয়েছে। শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া, সবই এক এক করে খুলে ফেলেছ বা মুছে ফেলেছ। এখন তুমি কুমারী। আবার বিয়ে করতে পারো, যদি ডিভোর্স চাও আর পাও। তুমি আমার বিরুদ্ধে যা খুশি বানিয়ে দরখাস্ত করতে পারো, আমি কনটেস্ট করব না। আমি জানি আমার মতো শত শত পুরুষ আছে, আমি নিতান্তই একজন অ্যাভারেজ ম্যান। আর তুমি একটি অসামান্য নারী, যার সমকক্ষ লাখে না মিলয় এক। গোড়া থেকেই জানতুম যে তোমাকে আমি বেশীদিন ধরে রাখতে পারব না। এতদিন যে পেরেছি এটা রণের কল্যাণে। ওর উপর অধিকার আমার থাকলেও আমি সেটা আপাতত খাটাতে চাইনে। এই বছরটা ভারতের ইতিহাসে একটা আশ্চর্য বছর। কত রকম আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আমি আজ কলকাতা, কাল দিল্লী, পরশু লণ্ডন ঘুরে বেড়াব। রণের দায়িত্ব কি আমার

নেওয়া সাজে? তুমিই ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করো। ফলাফলের জন্যে তুমিই দায়ী। ও যখন সাবালক হবে তখন ওকে আমি খুলে বলব সব কথা। তার পর ওর যদি ইচ্ছে হয় বিলেতের কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেব। ব্রিটিশ বর্ন বলে ও হয়তো কিছু সুবিধে পাবে। তুমি আর যাই করো ওর বার্থ সার্টিফিকেটটা ফেলে দিয়ো না। দেশ স্বাধীন হলেও সেটা ওর কাজে লাগবে। আমি যতদূর দেখতে পারছি ব্রিটেনের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের একটা ট্রীটি হবে। যদি সে রেপাবলিক হয়। ট্রীটির দরকার হবে না, যদি সে ডোমিনিয়ন স্টেটাস বরণ করে।" সুকুমার সমস্ত আবেগ চেপে রাখে।

"বাজে কথা! ডোমিনিয়ন স্টেটাস সতেরো বছর আগেই খারিজ করা হয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা যদি গ্রহণ করে বামপন্থীরা তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। সেদিন কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে নেহরুর স্বাধীন সার্বভৌম রেপাবলিক প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। এর আর নড়চড় নেই।" মিলি বলে দৃপ্ত স্বরে।

"মুসলিম লীগ তা স্বীকার করে নেয়নি। তার সদস্যরা অনুপস্থিত। রাজন্যরা মেনে নেননি। রেপাবলিকে তাঁরা যোগ দিতেই পারেন না। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর প্রস্তাব কংগ্রেস প্রদেশগুলোর উপর বলবৎ হতে পারে। অন্যান্য প্রদেশগুলোর উপর নয়। রাজ্যগুলোর উপর তো নয়ই। অ্যাটলীর ঘোষণার মর্ম, যারা রেপাবলিক পছন্দ করে তাদের অংশ রেপাবলিক হবে, যারা পছন্দ করে না তাদের অংশ ডোমিনিয়ন হবে।" সুকুমার ব্যাখ্যা করে শোনায়।

"তা হলে আরো একবার লড়তে হবে। আমি লড়ব।" মিলি জলে ওঠে।

"লড়লে দুই ফ্রন্টে লড়তে হবে। ব্রিটিশ ফ্রন্টে আর মুসলিম লীগ ফ্রন্টে। তার আগে পূর্ববঙ্গ ইভ্যাকুয়েট করো, আরো দশটা নোয়াখালীর জন্যে তৈরি হও। আমি জানি তোমার ভিতরে যে আগুন ছিল সে আগুন এখনো নেবেনি। তুমি আমার অনুরোধ অনুনয় শুনবে না। এবার কিন্তু জেল বা দ্বীপান্তর নয়। মুসলমানের ছোরা, ইংরেজের গুলী। রণকে নিরাপদ দূরত্বে রেখো, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। কালকেই আমি শান্তিনিকেতন যাচ্ছি ওকে দেখতে। সেখান থেকে দিল্লী। দিল্লী থেকে লণ্ডন। তোমার সঙ্গে এবারকার মতো এই শেষ দেখা।" সুকুমার মিলিকে পৌঁছে দিয়ে বলে।

"তুমি আমাদের ফ্ল্যাটে আর থাকবে না?" মিলি বিস্মিত হয়।

"কোন্ সুবাদে থাকব? সবই তো চুকে গেছে।" সুকুমার ডান হাত বাড়ায়।

মিলি তার হাতটা দুই হাতে চেপে ধরে মুখে ছোঁয়ায়। বলে, "সব চুকে যায়নি ও যাবে না। এই যে তোমার দেওয়া আংটি। তোমার অভিজ্ঞান।"

সুকুমারকে মিলি হিড় হিড় করে ভিতরে টেনে নিয়ে যায় ও দরজা বন্ধ করে দেয়। তার পর খুব একচোট কাঁদে। "তুমি জুলিকে দেখতে এসেছ। আমাকে নয়।"

॥ চৌদ্দ ॥

অর্ধেক রাত অবধি ওরা তর্কাতর্কি করে কাটায়। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। হাতাহাতি থেকে মাতামাতি। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম থেকে উঠে মিলি তার বরের গলা জড়িয়ে ধরে। "যেতে নাহি দিব।"

"তার মানে কী, মিলি?" সুকুমার চুমু খায়।

"তোমাকে আর বিলেত ফিরে যেতে দেব না। এই দেশেই আমরা তিনটিতে মিলে নীড় রচনা করব। তুমি, আমি আর রণ। লাগে টাকা দেবে কালী মুস্তাফী। বাবার বিজনেস কনসার্ন সরে আসছে কলকাতায়। দেখবার লোক নেই। আমি কি ছাই বিজনেস বুঝি? বাবা তোমাকে চান, মা তোমাকে চান, দাদা তোমাকে চান, আমি তোমাকে চাই, রণ তোমাকে চায়। আমাদের ঝগড়া তো জুলিকে কেন্দ্র করে। জুলি এখন ওর দুই বাচ্চাকে নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। ও এখন কোনো অর্থেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়! বেচারি! সৌম্যদার জন্যে দুঃখ হয়। ঘর সামলাবেন না বাহির সামলাবেন? ওঁর রাজনৈতিক ভূমিকা খতম। ওই আশ্রমের বাবাজী ও মাতাজী হয়ে ওদের বাকী জীবনটা কাটবে।" মিলি হাসে।

"ওদের কী হবে না হবে তা নিয়ে আমার কী মাথাব্যথা? আমার মাথাব্যথা আমার ছেলের জন্যে, ছেলের মায়ের জন্যে। আমার এই ছোট্ট

বুলবুলিটির জন্যে। এই স্যুইট ইয়াং গার্লটির জন্যে। মিলি, মাই ল্যভ্। তুমি কি বুঝতে পারছ না তুমি কী ভুল করছ? ওদেশে তোমার নিজের বাড়ী রয়েছে। তুমি ওদেশের নাগরিক। আমরা যে ওয়েলফেয়ার স্টেট গড়ছি তাতে কেউ বেকার থাকবে না, তুমিও না। আর তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। স্কুল থেকে বেরোলেই চাকরি। আর নয়তো ইউনিভার্সিটি থেকে। ওর বাপকে এদেশে কেউ চেনে না, কিন্তু ওদেশে না চেনে কে? অ্যাটলী থেকে শুরু করে ক্রিপস, পেথিক-লরেন্স, মিস উইলকিনসন। বেভানকে তো আমি 'নায়' বলেই ডাকি। অবশ্য রণ যখন বড় হবে তখন ওঁরা বেঁচে থাকবেন কি না, ক্ষমতায় থাকবেন কি না বলতে পারব না। কথায় বলে বেড়ালের ন'টা জীবন। টোরিদেরও তাই। ওরা যদি ফিরে আসে তো ওয়েলফেয়ার স্টেট ডুববে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। ডুবন্ত জাহাজ থেকে প্রথম ইঁদুর হয়ে পালিয়ে আসতেও পারি।" সুকুমার শিউরে ওঠে।

"ততদিনে একটা ওলটপালট হয়ে গিয়ে থাকবে। কাজকর্ম জুটবে কি না কে গ্যারান্টি দেবে? আমার নামও তো লোকে ভুলে যাচ্ছে। এ বাজারে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেরই নামডাক। নেতাজীর দিকে যারা তাকিয়ে রয়েছে তাদের মতো কতক আশাবাদী বাদে। আমি সাত বছর বাইরে থেকে তাদের থেকেও বিচ্ছিন্ন। নাম করব না, যে গোষ্ঠির সঙ্গে আমার মেলবন্ধন তারও স্বতন্ত্রভাবে লড়বার শক্তি নেই। কংগ্রেস লড়লেই সে গোষ্ঠী লড়বে। আর গান্ধী লড়লেই কংগ্রেস লড়বে। কিন্তু মহাত্মার মনে কী আছে তা প্যারে-লালজী ও নির্মলদাও জানেন না। আমার তো মনে হয় বুড়ো নিজেও জানেন না। অ্যাটলীর শেষ প্রস্তাব শুনে জবাহর যেমন লাফিয়ে উঠেছেন তা লক্ষ করে আমি হতভম্ব! তবে কি মিটমাট আসন্ন? তবে কি ইংরেজ সত্যিই চলল? তা হলে লড়ব আমরা কার সঙ্গে? মুসলিম লীগের সঙ্গে? দূর ছাই! কোথায় স্বাধীনতার জন্যে লড়াই! কোথায় ভাগবাঁটোয়ারার জন্যে! আমি এর মধ্যে নেই।" মিলি নিঃস্পৃহভাবে বলে।

"বাঁচলুম! তুমি আমার সঙ্গে লড়বে।" সুকুমার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে।

"তুমি থাকছ কোথায় যে তোমার সঙ্গে লড়ব? আজকেই তো চলে যাচ্ছ শান্তিনিকেতন, সেখান থেকে দিল্লী, সেখান থেকে লণ্ডন।" মিলি বলে।

"দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেনকে অভ্যর্থনা করতে হবে। আমি 'ট্রিবিউনে'র বিশেষ প্রতিনিধি। আমাকে সব দেখতে শুনতে রিপোর্ট করতে হবে।

সেকালে একটা ছড়া শোনা যেত। তুমিও শুনেছ নিশ্চয়। 'ঘোড়েকা পর হাউদা, হাতীকা পর জীন। জলদি যাও, জলদি যাও, ওয়ারেন হেস্টিন।' প্রথম গভর্ন'র জেনারেলের মতো শেষ গভর্ন'র জেনারেলও সমান ব্যস্তবাগীশ। ওঁকে বরাত দেওয়া হয়েছে পনেরো মাসের মধ্যে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিতে। উনি ততদিন সবুর করবার পাত্র নন। ওদিকে রয়াল নেভীতে ওঁর চাকরি খালি পড়ে থাকবে। সামনের ডিসেম্বরের মধ্যেই কেল্লা ফতে হবে। তার মানে লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়বে। তার আগে দিল্লী থেকে আমি লণ্ডন রওনা হচ্ছিনে, মিলি। ভাবছি আমি একটা ডায়েরি রাখব। ঐতিহাসিক ডায়েরি।" সুকুমার তার সংকল্প জানায়।

"হ্যাঁ, এই ক'টা মাস খুবই ক্রুসিয়াল। পারলে আমিও যেতুম তোমার সঙ্গে। রণের ছুটি হলে দিল্লী ঘুরে আসব। শুনেছি মাউণ্টব্যাটেন হচ্ছেন প্রিন্স চার্মিং আর লেডী মাউণ্টব্যাটেন সিণ্ডারেলা। একবার চাক্ষুষ করতে হবে।" মিলি আগ্রহ প্রকাশ করে।

"শুধু চাক্ষুষ করবে কেন? পার্টিতে গিয়ে আলাপ করবে। ওঁরা খুব মিশুক শুনেছি। ঘন ঘন পার্টি দেন। রাজবংশের মতো দিলদরিয়া। ওঁদের মস্ত বড়ো গুণ ওঁরা বর্ণ বিচার করেন না। নেটিভ বলে কেউ খাটো নয়। নেহরুর সঙ্গে ওঁদের আগে থেকেই মেলামেশা। ওঁর ভাইসরয় মনোনয়নের এটাও নাকি প্রচ্ছন্ন কারণ। নেহরু যদি তাঁর জাদুবিদ্যার ফাঁদে পড়েন এক এক করে আর সকলেও পড়বেন। মহাত্মাও বাদ যাবেন না। সেদিকটা লেডী মাউণ্টব্যাটেন দেখবেন। তিনি একজন সেবাব্রতী মহিলা। গরিবদের মা জননী।" সুকুমার যতদূর জানে।

"ওদিকে বিরাট বড়লোকের উত্তরাধিকারিণী। তা হলে তো দিল্লী যেতে হচ্ছে। আমিও সেবাব্রতী হতে চাই, সুকু। বাবা আমার জন্যে যা রেখে যাবেন তাও তো বড়ো কম নয়। বিয়ের আগে সেবাধর্মে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। সেইসূত্রে সৌম্যদার সঙ্গে আলাপ হয়। জীবন জড়ানোর স্বপ্নও দেখি। কোথা থেকে উড়ে এল জুলি! আর জুলির সঙ্গে তুমি! সব এদিক ওদিক হয়ে গেল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। এ তিনটি মানুষের হাতে নয়। ভগবানের হাতে। হ্যাঁ, আমি ভগবান মানি। ভগবানই তোমার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সৌম্যদার সঙ্গে জুলিকে। নইলে তুমিই বা কে আর আমিই বা কে? কখনো কি দেখা হয়েছে না ভাব হয়েছে?" মিলি স্মরণ করে।

সুকুমার হেসে বলে, "তোমার হাবভাব দেখে ভয় হয়েছিল বিবাহভঙ্গের বেশী দেরী নেই। যেমন ভারতভঙ্গের বা বঙ্গভঙ্গের বেশী দেরি নেই। তুমি দিল্লী পর্যন্ত যেতে ইচ্ছুক আছো, লণ্ডন পর্যন্তও যেতে অনিচ্ছুক হবে না, যখন দেখবে যেমন হাই কমিশনার ও আমি তাঁর অধীনে একটা পদ পেয়েছি। পুরাতন বিপ্লবী রাজবন্দিনী বলে তোমারও কদর বেড়ে যাবে, তুমিও একটা পদ পেয়ে যেতে পারো। তোমার সুবাদে আমিও আরো উচ্চ পদ পেতে পারি। হোয়াই নট ফার্স্ট সেক্রেটারি, পাবলিক রিলেশনস, ইণ্ডিয়ান এমবাসী, ওয়ারস অর প্রাগ? তুমি যেতে রাজী হলে তো? ওসব পদে স্ত্রী না নিয়ে যেতে নেই। বিশেষ করে টোকিওতে।"

"ধ্যেৎ! আমার বয়ে গেছে ডিপ্লোমাটের বাড়ীতে হস্টেস হতে। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি ব্রিটিশ নাগরিক। তোমাকে স্বাধীন ভারত সরকার ওসব পদ দেবেন না। তোমাকে পাশপোর্ট বদলাতে হবে। রণকেও। আমার কথা অবশ্য আলাদা। পুরাতন বিপ্লবী রাজবন্দিনী বলে আমার একটা হিল্লে হতে পারে। তাতে যদি তোমার কোন সুবিধে হয় আমি রাজী। কিন্তু বিদেশে নয়, দিল্লীতে কিংবা কলকাতায়।" মিলি জানায়।

"চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই," বলে মিলিও সুকুমারের সঙ্গে শান্তিনিকেতন রওনা হয়। রণ তার বাবাকে অনেকদিন দেখেনি। খুশি তো হবেই। কিন্তু দেখা গেল মা বাবা কারো প্রতি তার তেমন টান নেই, যেমন তার সমবয়সী সাথীদের প্রতি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে ছুটে পালিয়ে যায়। সাথীদের নিয়ে সে লেফট রাইট করে হাঁটে। তাদের অগ্রণী হয়ে।

"দেখছ? দেখছ? তোমার ছেলেকে দেখছ? আ বর্ন লীডার! লক্ষ করো, ওদের পা কেমন তালে তালে পড়ছে। কোথাও তালভঙ্গ হচ্ছে না। রণ না হলে কে এমন শিক্ষা দিত?" মিলি সগর্বে তাকায়।

"তাই তো ভাবছি। রণকে নিয়ে আর নীড় বাঁধা যাবে না। তিনজনের নীড়। ও আর ছোট্ট পাখীর ছানাটি নয়। উড়তে শিখেছে।" সুকুমার বলে।

"তারপর লক্ষ করেছ কি না জানিনে। বাড়ীতে ওর দাদা বা দিদি ছিল না। এখানে বড়ো মাত্রেই দাদা বা দিদি। রথীদা, প্রভাতদা, সুরেনদা, তনয়দা থেকে শুরু করে এক ক্লাস উপরে যারা পড়ে তারাও দাদা। তেমনি, ইন্দিরাদি, প্রতিমাদি, হেমবালাদি থেকে শুরু করে এক ক্লাস উপরে যারা পড়ে

তারাও দিদি। ও নিজেও তো একজন দাদা। ওর ছোট ভাই বা বোন না থাকায় দাদা বলবার কেউ ছিল না। ও এখন ছোটদের উপর দাদাগিরি ফলায়। এমনটি তুমি আর কোথাও পাবে না। এটা একটা বৃহত্তর পরিবার। শিক্ষা বলতে এসবও বোঝায়। শুধু পড়াশুনা বা খেলাধূলা নয়।" মিলি সর্বাঙ্গীন শিক্ষার পক্ষপাতী।

দিন তিনেক গেস্ট হাউসে থেকে ওরা রণের কার্যকলাপের উপর নজর রাখে। ও ছেলে ইতিমধ্যে বাংলা ভালো বলতে শিখেছে, গান গাইতে শিখছে, বৈতালিকে যোগ দেয়, মন্দিরে গিয়ে আচার্যের ভাষণ শোনে। এক এক করে ওর পাপড়িগুলি খুলে যাচ্ছে।

মিলি বলে, "ওদেশের মাটিতে ওর শিকড় লাগত না। সেইজন্যে ওকে আমি এদেশে নিয়ে এসেছি। নিজের দেশটাকে আগে ভালো করে চিনুক। নিজের ভাষাটাকে ভালো করে দোরস্ত করুক। নিজেদের সভ্যতার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হোক। তার পরে তুমি ওকে বিদেশে পড়াতে চাও তো আমি 'না' বলব না। দেখবে ও খুব তাড়াতাড়ি পিক্ আপ করবে।"

"ওর জন্যে ওর মাকেও এদেশে দশ বারো বছর আটকা পড়তে হবে। আর বাবাকে এদেশ ওদেশ করতে হবে। পারিবারিক জীবন বলতে কতটুকু থাকবে? এখন বুঝতে পারছি এদেশে কর্তব্যরত ইংরেজ অফিসারদের জীবন কেমন ছিল। স্ত্রী থাকতেন বিলেতে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খাতিরে। স্বামী থাকতেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায়। তিন বছর অন্তর একবার দেখা। যুদ্ধ বাধলে তো পাঁচ বছর বা সাত বছর অন্তর। আমার দশাও অনেকটা সেইরকম হবে, মিলি।" সুকুমার আশঙ্কা করে।

"তোমাকে কে বলছে ওদেশে ফিরে যেতে? বাবার বিজনেস কনসার্ন তো আমারও কনসার্ন। আমার যা তোমারও তাই।" মিলি আশ্বাস দেয়।

"আমার ট্র্যাজেডী তুমি কী বুঝবে, নারী!" সুকুমার নাটকীয়ভাবে বলে। "আমি একজন 'হইলে হইতে পারিতাম'। রবীন্দ্রনাথের এবিষয়ে একটি গল্প আছে।"

"কতই বা তোমার বয়স! বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ। সামনে পড়ে আছে যথেষ্ট আয়ু। বাবারই আয়ু বরং আর বেশী নেই। তাঁর কাছাকাছি থাকাটাই আরো জরুরি। মাকে অবশ্য দাদার কাছে পাঠানো যায়। বাবা

সেখানে বেখাপ। তিনি কলকাতা চলে আসছেন। সেখানে আমি ছাড়া আর কে তাঁকে দেখবে ?" মিলি উদ্বিগ্ন।

সুকুমার পোজ দিয়ে বলে, "সো আই অ্যাম আ মার্টার টু ল্যভ্।"

মিলি হেসে গড়িয়ে পড়ে। "এইজন্যেই তোমাকে এত ভালো লাগে। তুমি একজন জাত অভিনেতা। নাঃ! তোমাকে আমি ছাড়ব না। যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু ওই দিল্লী পর্যন্ত। আমার পরামর্শ শোন। দিল্লীতেই একটা কাজকর্ম জোগাড় করো। তা সে যতই ছোট হোক। তোমার উপার্জনের উপর আমরা তোমার বৌ আর ছেলে নির্ভর করিনে। ওটা তোমার পক্ষে যথেষ্ট হলেই হলো। তুমি সমস্তক্ষণ ভাবছ বিদেশে উচ্চ পদের কথা। যেটা দিতে পারবেন শুধু জবাহরলাল নেহরু। তার জন্যে পুচ্ছ ধরতে হবে তাঁর বন্ধু কৃষ্ণ মেননের। কিন্তু তুমি বিদেশে পদ পেলে কী হবে, আমি তো যাচ্ছিনে, রণ তো নয়ই। তাই বলি, তুমি কৃষ্ণ মেননের পুচ্ছ ছাড়ো। তার বদলে ধরো সুধীর ঘোষের কচ্ছ।"

"কার ? কার ?" চমকে ওঠে সুকুমার।

"সুধীরদাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে তোমার বৌ বিপ্লবী রাজবন্দিনী মধুমালতী মুস্তাফী। তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন সর্দার বল্লভভাই পাটেলের দরবারে। তাঁর হাতেই ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং। যে কাজে তোমার দক্ষতা আছে। কিন্তু, খবরদার, স্যাভিল রোর বিলিতী পোশাক পরে যেয়ো না। বিশুদ্ধ খদ্দরের ধুতী কোর্তা থাকবে তোমার পরণে, সাধারণ চপ্পল তোমার চরণে। মাথায় গান্ধীটুপী। বাতচিৎ করবে হিন্দীতে, ভুলভ্রান্তি হলে ক্ষতি নেই। অবশ্য ইংরেজীর ফোড়নও দেবে, সবাই দেন। তাতে যদি তোমার পাকা সাহেবী টান প্রকট হয় তো চাকরি বাঁধা। রেডিওতে ওঁরা পাকা সাহেবী টান পছন্দ করেন। সত্য আর অহিংসা সম্বন্ধে দুটি একটি সুভাষিতও শুনিয়ে দিতে পারো। মুখে গান্ধী, মনে ফন্দী, এইভাবে অভিনয় করবে।" মিলি নির্দেশ দেয়।

"এমন বুদ্ধিমতী বৌ যার তার চাকরি হবে না তো হবে কার ? এখন কথা হচ্ছে তুমি কি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে দিল্লী যেতে চাও ? নাটকের প্রম্পটার হতে ? সুধীর ঘোষকে আমি খুঁজে বার করব কী করে ?" সুকুমার সুধায়।

"গান্ধীজীর আশে পাশে। তিনিও তো দিল্লী যাচ্ছেন বিহারের কাজ

বাকী রেখে। আচ্ছা, তোমার যদি সঙ্কোচ বোধ হয় আমিই সুধীরদাকে বলব। কিন্তু তোমাকেই গান্ধীভক্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তুমি তো সৌম্যদা নও, যার কাছে ওটা অভিনয় নয়। সৌম্যদা কখনো চাকরির উমেদার হবে না। সে চাকরি দেবে, যদি কখনো মন্ত্রী হয়। না, তাও সে হবে না। সে গঠনকর্মী।" মিলি উত্তর দেয়।

"এককথায় আমাকে চাকরির জন্যে সৌম্য চৌধুরী সাজতে হবে। সেই ভাষায় কথা বলতে হবে। আমার ছোট্ট চড়ুই পাখী! আমার কানে ফিসফিস করে এই পরামর্শই তুমি দিচ্ছ। দিল্লীতে আমাকে দেখছি দু'রকম জীবন যাপন করতে হবে। লণ্ডনের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার নয়। সাহেবী পোশাক ও বোলচাল। পানভোজন। ধূমপান, সুরাপান। আবার দেহাতী ধুতী কোর্তা পরা গান্ধীটুপী মাথায় আশ্রমিক। ডক্টর জীকল, মিস্টার হাইড।" সুকুমার স্মরণ করে।

"অভিনয়ে তোমার যেমন ওস্তাদী, তুমি পারবে। প্রেমটাও কি তোমার অভিনয় নয়, মায়াবী?" মিলি ওকে কাছে টেনে নিয়ে সোহাগ জানায়।

"প্রেমের তুমি কী বোঝ, বালিকা? বোমা রিভলভার তো প্রেম নয়, অপ্রেম। তোমার জগতে দুটিমাত্র রং আছে। শাদা আর কালো। তোমার নীতিশাস্ত্রে দুটিমাত্র গুণ আছে। ভালো আর মন্দ। প্রেমকে বুঝতে হলে, প্রেমিককে চিনতে হলে, আরো রঙের, আরো গুণের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়।" সুকুমারও সোহাগের প্রতিদান দেয়। প্রতি অঙ্গে।

ওরা দিল্লীতে গিয়ে দেখে ইউরোপীয় বা ইউরোপীয়তর সব ক'টা হোটেলের সব ক'টা ঘরই বুক হয়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে বেশ কিছু দূরে সুইস হোটেলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই মেলে। সুকুমার চায় ভালো অ্যাড্রেস। তার যেসব ইংরেজ সহযোগী বিলেত থেকে আসবেন—কেউ কেউ এসে গেছেন —তাঁরা যেন একটা দেশী হোটেলের ঠিকানা শুনে পেছিয়ে না যান। ওর হোটেলে আসেন, আড্ডা দেন। হাঁড়ির খবর শোনান।

মিলি যা ভয় করেছিল তাই হয়। তার বামপন্থী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট নেত্রী অশোকা প্রিয়তম—উচ্চারণ প্রীতম—প্রথমেই সুধান সে কোথায় উঠেছে। সুইস হোটেলের নাম শুনে তিনি জলে ওঠেন। "এদেশের টাকা ওরা ওদেশে চালান দিচ্ছে। দেশের লোক আরো গরিব হচ্ছে। এসব জেনেও তুমি

মধুমালতী মুস্তাফী ওদের পকেট ভারী করছ। কেন, পাঞ্জাবী হোটেল কী দোষ করল? সেখানে কী আরাম কম? যত্ন কম?" তাঁর স্বামী শিখ।

"না, অশোকাদি, আরাম কম নয়, যত্ন বরং বেশী। কিন্তু আমি তো এখন মধুমালতী মুস্তাফী নই, দত্তবিশ্বাস। ইংরেজরা বলে, ডাট বিশোয়াস। সুকুমার যদি নেটিভ হোটেলে নেটিভদের চালে চলে তবে ওর ইংরেজ সহযোগীরা ওকে ওদের সঙ্গে মিশতে দেবে না। হাঁড়ির খবর শোনাবে না। আড্ডায় হাঁড়ি ভাঙবে না। ওর এদেশে আসার উদ্দেশ্যটাই মাটি হবে। ও এসেছে মাউণ্টব্যাটেনের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষক রূপে। ওর সঙ্গে আমার দিল্লী আসার কথা ছিল না। এসেছি ওর জন্যে একটা কাজকর্ম জোটাতে। কিন্তু সেটার জন্যে চাই অন্যরকম সাজপোশাক চালচলন, বাসস্থান, বন্ধুবান্ধব। ও তো হিন্দীই বুঝতে বা বলতে পারে না। দেশে যদি কাজকর্ম না পায় ওকে বিদেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমি আর ফিরে যেতে চাইনে। ফল হবে অবাঞ্ছিত সেপারেশন।" মিলি মন খুলে বলে।

"ওমা, তাই নাকি? আচ্ছা, আমি চিন্তা করে দেখি কী করতে পারি। আমরা তো অপোজিশনের অপোজিশন। কংগ্রেসকে যদি অপোজিশন বলো। এই মুহূর্তে কংগ্রেস তা নয়। কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে? কংগ্রেস যদি কেবলমাত্র পদত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় থাকে আমাদের কর্তব্য হবে তাকে নাড়া দেওয়া। সে যদি তাতেও না নড়ে আমরা একাই এগিয়ে যাব। মিউটিনি আদি ঘটাব। তোমার উপরে আমরা নির্ভর করি, মধু। বেঙ্গলে আমাদের মহিলাকর্মী তেমন নেই। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তোমাকে আমরা খুব মিস করেছি। পরের বার তুমি আমাদের বঞ্চিত করবে না তো?" অশোকাদি সস্নেহে সুধান।

"পরের বার বলে কিছু থাকলে তো? মাউণ্টব্যাটেন যে ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ করতেই এসেছেন। ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন। কালবিলম্ব করেননি। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন তাঁরাই জেনেছেন যে ইংরেজদের চলে যেতে আর একটা বছরও লাগবে না। বিশ্বাস করা কঠিন, বার বার বিশ্বাস করে ঠকে গেছি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আমরা কুইট না করতে বললেও ওরাই কুইট করবে। মিউটিনি আমরা করব কার বিরুদ্ধে? দেশী সিপাইদের এক অংশের বিরুদ্ধে? হিন্দু বনাম মুসলিম? মুসলিম বনাম শিখ? জনগণকেই বা কার বিরুদ্ধে লড়তে বলব? হিন্দু বনাম

মুসলিম ? মুসলিম বনাম শিখ ? গণ সত্যাগ্রহই বা কার বিরুদ্ধে কে করবে ? লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ? দক্ষিণপন্থীর বিরুদ্ধে বামপন্থী ? আমাদের থীসিসের প্রথম কথাই তো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে হটাতে হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যদি নিজেই হটে যায় তাকে হটানোর প্রশ্নই ওঠে না। তার হাত থেকে রাজদণ্ড হস্তান্তরের প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্নটার উত্তর চাইছেন মাউণ্টব্যাটেন। এর উত্তর গান্ধী একভাবে দিচ্ছেন, জিন্না আরেকভাবে।" মিলি যতদূর জানে।

অশোকাদি বলেন, "শুনেছি। গান্ধীজী প্রস্তাব করেছেন জিন্না সাহেবই নতুন শাসনপরিষদ্ গড়বেন ও ভারতরাষ্ট্র চালাবেন। জিন্না সাহেব বলেছেন, ভারতরাষ্ট্র নয়, পাকিস্তান পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করা মানে তো মাস্টার তারা সিংকে অসন্তুষ্ট করা। কাজেই এসব কথাবার্তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক। ইংরেজরা কারো হাতে ভার দিয়ে চলে যেতে পারে না। না দিয়েও চলে যেতে পারে না। ওরা থাকছেই, সুতরাং আমাদের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা সে ভূমিকাও থাকছে। আমরা হস্তান্তর চাইনে। আমরা লাল কেল্লা দখল করব। সৈন্যদলের সাহায্যে। জনগণের সাহায্যে। পার্টির সাহায্যে।"

মিলি উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু ভিতর থেকে তেমন সায় পায় না। "অশোকাদি, আপনি বোধহয় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা জানেন না। লাল কেল্লা দখল করেও আপনারা তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। মুসলিম লীগও ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি দখল করবে। পূর্ববঙ্গ গেলে আসামও যাবে। লাল কেল্লা থেকে গৌহাটী বহু দূর। মুসলিম লীগের পেছনেও সৈন্যদল ও জনগণ। সিভিল ওয়ার বাধবেই। রাশিয়া তার সুযোগ নিতে পারে। আমরা রুশপন্থী নই, কমিউনিস্ট নই। আমাদের কী লাভ ?"

"ঝুঁকি নিতে হবে, শুধু। নো রিস্ক নো গেন। যা কিছু হারাব তা পাঁচ বছরের মধ্যেই জিতে নেব। সিভিল ওয়ারকে এত ভয় কেন ? এমন কোন্ দেশ আছে যে দেশে সিভিল ওয়ার হয়নি ? আমরাও সিভিল ওয়ারের ভিতর দিয়ে যাব। তার শেষে আরো সংহত হব। এই হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব চিরতরে মিটবে। সেই সঙ্গে শিখ মুসলমানের বিরোধও। রক্তপাত ? তা রক্তপাত একটু হবে বইকি। চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে চল্লিশ লক্ষের মৃত্যু এমন কিছু বেশী ক্ষতি নয়। সেদিন দুর্ভিক্ষেও তো ত্রিশ লক্ষ মারা গেল।

আমেরিকার জনসংখ্যা যখন তিন কোটি ছিল তখন দশ লক্ষ লোক সিভিল ওয়ারে প্রাণ দিয়েছিল। পঞ্চাশ লক্ষ জখম হয়েছিল। তার ফলে আমেরিকা এখন মহাশক্তিমান হয়েছে। পৃথিবীর মহত্তম শক্তি। ভারতও তেমনি এক মহাশক্তি হবে, যদি সিভিল ওয়ারের ভিতর দিয়ে যায় ও অবিভক্ত থাকে। ক্ষমতার হস্তান্তর কথাটার মধ্যে একটা আপস-আপস ভাব আছে। আপস না করলে হস্তান্তর হয় না। ব্রিটেন কি বিনা শর্তে হস্তান্তর করবে? কোথাও করেছে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। তুমি দেখবে মাউন্টব্যাটেন সুকৌশলে শর্তাধীন স্বাধীনতা দিয়ে যাবেন। ওই জাতটাকে চিনতেন একমাত্র নেতাজী সুভাষ। আর কেউ না। গান্ধীজীও না। নেহরু তো নয়ই। এঁরা ইংরেজদের বন্ধু। ইংরেজদের মধ্যেও এঁদের বন্ধু আছেন। সেইজন্যে এঁদের আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে নেতাজী আজ এদেশে নেই। আশঙ্কা হচ্ছে যে হস্তান্তর একভাবে না একভাবে হয়ে যাবে। পার্টিশনের ভিত্তিতে হতে পারে। কতক নেতা আবার পাঞ্জাব পার্টিশনের জন্যেও ক্ষেপেছেন।" অশোকাদি দুঃখ করেন।

"বেঙ্গল পার্টিশনের জন্যেও।" মিলি যোগ করে।

"শুনে অবাক হচ্ছি, ভাই। তা হলে শতাব্দীর গোড়ায় অত বোমাবাজি করার দরকারটা কী ছিল? ক্ষুদিরাম, বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর প্রভৃতির আত্মত্যাগ বৃথা। আমি বাংলার বাইরেই থাকি। বাইরেই আমার বিয়ে। আমার কর্মক্ষেত্রও বাইরে। বিয়াল্লিশে কিছুদিন কলকাতায় ছিলুম, এই যা সম্পর্ক। তোমরা কিছুতেই বাংলা ভাগ হতে দিয়ো না। দিলে ওটা হবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি বিট্রেয়াল। তোমার নিজের প্রতিও। নেতাজী নেই বলে কি আর কেউ নেই?" অশোকাদি বিস্মিত হন।

মিলি সেই মাপের আর কারো নাম করতে পারে না। মৌন থাকে।

সুকুমার যখন ভিতরের খবর সংগ্রহের জন্যে বেরিয়ে যায় তখন মিলিও বেরয় দিল্লী শহর ঘুরে ফিরে দেখতে। আগেও দেখা ছিল, কিন্তু তন্ন তন্ন করে নয়। অশোকাদি তাকে তাঁর নিজের গাড়ীতে করে নিয়ে যান। নিজেই চালান।

"আমাদের হাতে রাজক্ষমতা ফিরে এলে আমরা আবার লাল কেল্লার ফিরে যাব। লাল কেল্লাই আমাদের ক্রেমলিন। পরিতাপের বিষয় মিউটিনির সময় ইংরেজরা তার আবাসিক অংশটা তোপ দিয়ে উড়িয়ে

দিয়েছে। আমরা আবার সেটা গড়ে তুলব। পুরাতন দিল্লীই আসল দিল্লী। সেটা আমাদের গৌরব। তার একটা ঐতিহ্য আছে। সেটা অন্তত এক হাজার বছরের। প্রথমে রাজপুত, তারপরে পাঠান বা তুর্ক, তারপরে মোগল। মহাভারত যদি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বলে গণ্য হয় তবে এই দিল্লীই সেই ইন্দ্রপ্রস্থ। তা হলে এর উদ্ভব তিন হাজার কি চার হাজার বছর পূর্বে। কার সঙ্গে কার তুলনা! বাঘের সঙ্গে বিল্লীর। পুরাতন দিল্লীর সঙ্গে নতুন দিল্লীর! নতুন দিল্লী আমাদের অগৌরবের নিদর্শন। এটা হচ্ছে ব্রিটিশ অকুপেশনের প্রতীক। যতদিন ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের মাটিতে থাকবে ততদিন ভারত একটি অকুপায়েড কান্ট্রি। নাৎসী অকুপেশনে ফরাসীদের মতো আমরা বাস করছি ব্রিটিশ অকুপেশনে। ওই বড়লাট ভবনে আমাদের সম্মানের স্থান নেই। ওই নর্থ ব্লক আর সাউথ ব্লকেও আমাদের শীর্ষস্থান নয়। ওই আইন সভাতেও একদল ইউরোপীয় বসে আছে, তারা এ দেশের লোকের প্রতিনিধি নয়। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী। উর্দু কবি আকবর যথার্থই বলেছেন,

'মহফিল উনকী সাকী উনকা
আঁখো মেরি বাকী উনকা।'

ওদেরই ভোজ, ওদেরই পরিবেশক। চোখ শুধু আমাদের। আর সব ওদেরই। আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে নতুন দিল্লীকে আমরা তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেব। না, তার সমস্তটা নয়। তার খাঁটি বিলিতী অংশটাকে। যেখানে বাস করে ওরা ভাবে ওরা বিলেতে বাস করছে।" অশোকাদি রাগত স্বরে বলেন।

মিলি চিন্তা করে বলে, "তা হলে গত তিনশো বছর ধরে বণিক বা শাসক হিসাবে ওরা যেখানে যা কিছু গড়েছে তা তোপ দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়। আর এটা কেবল ইংরেজদের বেলা কেন, পাঠান বা তুর্কদের বেলা কেন নয়? মোগলদের বেলা কেন নয়? লাল কেল্লাটাই বা কেন বাদ যাবে?"

অশোকাদি একটু চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলেন, "তফাৎ আছে। ইংরেজরা এদেশে বাস করতে আসেনি, এদেশের অধিবাসী হয়নি। ধন সঞ্চয় করে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। আর মোগল পাঠান তুর্করা এদেশে বাস করতেই এসেছে, এদেশের অধিবাসী বনে গেছে। ওরা যেন এদেশের অ্যাংলো-স্যাকশন ও নরম্যান। আর ইংরেজরা যেন রোমান। রোমান অপসরণের মতো ব্রিটিশ অপসরণও একদিন ঘটবে। কিন্তু মোগল পাঠান বা

তুর্ক অপসরণ কোনদিন ঘটবে না। কাজেই লাল কেল্লা আমাদের গৌরবের বস্তু, নতুন দিল্লী তা নয়। ওই পঞ্চম জর্জের মূর্তির উপযুক্ত স্থান তাঁর স্বদেশ। সেটা এদেশের মাটিতে কেন? সেটাকেও ওখান থেকে সরাতে হবে। মোগল পাঠান তুর্ক আমল হিন্দুদের পক্ষে অগৌরবের হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক অর্থে ভারতের পক্ষে গৌরবের। দেশের বহু অংশে হিন্দু রাজারাও রাজত্ব করতেন। তামিলরা, মালয়ালীরা, অহোমরা, আসামের পার্বত্য জাতিরা বরাবরই সুলতান ও বাদশাদের ধারা অবিজিত। ভারতবর্ষ সামগ্রিক অর্থে পরাধীন হয় ব্রিটিশ অধিকারের সময়ই। ইংরেজরাই একটার পর একটা খণ্ড ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করেছে। জুড়ে জুড়ে অখণ্ড করেছে। তার জন্যে তাদের ক্রেডিট দিই। যদি অখণ্ড রেখে যায় তবে আরো ক্রেডিট দেব। কিন্তু পরাধীনতার চিহ্ন মুছে ফেলব। ভাবীকালকে জানতে দেব না যে পরাধীন ছিলুম।”

“কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, ভারত জুড়ে ইংরেজদের যেসব কীর্তি আছে, যেমন দিল্লীর বড়লাট ভবন বা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এসব কি ওদের আমলের পরে আমরা সংরক্ষণ করব না?” মিলি জানতে চায়।

“ওদের আমল আবার কী? ওদের অকুপেশন, বলো। যত দীর্ঘ হোক না কেন ওটা একটা বহিঃশক্তির অকুপেশন বই তো নয়। ওদের প্রত্যেকটি স্ট্যাচুকেই ধূলিসাৎ করা উচিত। কলকাতার গড়ের মাঠের উট্রামের সেই অশ্বারোহী স্ট্যাচুকেও। ওই যে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট ওটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে হবে। অকটারলোনী যখন দিল্লীতে ছিল তখন তার হারেমে থাকত তেরোজন বিবি। ব্রিটিশ অকুপেশনের কোনো চিহ্নই আমরা রাখব না। তবে সেনেট হাউস সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সম্পর্কেও। শিল্পমাত্রেই বিশ্বজনীন। যেখানেই দেখবে শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সেখানেই তা সংরক্ষণ করবে। অকুপেশনের আমলের হলেও।” অশোকাদি ব্যতিক্রম মানেন।

“উট্রামের অশ্বারোহী স্ট্যাচুটাও কি উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়?” মিলি প্রশ্ন করে।

“ঘোড়াটা, হ্যাঁ। সওয়ারটা, না। ঘোড়াটা রেখে তার উপর নেতাজীকে বসাতে হবে।” অশোকাদি উত্তর দেন।

“তা ওদের অকুপেশনে কত ভালো কাজ হয়েছে, কতক ওদের দ্বারা, কতক ভারতীয়দের দ্বারা, আমরা কি আস্ত আমলটাকেই ইতিহাসের বই

থেকে মুছে ফেলব? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ এঁদের কীর্তিকেও?" মিলির জিজ্ঞাসা।

"ইতিহাসে ব্রিটিশ আমল বলে কিছু থাকবে না। লেখা হবে বিদেশী অকুপেশন। যেমন ফ্রান্সে নাৎসী অকুপেশন। নাৎসী অকুপেশনেও পিকাসো অপূর্ব সব ছবি এঁকেছেন, তা বলে কি ফ্রান্সের ইতিহাসে নাৎসী অকুপেশনের জন্যে একটা অধ্যায় নির্দিষ্ট থাকবে? ভারতের ইতিহাসের এই দেড়শো বছর ফ্রান্সের ইতিহাসের পাঁচ বছরের মতোই মন থেকে মুছে ফেলার যোগ্য। তবেই আমাদের ছেলেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আমাদের মতো মাথা হেঁট করে নয়।" অশোকাদির উত্তর।

মাউণ্টব্যাটেন দম্পতীর নিমন্ত্রণে সুকুমার ও মিলি বড়লাট ভবনের সংলগ্ন মোগল উদ্যানে অনুষ্ঠিত গার্ডেন পার্টিতে যায়। কে নেই সেখানে? হিন্দু মুসলমান, শিখ, বাঙালী, মারাঠা, দক্ষিণী, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, নারী, পুরুষ। ছোটখাটো একটা মাঘমেলা। মাঘমেলায় ভিন্ন ধর্মের লোক থাকে না। এখানে তাও আছে। কংগ্রেসের অধিবেশনে ভিন্ন ধর্মের লোক থাকে, কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা থাকে না।

"মিলি, এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। ইংরেজরা যত জাতের, যত ধর্মের, যত ভাষার, যত অঞ্চলের স্ত্রী পুরুষকে একত্র করতে পেরেছে ভারতের ইতিহাসে আর কেউ তত পারেনি। এই একত্রতা ওদের সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে। আর ফিরে আসবে না। ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে ব্রিটিশ আমলই একমাত্র অধ্যায় যখন এটা সম্ভব হয়েছিল। আমরা কেবল ঝগড়া করতেই জানি। মিলতে ও মেলাতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শুধু কবিতায়।" সুকুমার আবেগের সঙ্গে বলে।

মিলি লক্ষ করছিল মাউণ্টব্যাটেন দম্পতীকে। সকলের সঙ্গে সমানে মিশছেন। কোনো হামবড়া ভাব নেই। ভিড়ের মধ্যে তাঁরা অকুতোভয়। খুন করতে চাইলে ঠেকাত কে? কিন্তু সে ভাবনাই মাথায় আসে না। ওঁরা এসেছেন হৃদয় হরণ করতে। রেশমের ডোরে বাঁধতে। ক্লাইভের স্মৃতি মুছে দিতে।

লেডী মাউণ্টব্যাটেন মিলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কুশলপ্রশ্ন করেন ও বলেন, "আপনি কি যুদ্ধের সময় লণ্ডনে ছিলেন?"

মিলি থতমত খেয়ে মাথা নাড়তেই তিনি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। সুকুমার তো হাঁ!

॥ পনেরো ॥

সুপ্রকাশ পাকড়াশী যূথিকার কাছে মাফ চায়। "সেবার সময় করে উঠতে পারিনি বলে আপনাকে সেলাম দিয়ে যেতে পারিনি, মিসেস মালিক। আশা করি কিছু মনে করেননি।"

যূথিকা অভিমান করে! "জানি কারণটা কী। আমরা চা, কফি, ফলের রস ভিন্ন আর কিছু অফার করিনে। তাও দ্রাক্ষাফলের রস নয়। ওসব আমরা রাখিনে।"

হাসাহাসি পড়ে যায়। সুপ্রকাশ বলে, "কিন্তু আপনার বাড়ীতে স্মেলিং সল্ট তো রাখেন। না তাও রাখেন না?"

যূথিকা চমকে ওঠে। "কেন? স্মেলিং সল্ট কার দরকার?"

"মানসের দরকার হতে পারে। আমারও দরকার হয়েছিল। লাখ দুয়েক টাকা হাতছাড়া হলে কে না মূর্চ্ছা যায়!" সুপ্রকাশ রহস্য করে।

"লাখ দুয়েক টাকা!" যূথিকা অবাক। "বুঝতে পারছিনে।"

মানস বুঝতে পেরেছিল যে ক্ষতিপূরণের কথা হচ্ছে। "ক্ষতিপূরণ তা হলে আমরা কেউ পাচ্ছিনে?"

"কেউ পাচ্ছে না ঠিক নয়। পাচ্ছে যাদের রং ধলা। পাচ্ছে না যাদের রং কালা। স্বাধীনতার আরম্ভ হচ্ছে বর্ণবৈষম্য দিয়ে। আহা, কী আছে দিন না একটু! কমলা লেবুর রস? তাই সই।" সুপ্রকাশ কপট কাতরোক্তি করে।

যূথিকা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মানস বলে, "আমি জানতুম আমার কপালে শিকে ছিঁড়বে না। আমাকে আনুপাতিক পেনসন নিয়েই সরে পড়তে হবে। কোথায় বসব সেইটেই ভাবনা। যেখানে সব কিছু সস্তা।"

"তেমন স্থান ভূভারতে নেই। তুমি ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে পারো। পেনসনটা সেখানেও ড্র করতে পারবে। পাউণ্ডের দাম আছে। টাকার দাম তো দিন দিন কমছে।" সুপ্রকাশ বলে।

"নাঃ! তা হয় না। আমি বাংলাভাষার লেখক। পাঠকের সঙ্গে

প্রকাশকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চাই। লোকে বলবে দেশদ্রোহী।” মানস অনিচ্ছুক।

“যাক, তুমি মূর্ছা যাওনি, এই যথেষ্ট। আমার সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে। লাখ দুয়েক টাকা ইনভেস্ট করে কোনো একটা বনেদী ফার্মের পার্টনার বা ডিরেক্টর হয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব স্থির করেছিলুম।, কিন্তু বাদ সাধলেন বল্লভভাই পাটেল। তিনি ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব শুনে আকাশ থেকে পড়েন। ক্ষতিপূরণ! কিসের ক্ষতিপূরণ! নতুন সরকার তো পুরাতন সরকারের প্রত্যেকটি অফিসারকে বহাল রাখতে রাজী। ইউরোপীয় ভারতীয় নির্বিশেষে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ যেতে চান ক্ষতিপূরণ তো তিনিই দেবেন। কারণ তিনিই নতুন সরকারের ক্ষতি করে যাচ্ছেন। বহুদর্শী অভিজ্ঞ অফিসার আমরা পাব কোথায়? সে শূন্যতা পূরণ হবে কাকে দিয়ে? তিনি কিছুতেই ধরাছোঁয়া দেবেন না। পরে ভেবেচিন্তে বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হয় দেবেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্ট নয়! কভেনাণ্ট তো সেক্রেটারি অভ্ স্টেটের সঙ্গে। ব্রিটেন স্বীকার করে যে কথাটা ঠিক। কিন্তু ব্রিটিশ ট্রেজারি জানিয়ে দেয় ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড না কত বহন করার সামর্থ্য ব্রিটিশ ট্রেজারির নেই। শুধু ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস তো নয়, ইণ্ডিয়ান পুলিশ, ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিস, আরো দুটো একটা সার্ভিসও সংশ্লিষ্ট। ফাইল আবার ভারত সরকারের কাছে ঘুরে আসে। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর এই স্থির হয় যে ক্ষতিপূরণ শুধু ইউরোপীয় অফিসাররাই পাবেন।” সুপ্রকাশ বিবরণ দেয়।

যূথিকা ততক্ষণে কিছু খাদ্য পানীয় নিয়ে ফিরে এসেছে। পরিবেশন করতে করতে বলে, “ওই লুটেরাদের বরাবরের জন্যে বিদায় দেওয়া হচ্ছে, এর মতো সুখবর আর কী আছে? ন্যায্য বিচারই হয়েছে।”

“আপনি বলছেন ন্যায্য বিচার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী পর্যন্ত বলেন ফেয়ার নয়। ভারতীয়রাও সমান যোগ্যতার সঙ্গে কাজকর্ম করেছেন, সমান ঝুঁকি নিয়ে বেআইনী কার্যকলাপ দমন করেছেন, চুক্তিও তো উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তবে একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? আপনিই বলুন, মিসেস মালিক।” সুপ্রকাশ শুনতে চায়।

“তা হলে অ্যাটলী মহোদয়ই বা হস্তক্ষেপ করেন না কেন? কিছুই তো তাঁর অমতে হতে পারে না।” যূথিকা তর্ক করে।

"ঠিক। কিন্তু ব্রিটিশ ট্রেজারি প্রতিকূল। তার চেয়েও প্রতিকূল বল্লভভাই পাটেল, ভারত সরকারের হোম মেম্বর ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের প্রধান। সর্দারজী সাফ জানিয়ে দেন যে তিনি থাকতে একজনও ভারতীয় ক্ষতিপূরণ পাবে না। মজার কথা লিয়াকৎ আলী খান্‌ও তাঁর সঙ্গে একমত। যদিও আর সব বিষয়ে ভিন্নমত। সর্দারজী বলেন, ভারতীয় অফিসারদের মতলব ভালো নয়। ওরা ক্ষতিপূরণের টাকা পকেটে পুরে সরকারের সঙ্গে আরো তেজের সঙ্গে বার্গেন করবে। মাথায় চড়ে বসবে। ওরা যে মাস্টার নয়, সার্ভ্যাণ্ট এটা ওদের সমঝিয়ে দেওয়া দরকার। ইউরোপীয় অফিসাররা ইণ্ডিয়ানও ছিল না, সিভিল ছিল না, সার্ভ্যাণ্টও ছিল না। ইণ্ডিয়ান অফিসাররাও তাদেরি ধারা ধরেছিল। এখন থেকে ইণ্ডিয়ানও হবে, সিভিলও হবে, সার্ভ্যাণ্টও হবে।" সুপ্রকাশ শোনায়।

যুথিকা হাততালি দিয়ে বলে, "সাবাশ! সর্দারজী, সাবাশ!"

মানস কিন্তু শুনে সুখী হয় না। বলে, "সিভিল মানে এক্ষেত্রে অসামরিক। অর্থাৎ মিলিটারি নয়। আর সার্ভ্যাণ্ট মানে এক্ষেত্রে সেবক। গোখলের সার্ভ্যাণ্টস অভ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য। তাঁরা কারো চাকর নন। তেমনি, আমরাও চাকর হইনি, সেবক হয়েছি। নতুন সরকার যদি চাকরের মতো ব্যবহার করেন তো আমার সরে যাওয়ার সেটাও হবে একটা কারণ। যারা মাথা হেঁট করে শাসনকার্য চালায় কেউ তাদের ভয়ও করে না, ভক্তিও করে না। কংগ্রেসেরই মাথা হেঁট হবে।"

এর পরে অন্য প্রসঙ্গ। যুথিকা জানতে চায় পার্টিশন হলে বাংলাদেশও কি বিভক্ত হবে? তাই যদি হয় তবে কলকাতা কার ভাগে পড়বে?

"এ নিয়ে তীব্র মতভেদ। হিন্দুরা অবশ্য চায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ুক। যেহেতু কলকাতা হিন্দুপ্রধান শহর। মুসলমানরা বলে, বঙ্গভঙ্গ আদৌ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি হয় কলকাতা পূর্ববঙ্গকে দিতে হবে। যেহেতু কলকাতা হুগলী নদীর পূর্ব তীরে। আর হুগলী নদীই দুই বঙ্গের প্রাকৃতিক সীমান্ত রেখা। গভর্নরের মতে কলকাতা গড়ে উঠেছে পূর্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তের ধনসম্পদে। তার উপর উভয় প্রান্তের ন্যায্য দাবী। সুতরাং কলকাতা হবে ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রী সিটি। উভয় প্রান্তই অবাধে আমদানী রফতানী করবে। আমদানী শুল্ক রফতানী শুল্ক উভয়েই সমানভাবে ভাগ করে নেবে। আয়করের টাকারও দুই সমান ভাগ হবে। কলকাতার শাসন

পরিষদে দুই প্রান্তের প্রতিনিধিসংখ্যাও হবে সমান সমান।" সুপ্রকাশ বলে।

যূথিকা আবার হাততালি দেয়। "সাবাশ, লাটসাহেব।"

মানস হেসে উড়িয়ে দেয়। "কলকাতা হবে আরো একটা বার্লিন। সেখানে রুশে মার্কিনে ইংরেজে ফরাসীতে এই নিয়ে ঝগড়া বেধে গেছে। শেষে শহরটা দু'ভাগ হয়ে না যায়! জার্মানী দেশটার মতো। যেখানে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ সেখানে প্রত্যেকটি শক্তিকেন্দ্র নিয়ে ঝড় উঠবে। ভোটের জোরে যার নিষ্পত্তি হবে না গায়ের জোরে তার নিষ্পত্তি হবে। একপক্ষ ডেকে আনবে আজাদ হিন্দুস্থান ফৌজকে, আরেক পক্ষ ডেকে আনবে আজাদ পাকিস্তান ফৌজকে। পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ তো হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। ফৌজ দুটো থাকবে আনাচে কানাচে। গায়ের জোরেও যদি নিষ্পত্তি না হয় তবে ফের সেই ইংরেজকেই ডাক পড়বে। তার যুদ্ধজাহাজও তো আনাচে কানাচে।"

সুপ্রকাশ তর্ক করে না। "কলকাতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত একান্ত কঠিন বলেই মাউণ্টব্যাটেন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তটা বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের উপর ছেড়ে দিতে চান। তাঁরাই স্থির করবেন বাংলাদেশ বিভক্ত হবে না অবিভক্ত থাকবে। অবিভক্ত থাকলে কলকাতা নিয়ে ঝড় ওঠার উপলক্ষ নেই। গভর্নমেণ্ট হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার, হাইকোর্ট যেমন আছে তেমনি থাকবে। প্রশ্ন উঠবে ফোর্ট উইলিয়াম, জেনারল পোস্ট অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, হাওড়া ও শিয়ালদা রেল স্টেশন, দমদম এয়ারপোর্ট নিয়ে। এসব হলো কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকা। কিন্তু কোন্ কেন্দ্রীয় সরকারের? হিন্দুস্থান না পাকিস্তান না দুই? বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম যদি হয় তবে বাংলাদেশ সরকারের। এই পয়েণ্টে পণ্ডিত জবাহরলালের তীব্র আপত্তি। প্রদেশগুলো এক এক করে বেরিয়ে যেতে পারে। দেশীয় রাজ্যগুলো তো বাইরেই রয়েছে। তবে কি ইংরেজ বর্জিত ভারত হবে আরো একপ্রস্থ বলকান রাষ্ট্র? তাঁর কথা হলো, বাংলাদেশ যদি অবিভক্ত থাকে তবে তাকে হয় ভারতের সামিল হতে হবে। পাকিস্তানের সামিল হতে দিতে হিন্দুরা নারাজ। আর হিন্দুস্থানের সামিল হতে দিতে মুসলমানরা। যেমন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ বিভক্তই হবে। এবার রাজার ইচ্ছায় নয়, প্রজার ইচ্ছায়।"

"কিন্তু তা হলে কলকাতার কী হবে? সে কার ভাগে পড়বে? এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের কী সিদ্ধান্ত?" যুথিকা সুধায়।

"এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের উপর। সেটা এখনো অনিশ্চিত। বাংলাদেশ ভাগ করাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে সীমান্ত-রেখা নির্ণয়ের জন্যে কমিশন বসবে। কমিশনের রায় যে কেমন হবে তা কে বলতে পারে? কমিশনের চেয়ারম্যান যদি উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ বিচারক হয়ে থাকেন তবে কলকাতা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গই পাবে। কারণ জনসংখ্যাই প্রধান নিয়ামক। জনসংখ্যার ভিত্তিতেই দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ হচ্ছে। হুগলী নদীর দুই তীরেই হিন্দু মেজরিটি। এক মুর্শিদাবাদ ব্যতীত। তবে এই পয়েণ্টে কতকটা অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে।" সুপ্রকাশ স্বীকার করে।

"যেমন দেখছি কলকাতা নিয়ে একটা যুদ্ধ্টুদ্ধ্ না বাধে! কমিশনের রায় যে পক্ষের বিরুদ্ধেই যাবে সে পক্ষই হুঙ্কার ছাড়বে, লড়কে লেঙ্গে কলকত্তা। এবার শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, কামান বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ্। শুনছি সেটা হবে ব্যাটল ফর ক্যালকাটা। তার প্রস্তুতি এখন থেকেই চলেছে। দিনও নাকি ধার্য হয়েছে দোসরা না তেসরা জুন।" যুথিকা বলে।

"হ্যাঁ, গভর্নরও বলছেন তিনি এবার বসে আছেন বারুদের পিপের উপর নয়, গোলাগুলীর ভাণ্ডারের উপর। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তার কাছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং তুচ্ছ। গ্রেটার ক্যালকাটা ম্যাসাকার আসন্ন। আমরা ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছি।" সুপ্রকাশ বলে।

"কলকাতা যদি জলে ওঠে তার আগুনের হল্কা লেগে পূর্ববঙ্গের গ্রাম গঞ্জ জলে উঠবে। সে দাবানল নির্বাপন করবে কে? পাকিস্তান যতদিন অনিশ্চিত ছিল ততদিন মুসলিম অফিসারদের সহযোগিতা সুনিশ্চিত ছিল। এখন তাঁরা মুসলিম মহলে আনপপুলার হতে চান না। পাকিস্তান হলে চাকরি হারাবার ভয়। আর হিন্দু অফিসারদের মনের কথাটা চাচা, আপনা বাঁচা। যেখানে শতকরা পঁচানব্বই জন মুসলমান সেখানে শতকরা পাঁচজনকে বাঁচাতে গেলে নিজেরাই বাঁচবেন না। একমাত্র ইউরোপীয় অফিসারদেরই মনোবল অটুট। তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তবু তাঁরা তাঁদের রাজত্বের শেষদিনটি অবধি দাপটের সঙ্গে শাসন করে যাবেন। তাঁদের খুঁটির জোর ততদিন ব্রিটিশ বেয়োনেট যতদিন। তারপরে তাঁরাও অসহায়। তুমি এসেছ সব দেখে শুনে রিপোর্ট

পেশ করতে। ফিরে গিয়ে কর্তাদের বোলো দোসরা কি তেসরা জুন কলকাতায় যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা না বাধে।” মানসের অনুরোধ।

“পূর্ববঙ্গ এখন মুসলমান’স ল্যাণ্ড। কলকাতা কিন্তু নো-ম্যান’স ল্যাণ্ড। কলকাতা গেলে তুমি চিনতে পারবে না যে এই সেই কলকাতা, দেড়শো বছর ধরে যে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। কলকাতায় গেলে যা দেখবে তা ব্রিটিশ রাজ নয়, হিন্দু রাজ নয়, মুসলিম রাজও নয়, গুণ্ডা রাজ। আমরা জানি মনার্কি কাকে বলে, অ্যানার্কি মানে কী, কিন্তু এখন যা চলছে তার জন্যে একটা নতুন ইংরেজী শব্দ কয়েন করতে হবে। গুণ্ডার্কি। বস্তুটা শহীদ সুহরাবর্দীর পেটেন্ট। কিন্তু সে পেটেন্ট জাল হয়েছে। দিনের বেলা যিনি ভদ্রলোক রাতের বেলা তিনি গুণ্ডা। পুলিশের কাছে প্রোটেকশন চাইলে তুমি পাবে না, তোমাকে যেতে হবে গুণ্ডার কাছে প্রোটেকশন চাইতে। গুণ্ডারাই এখন সমাজের রক্ষক। রক্ষকবেশী ভক্ষক। কলকাতা থেকে অস্ত্র আইন উঠে গেছে। লাইসেন্স না নিয়ে যে-কোন লোক পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, স্টেন গান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে। তাকে পাকড়াবে কে? পুলিশের ঘাড়ে ক’টা মাথা? লাটসাহেব মিলিটারি মোতায়েন করেছেন। কিন্তু মিলিটারি তো ঘরে ঘরে গিয়ে সার্চ করতে পারে না। সেটা পুলিশেরই কাজ। গভর্নর বলছেন কলকাতা হবে ফ্রী সিটি। তার মানে কি সেখানে ‘ফ্রী ফর অল’? যার খুশি সে অস্ত্র নিয়ে যাকে খুশি তাকে খুন করবে, জখম করবে? তার বাড়ী লুট করবে, দোকানে আগুন দেবে? কলকাতাকে ঠাণ্ডা করলে পূর্ববঙ্গও ঠাণ্ডা হবে, এটা তো অতি সরল যুক্তি। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে? ধরতে পারত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, যদি ল অ্যাণ্ড অর্ডার তার সাবজেক্ট হতো। কিন্তু সে ক্ষমতা হোম মেম্বর বল্লভভাই পাটেলের নেই। ইন্টারিম গভর্নমেন্টটা কংগ্রেস গভর্নমেন্টও নয়। কলকাতাকে কণ্ট্রোল করতে হলে দিল্লীতে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে তার এলাকাভুক্ত করতে হবে। আর কলকাতাকে করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সামিল। মুসলিম লীগের দাবী সরাসরি নস্যাৎ করতে হবে। লীগ মন্ত্রীদের কলকাতা থেকে হটাতে হবে। ঢাকায় তাঁরা নতুন করে সংসার পেতে বসুন। পূর্ববঙ্গ হয়েছে ও হবে মুসলমান’স ল্যাণ্ড। হোক তার নতুন নাম পূর্ব পাকিস্তান, লোকে যদি পছন্দ করে। নামে কী আসে যায়! আমি অত খুঁতখুঁতে নই। মোট কথা কলকাতা পেতে হলে ও তাকে সভ্য মানুষের

বাসযোগ্য করতে হলে বাঙালী হিন্দুদের পূর্ববঙ্গের মায়া কাটাতে হবে। আমি অনেক দুঃখেই একথা বলছি। আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গেই। আমার পক্ষে এটা একটা ফুসফুস কেটে ফেলারই সামিল।" সুপ্রাশের গলা ধরে আসে।

"পূর্ববঙ্গের মায়া কাটানো কি এতই সহজ? আমার যৌবনের সেরা বছরগুলি কাটিয়েছি এখানে। আর তোমার আমার মতো যাদের বদলীর চাকরি তারাই তো সবাই নয়। সওয়া কোটি হিন্দু যাবে কোথায়? যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে। প্রোটেকশনের জন্যে মুসলমান প্রতিবেশীদের কাছেই যাবে। পুলিশের কাছে নয়, মিলিটারির কাছে নয়। আর ওরাও তো মুসলমান। হিন্দুকে মুসলমান না বাঁচালে কে বাঁচাবে? সাধারণ মুসলমান এখনো সহৃদয়। জানিনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর কতদিন সহৃদয় থাকবে। যখন তার পাঞ্জাবী, গুজরাটী, বিহারী ভাই সাহেবরা এসে জুটবেন। আমার সাধ্য থাকলে আমি তাকে বোঝাতুম যে এটা বাঙালীদের সকলের ল্যাণ্ড। তাই এর নাম বাংলাদেশ। একে মুসলমানদের দেশে পরিণত করাটা বাঙালীদের সবাইকে তাদের জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা। হাজার হাজার বছর পরে কেন তারা তাদের জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে? বাঙালী মুসলমানরা যদি ধর্ম ছাড়া আর কিছু না বোঝে তবে তারা নিজেদের প্রতিই শত্রুতা করবে। আরব বলো, ইরানী বলো, তুর্ক বলো সকলেরই স্বকীয় সংস্কৃতি আছে। শুধু এদের নেই, যেহেতু এরা বাঙালী নয়, পাকিস্তানী।" মানস দুঃখিত।

অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুপ্রকাশ বলে, "আমি কিন্তু তোমার মতো আশাবাদী নই। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং স্বচক্ষে দেখেছি। এ জগতে কেউ অপরকে বাঁচায় না। ঋষি বঙ্কিমের উক্তিই সত্য। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? কিন্তু কী করে, যদি এরা পূর্ববঙ্গের মায়া না কাটায়? যদি পাকিস্তান না ছাড়ে? মরার বাড়াও দুর্গতি আছে। এদের পূর্বপুরুষদের মতো এরাও দলে দলে কলমা পড়বে, আরবী নাম নেবে, ভুলে যাবে যে এরা একদিন বাঙালী ছিল। এদের নিপাত করার মতো আহাম্মক মুসলমানরা নয়। এদের মুসলমান করেই তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। সংখ্যার জোরেই তারা পাকিস্তান পেতে চলেছে। সংখ্যার জোরেই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পাবে। এটা গণতন্ত্রের যুগ। এক একটি মানুষের এক একটি ভোট।"

"তুমি কি মনঃস্থির করে ফেলেছ যে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ স্বীকার করবে? যার কুফল সুদূরপ্রসারী।" মানস চিন্তিতভাবে সুধায়।

"আমি মনঃস্থির করবার কে? মনঃস্থির করেছেন কংগ্রেস নেতারা। গান্ধীজীও তাঁদের টলাতে পারেননি, তাঁর সে বল বয়সও নেই। অনেক দেরিতে তিনি বলছেন ক্যাবিনেট মিশন স্কীম বিনা শর্তে মেনে নিতে। আগে যদি বলতেন তা হলে জিন্নাসাহেব ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাব পাশ করাতেন না। শত অনুরোধেও জিন্না সাহেব সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করেননি, যেমন গান্ধীজী করেননি আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার। ইংরেজদের মাথার উপর 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের খাঁড়া ঝুলছে, তাই তারা সময় থাকতে কুইট করছে। তেমনি, হিন্দুদের মাথার উপরেও ঝুলছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাবের খাঁড়া। তাই কংগ্রেস নেতারা মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো সময় থাকতে ছেড়ে দিচ্ছেন। ইংরেজদের মতো কংগ্রেস নেতারাও রিয়ালিস্ট। আজকের রিয়ালিটি সাত বছর আগেকার রিয়ালিটি নয়। জবাহরলালকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি হিংসার কাছে নতিস্বীকার করছ?' নেহরু বলেন, "আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাছে নতিস্বীকার করছি।' ইংরেজরাও তাই করছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিনকের দিন খারাপ হচ্ছে। মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গান্ধীজীর উপর ছেড়ে দিলে তিনিও কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন? তেমন ইলিউশন তাঁর হয়তো আছে, কিন্তু আর কারো নেই। তাই কংগ্রেসও এক হিসাবে কুইট করছে। কুইট ইস্ট বেঙ্গল, কুইট ওয়েস্ট পাঞ্জাব, কুইট সিন্ধ্। তোমরা যদি পূর্ববঙ্গে থাকতে চাও থাকতে পারো, আমি কিন্তু স্থির করে ফেলেছি যে আর মায়া বাড়াব না, মায়ার ডোর কাটব।" সুপ্রকাশ ওঠে।

দিল্লী থেকে মানসকে লিখেছে সুকুমার। "মিলিকে অশোকাদির ওখানে রেখে আমি ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ঘুরে এসেছি। খিজর হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট সরকার ওই প্রদেশটিকে ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। সেটা মুসলিম লীগের চাঁইদের বরদাস্ত হলো না। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে হিন্দু ও শিখবিরোধী প্রচারকার্য চালিয়ে ওরা মুসলমানদের গরম করে তোলে। রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে মুসলমানদেরই মেজরিটি। তারা সংখ্যালঘু শিখদের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহু শিখ মারা যায়, তাদের ঘরবাড়ী দোকানপাট লুট হয় বা পোড়ানো হয়। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে মুসলমান করা হয়। পুরুষদের শুধু যে

মুসলমান করা হয় তাই নয়, মুসলমানিও করা হয়। তার মানে সারকামসাইজ। গোঁফ দাড়ি ও মাথার বেশ ক্ষৌরি করা হয়। যাতে শিখ বলে কেউ চিনতে না পারে। বসতবাড়ী ধ্বংস করে বাস্তুতে লাঙল দেওয়া হয়। হিন্দুরাও বাদ যায় না। কতক মেয়ে আত্মহত্যা করে ধর্ষণ এড়ায়।

বিশে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার পর থেকে মুসলিম লীগ মরীয়া হয়ে উঠেছে। যেমন করে হোক ব্রিটিশ অপসরণের পূর্বে সারা পাঞ্জাব অধিকার করা চাই। ওদিকে শিখরাও পণ করেছে কিছুতেই মুসলিম লীগকে পুরো পাঞ্জাব অধিকার করতে দেবে না, হিন্দুদেরও পণ তাই। ওরা চায় অর্ধেক পাঞ্জাব। ইতিমধ্যেই শরণার্থী সমাগম শুরু হয়ে গেছে। হিন্দু-শিখরাও দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলিম খেদাচ্ছে। লোকবিনিময় তো জিন্না সাহেবেরই দাবী। সামলান এখন ঠেলা। আইনসভায় মেজরিটি থাকাসত্ত্বেও মুসলিম লীগের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে খিজর হায়াৎ খান্ পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু গভর্নর মুসলিম লীগকে একক দল হিসাবে ক্ষমতায় আসতে দেননি। তফশীলী হিন্দুদের সাহায্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও গভর্নর শাসনক্ষমতা দেবেন না। শিখ ও হিন্দুদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে। লীগ তাতে নারাজ। লীগ নেতা বলেন, আগে তো অন্যান্য প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার হোক। তার পরে এখানেও হবে। গভর্নর কড়া লোক। তিনি ও যুক্তি শুনবেন না। অন্যান্য প্রদেশের মামলা অন্যান্য প্রদেশের। পাঞ্জাবের মামলা পাঞ্জাবের। তাই পাঞ্জাবে এখন গভর্নরের শাসন। মাউণ্টব্যাটেন এর সমর্থক। জিন্না ঠকে গেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব পার্টিশন চান। গান্ধীজী চান না। জিন্না যে চান না এটা না বললেও চলে। মাউণ্টব্যাটেনকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিতে হবে বাংলাদেশের পার্টিশন সম্বন্ধেও। সেখানেও কি পার্টিশন, না স্বাধীন বাংলা ?

স্বাধীন বাংলা হলে তিলোত্তমা কলকাতা নিয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই বাধবে না। নয়তো ব্যাটল ফর ক্যালকাটা। শোনা যায় রোগজীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার। আশা করি গুজবটা মিথ্যা। সত্য হয়ে থাকলে হিন্দুদের অস্ত্রে হিন্দুরাও মরবে। স্বখাত সলিল।

মাউণ্টব্যাটেনের চার্ম এমন যে নেহরু পাটেল ঘায়েল, গান্ধী আধা ঘায়েল, বাকী কেবল জিন্না। তাঁকে ঘায়েল না করতে পারলে মাউণ্টব্যাটেনকে

খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। কঠিনতম কুস্তিটা লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বনাম মহম্মদ আলী জিন্না। সেটা দেখবার জন্যেই আমি দিল্লীতে রয়েছি। চাকরির আশা দুরাশা। আমাকে বিলেত ফিরে যেতেই হবে। মিলির কথা মিলিই জানে।

গান্ধীজী যে ক'দিন এখানে ছিলেন মিলি রোজ তাঁর প্রার্থনা সভায় যেত। সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভজন গাইত। 'জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গাইতে শুনে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি কি সত্যি সত্যি রামরাজ্যে বিশ্বাস করো?' ও জবাব দেয়, 'ইংরেজদের কতরকম কমিউনিটি সং আছে। আমাদের নেই। থাকা উচিত। কংগ্রিগেশনাল ওয়ারশিপও নেই। থাকা উচিত। গান্ধীজী হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও কি তিনি কয়েকটি গান নেননি? ওসব গান উনিই তো ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।'

গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় শুনে আশ্চর্য হবে মাউণ্টব্যাটেনের কন্যা পামেলাও নিয়মিত যায়। ওর মুখখানি দেখলে সত্যি বিশ্বাস হয় যে ও একজন সাধুসন্তের সান্নিধ্য লাভ করতে এসেছে। কিন্তু আমার মতো সীনিকরা বলে ওটা কূটনৈতিক চাল। অমনি করে ওঁরা আমাদের হৃদয় জয় করতে চান। মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর স্ত্রী কন্যা। জানেন না গান্ধী একটি পুরনো ঘুঘু। পয়লা নম্বর বেনে। আসল মুক্তা বলে নকল মুক্তা বাড়িয়ে দিলে তিনি নেবেন না। তাই গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তা না চালিয়ে তাঁর অনুগামী জবাহরলাল ও বল্লভভাইয়ের সঙ্গে চালানো হচ্ছে। এঁরা নকলকে আসল বলে ভ্রম করতে পারেন। তবে বল্লভভাইও সেয়ানা ঘুঘু। আর জবাহরলালও অনেক পোড় খেয়ে বাস্তববাদী হয়েছেন। জবাহরলাল ইতিমধ্যেই মাউণ্টব্যাটেনের প্ল্যান বদলে দিয়েছেন। ডোমিনিয়ন স্টেটাসে তিনি রাজী, যদি দুটোর বেশী ডোমিনিয়ন না হয়। যাঁরা যুক্তবঙ্গ চান তাদের তিনি বলেছেন, যুক্তবঙ্গকে ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়নে যোগ দিতে হবে। তাঁরা পেছিয়ে গেছেন। এটা ভালো হলো কি মন্দ হলো তা তর্কসাপেক্ষ। তোমার কী মনে হয়? আমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করছি। গান্ধীজী ভালো মনে করেন না বলে মিলিও ভালো মনে করে না। কৃষ্ণ মেনন ভালো মনে করেন বলে আমিও ভালো মনে করি।"

চিঠিখানা মানস যূথিকাকে দেখতে দেয়। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে,

"নোয়াখালীতে যা ঘটেনি রাওলপিণ্ডিতে তা ঘটেছে। শিখ নারীদের ধর্ষণ এড়াতে আত্মহত্যা আর শিখ পুরুষদের মুসলমান করার সময় খাতনা। এই দুই পাপের ফলে পাঞ্জাব পুড়বে। যদি ব্রিটিশ রাজত্ব থাকতে এর প্রতিকার না হয়। বিয়াল্লিশ সালে বাপুকে ও কংগ্রেস নেতাদেরকে ঢের কম অপরাধে জেলে পোরা হয়েছিল। জিন্নাকে ও মুসলিম লীগ নেতাদেরকে জেলে পোরা হচ্ছে না কেন? ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাব কি কম হিংসাত্মক? জিন্না কি বলেননি যে তাঁর হাতে পিস্তল এসেছে? শিখরা এখন পাঞ্জাব ভাগের রব তুলেছে। ভাগ হয়ে গেলে মুসলমানদের ভাগাবে ও নিজেরা ভাগবে। সে রকম কিছু বাংলাদেশেও হতে পারে, যদি কলকাতায় সত্যি সত্যি গৃহযুদ্ধ বাধে।"

"কই, আমাদের এখানে তো তার প্রতিক্রিয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি নেই। লীগপন্থীরা চুপচাপ। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে গভর্নর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিও লীগপন্থী বলে কাউকে রেয়াৎ দিচ্ছেন না। কিন্তু কলকাতায় যদি গৃহযুদ্ধ বাধে অবস্থাটা রাতারাতি বদলে যেতে পারে। সেটাও নির্ভর করবে দিল্লীর সিদ্ধান্তের উপরে। মাউণ্টব্যাটেন তারিখ ফেলেছেন তেসরা জুন। সেইদিন তিনি জানাবেন কী তাঁর সিদ্ধান্ত। না, সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। প্ল্যান। প্ল্যান যদি কোনো পক্ষ অগ্রাহ্য করেন তা হলেই তাঁকে একতরফা একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা যে কী তা কেউ ঠাহর করতে পারছে না। সেটা এতই গোপনীয়। যেটা ততটা গোপনীয় নয় সেটা এই যে, নেতাদের বলা হবে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে নিতে, নতুবা পার্টিশনে রাজী হতে। শুধু ভারতের নয়, পাঞ্জাব ও বাংলারও পার্টিশন। আইনসভার সদস্যদের দুই সম্প্রদায়ের ভোটে সেটা পাকাপাকি হবে। মুসলিম তথা অমুসলিম। শুধু একটি জায়গায় একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যদি বাংলাদেশের মুসলিম তথা অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই পার্টিশন না-মঞ্জুর করে তা হলে বাংলাদেশ কোন ডোমিনিয়নে যোগ দেবে? এটা তর্কের খাতিরে বলা। সকলেই জানে মুসলিম সদস্যরা বলবেন পাকিস্তানে। অমুসলিম সদস্যরা বলবেন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে বা হিন্দুস্থানে। দ্বিমত কেবল কলকাতা নিয়ে। সেটা যদি সদস্যদের ভোটের উপর ছেড়ে না দেওয়া হয় তবে তর্কযুদ্ধের বা অসিযুদ্ধের উপলক্ষ থাকে না। কলকাতা তাদেরই পশ্চিমবঙ্গ যাদের। সেখানকার শতকরা আশিজন নাগরিক হিন্দু। আর আশে পাশেও হিন্দু সংখ্যাধিক্য।

যাক, এসব আমার অনুমান।" মানস নিজেই নিশ্চিত নয়। তেসরা জুনের আগে কেউ নিশ্চিত নয়। নেতারাও না।

গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে পাঁচজনে মিলে ভারতভাগ্য বিধাতা হন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, জবাহরলাল নেহরু, বল্লভভাই পাটেল, মহম্মদ আলী জিন্না ও বলদেও সিং। তাঁদের বিধানে ভারত ধরণী দ্বিধা হবে। দ্বিধা হবে একই কালে বঙ্গ ও পাঞ্জাব। পাকিস্তান নামে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবে। তার অঙ্গীভূত হবে পূর্ববঙ্গ তথা পশ্চিম পাঞ্জাব। সিন্ধু ও ব্রিটিশ বেলুচিস্থান। গণ ভোটের রায় অনুকূল হলে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তথা সীলেট। আর সব থেকে যাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে।

তেসরা জুন সন্ধ্যাবেলা বল্লভভাই বাদে বাকী চারজন বেতার ভাষণ দেন। বিচলিত হয়ে শোনে মানস ও যূথিকা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর কিছুদিনের মধ্যে ওরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হবে। আইনের ভাষায় এলিয়েন।

দীপক উদ্বিগ্ন হয়ে সুধায়, "কী হয়েছে, বাবা?"

মানস উত্তর দেয়, "আর কিছুদিন পরে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। পাকিস্তান থেকে ইণ্ডিয়ায়।"

"কেন, এটাও তো ইণ্ডিয়া।" দীপক জেরা করে।

"মুসলিম ইণ্ডিয়া বলে একটা কল্পনা বরাবর ছিল। এবার সেটা রূপ ধারণ করছে। নাম নিচ্ছে পাকিস্তান। আমরা যেখানে আছি সেটা পাকিস্তানে পড়বে। কারণ যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী।" মানস ব্যাখ্যা করে।

মণি অত কথা বোঝে না। সে সম্প্রতি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দেশ দেরিতে। স্কুলে তার অনেক বন্ধু হয়েছে। তাদের ছাড়তে কি তার মন চায়? সে কেঁদে ফেলে। "আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব।"

যূথিকা তার চোখ মুছিয়ে দেয়। "তোমার বন্ধুরাও কি সকলে এখানে থাকবে? অনেকেই ওপারে যাবে। কিন্তু একই জায়গায় নয়।"

হঠাৎ বঙ্কিমবাবু এসে হাজির। "শুনেছেন? ঘোষণাটা শুনেছেন?"

"শুনেছি। খুব ভালো আর খুব খারাপ খবর। স্বাধীনতা আসছে। এক হাতে সুধাভাণ্ড। অন্য হাতে বিষকুম্ভ। লীগপন্থীদের দিক থেকেও তাই। জিন্নার কণ্ঠস্বরেও বিষণ্ণতার আভাস। জবাহরলালের কণ্ঠস্বরেই বা আনন্দের রেশ কোথায়? কিন্তু এখনো একটা বিষয়ে দ্বিমত। এটা কি সেটলমেণ্ট না

কম্প্রমাইজ? জিন্না বলছেন কম্প্রমাইজ। বলদেও বলছেন সেটলমেণ্ট।" মানস অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

"ব্রিটেনের সঙ্গে সেটলমেণ্ট। লীগের সঙ্গেও তাই। ব্রিটিশ অপসরণ তথা লীগ সহ-অপসরণ একই কালে ঘটবে। তার পরে আর লীগের সঙ্গে কথাবার্তার প্রশ্ন ওঠে না। কথাবার্তা চলবে পাকিস্তানের সঙ্গে। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেক রাষ্ট্রের। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের নয়। জিন্না সাহেব যদি সাম্প্রদায়িক সেটলমেণ্ট চাইতেন তবে একই নিঃশ্বাসে পাকিস্তান চাইতেন না। তাঁকে বার বার বলা হয়েছিল আগে ইংরেজরা যাক, তার পরে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘরোয়া মিটমাট হবে। তিনি সেকথায় কান দিলেন না। ঘরোয়া সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করলেন। তৃতীয় এক নেশনকে জড়ালেন। এর পর আর ভাইয়ে ভাইয়ে মিটমাট নয়। নেশনে নেশনে যুদ্ধ বা সন্ধি। যুদ্ধে পাকিস্তানের কী লাভ হবে বুঝিনে। সমগ্র বঙ্গ জয় করতে বেরিয়ে পূর্ববঙ্গটাই হারাতে হবে। সমগ্র পাঞ্জাব জয় করতে বেরিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাবটাও হারাতে হবে। তেসরা জুনের এইটুকুই ভালো যে যুদ্ধ দিয়ে হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান হবে না। আর সেইজন্যেই তো আমরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থেকে যাচ্ছি।" বঙ্কিমবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন।

"পাকিস্তানের সঙ্গে মিলনভূমি তা হলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ? ইংরেজরা সঙ্গে এতকাল ধরে সংগ্রাম করার নীটফল ইংরেজের কোলেই আশ্রয়?" যূথিকা চমৎকৃত।

"কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।" মানসের মন্তব্য।

॥ ষোল ॥

তেসরা জুনের ঘোষণা শুনে সৌম্য এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করে। সে যন্ত্রণা একাধারে কায়িক, মানসিক, আত্মিক। এতকাল একসঙ্গে বাস করে মুসলমানরা কি হিন্দুদের কাছ থেকে শুধু দুঃখই পেয়েছে, সুখ একটুও পায়নি, আর হিন্দুরাও কি মুসলমানদের কাছ থেকে কেবল অন্যায়ই পেয়েছে, ন্যায় একটুও পায়নি? তা হলে বিবাহবিচ্ছেদ কেন? এরা কি পরস্পরকে ছেড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে? সেটা একটা মোহ আর মিথ্যা।

সৌম্যর অস্থিরতার খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন মুস্তাফী ছুটে আসেন। পরীক্ষা করে বলেন, "ওটা হয়েছে শক থেকে। আপনি সেরে যাবে। বিশ্রাম করো।"

সৌম্য ঠিক উল্টোটি করে। কলকাতা যায়, সেখানে জুলিদের সঙ্গে একবেলা কাটিয়ে দিল্লীর ট্রেন ধরে। আগে থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে স্টেশনে আসে স্থকুমার ও মিলি। তারা ওকে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ওরা হোটেল ছেড়ে দিয়েছে।

সৌম্যর প্রথম কাজ বাপুকে দর্শন করা। প্রণাম করতেই তিনি বলেন, "আশ্রমের কী সমাচার? পরিবারের কুশল তো?"

সৌম্য সব খবর জানায়। দু' চার কথার পর তিনি বলেন, "বাঙালীরা কি বুঝতে পারছে না কী বিপত্তি তারা ডেকে আনছে? ওরা যদি পার্টিশনে রাজী হয় তো আমি একা কী করতে পারি? আমার কথা আজকাল শোনে কে? আমি একটা ব্যাক নম্বর। যা করবার তা জবাহরলাল আর বল্লভভাই করছেন। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দশা কী হবে বুঝিয়ে বলো।"

সর্দারজীর সঙ্গে সৌম্যর বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। তার আশ্রমের দু'জন ট্রাস্টী গুজরাটী। বল্লভভাই তাঁর স্থপরিচিত হাসিমুখে যা বলেন তার মর্ম, "ভাগ না করলে কি ভোগ করা যায়? ত্যাগের দিন গেছে, ভোগের দিন এসেছে। অখণ্ড ভারত নিয়ে আমরা করব কী, যদি দেখি যত্রতত্র দাঙ্গা বাধছে আর অবস্থা চলে যাচ্ছে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে? নিয়ন্ত্রণের জন্যে আমরা তাকাচ্ছি ইংরেজদের মুখের দিকে আর ইংরেজরা মুসলিম লীগের মুখের দিকে? মুসলিম লীগকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে বনবাসে গেলে কী লাভ হবে, যদি পাকিস্তান অর্জনের জন্যে ওরা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে লোকের উপর গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়? কলকাতায় যা করেছিল। বঙ্গদেশের সর্বাঙ্গে পচন ধরেছিল। যতই দিন যেত পচন আরো বাড়ত। তাই সময় থাকতে একটা অঙ্গ কেটে বাদ দিতে হলো। এটা পার্টিশন নয়, অ্যাম্পুটেশন। পাঞ্জাবেও তার দরকার। এ্যাম্পুটেশনের সিদ্ধান্ত কি কেউ স্বেচ্ছায় নেয়? কিন্তু সময় থাকতে না নিলে মরণ। বড়লাটের সাহায্যে জিন্নাকে রাজী করানো গেছে। কিন্তু বাপুকে রাজী করানো শক্ত। তিনি চান অ্যাম্পুটেশন নয়, অ্যাবডিকেশন। আর আমরা চাই অ্যাবডিকেশন নয়, অ্যাম্পুটেশন।"

সৌম্য এর পরে যায় পণ্ডিতজীর সন্নিধানে। অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। দেখা পেতে একটু দেরি হয়। জবাহরলাল যা বলেন তার মর্ম, "অখণ্ড না হলেও দেশের নাম তো ইণ্ডিয়াই থাকছে। অতীতের সঙ্গে ব্রেক তো হচ্ছে না। ব্রিটেনের সঙ্গেও না। আমরা চাই কণ্টিনিউইটি। ইংরেজরা তাতে রাজী। মুসলিম লীগ যদি রাজী হতো তা হলে পার্টিশনের দরকার হতো না। আর পার্টিশনের দরকার না হলে একই যুক্তিতে প্রদেশ ভাগ করতে হতো না। আমরা কি সাধে রাজী হয়েছি? ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। যেন এক ক্যাবিনেট নয়, দুই ক্যাবিনেট। সেখান থেকে না হয় পদত্যাগ করে সরে আসতুম. কিন্তু কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি থেকে তো সরে আসা যেত না। সেখানে বসে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হতো, কিন্তু সে শাসনতন্ত্র কি গ্রহণ করত ভারতের সব ক'টি প্রদেশ? অনিচ্ছুকদের উপর চাপিয়ে দেবার নৈতিক অধিকার কি থাকত আমাদের? ওদের সিসিড করতে দেওয়াই কি উচিত হতো না? আমরা হিন্দু ও শিখপ্রধান অঞ্চলগুলি হাতে রেখে বাকীটা ছেড়ে দিচ্ছি। ওরা একজোট হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করছে। আমরাও নিষ্কণ্টক হয়ে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন গঠন করছি। ব্রিটিশ রাজের আমরাই অব্যবহিত উত্তরাধিকারী। রাজার যেমন যুবরাজ।"

সৌম্য এর পরে যায় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকাশে। পুরাতন সহকর্মীকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কুশলবিনিময়ের পর যা বলেন তার মর্ম, "জুলিয়াস সীজারের স্বভাব জিন্নায় বর্তেছে। সীজার বরং তাঁর নিজের গ্রামে পয়লা নম্বর হতেন, তবু রোমে দোসরা নম্বর নয়। তেমনি, জিন্নাও বরং তাঁর নিজের মাপে তৈরি পাকিস্তানে পয়লা নম্বর হবেন, তবু সারা হিন্দুস্থানে দোসরা নম্বর নয়। বাপু এটা বুঝতেন, তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল জিন্নাকে সারা হিন্দুস্থানের পয়লা নম্বর করা। বাপু কিন্তু বুঝতেন না যে সারা হিন্দুস্থানের ডালে বসে জিন্না সেই ডালটাকেই কাটতেন। পাকিস্তান অর্জনই তাঁর লক্ষ্য। সারা হিন্দুস্থান সংরক্ষণ তাঁর লক্ষ্য নয়। আমরা বোকা বনে যেতুম, যখন দেখতুম তিনি কাটতে কাটতে গোটা বাংলাদেশ ও গোটা পাঞ্জাব কেটে নিয়েছেন। উপরন্তু গোটা আসাম। আমরা তাঁকে ডাল থেকে নামাতুম কী করে, তাঁর হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে তাঁকে থামাতুম কী করে? বাধ্য হয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সাহায্য নিতে হতো। তাঁর সাহায্যে আমরা জিন্নাকে তাঁর নিজস্ব গ্রাম দিয়েছি। কিন্তু রোম দিইনি। বাপুর নীতি হলো হিন্দু মুসলমানের ঘরোয়া

মামলায় ব্রিটিশ মধ্যবর্তিতা পরিহার করা। আমরা কিন্তু ব্রিটিশ মধ্যবর্তিতা প্রয়োজন বোধ করেছি। বাপু তাই নিজেকে শূন্যে পরিণত করেছেন। কী করে তাঁকে বোঝাব যে অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বঙ্গ বা অখণ্ড পাঞ্জাব কোনোটাই হিন্দু মুসলমান একমত না হলে ইতিহাসের ধোপে টিকত না? আমরা গৃহযুদ্ধ পরিহার করেছি। সে যুদ্ধের অহিংস বিকল্প অজানা। দেশ বরং ধ্বংস হয়ে যাক, তবু হিংসার কাছে নতিস্বীকার কখনোই নয়, এটা হলো হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ঠাণ্ডা মাথা এটা সমর্থন করে না। আমরা হিংসার কাছে নতি স্বীকার করিনি। কিছু দিয়েছি, কিছু পেয়েছি। আমরা ইচ্ছামতো শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারব। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি, ওয়েটেজ প্রভৃতি রদ করার স্বাধীনতা আমাদের হাতে।"

সৌম্য এর পরে তার দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে। তাঁরা যা বলেন তার মর্ম, "হাঁসের জন্যে যে চাটনি হাঁসীর জন্যে সে চাটনি নয়। ইংরেজের জন্যে যে অহিংস রণপদ্ধতি মুসলিম লীগের জন্যে সে অহিংস রণপদ্ধতি নয়। কারাবরণ ইত্যাদিতে কোনো ফল হবার নয়। চাই গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো শত সহস্র শহীদ। চাই বীরের অহিংসা। কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না। আমরা দেখি মুসলিম লীগের রণপদ্ধতির অনুসরণ হিন্দুরাও করছে। নরহত্যা, নারীহরণ ইত্যাদির বদলা নিতে গিয়ে আটাশ বছরের তপস্যার ফল বিসর্জন দিচ্ছে। তাই একটা রাজনৈতিক সমাধানে রাজী হতে হলো এর চেয়ে ভালো বার্গেন আশা করলে ভুল হতো।"

বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ করে সৌম্য। তারা যা বলেন তার মর্ম, "ব্রেককে এত ভয় কিসের? ব্রিটেনের সঙ্গে ব্রেক না হলে কি মার্কিন স্বাধীনতা সম্ভব হতো? অতীতের সঙ্গে ব্রেক না হলে কি রুশ বিপ্লব সম্ভব হতো? নেহরুর নার্ভ ফেল। গান্ধীজীও মিস্টার জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জবাব দিতে অক্ষম। তাই এই বিলি বন্দোবস্ত। বুর্জোয়াতে বুর্জোয়াতে ক্ষমতার হস্তান্তর। জনগণের মাথার উপর দিয়ে। দ্বিতীয় এক বর্ণচোরা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ছাড়া আর কী?"

সৌম্যর মুখে বিবরণ শুনে সুকুমার চিমটি কাটে, "ইংরেজকে ইংরেজ চেনে। নেহরুকে মাউণ্টব্যাটেন। আঁচল থেকে গান্ধীজীর প্রিয় পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়েছেন লর্ড লুইস। লেডী এডউইনারও টান আছে।"

সৌম্য হতভম্ব। তা দেখে মিলি বলে "একটা মজার কথা শুনবে, দাদা?

লেডী এডউইনাকে পুলিশ থেকে নাকি ওয়ার্নিং দিয়েছে যে আমি নাকি একটি ন্যাশনাল বেঙ্গল টাইগ্রেস। তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ নিয়ে তাঁর স্বামীকে গুলী করে মারার তালে আছি। কথাটা লর্ড লুইসের কানে যেতে তিনি নাকি বলেন, ওই ইয়াং লেডীর মতো বিউটির হাতে গুলী খেয়ে মরা তো পরম সৌভাগ্য। শুনে আমি তো লজ্জায় মরি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ।"

সৌম্য কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, "হেরে গেলুম, বোন। ইংরেজের কূটনীতির কাছে আমরা হেরে গেলুম। ওদের দমননীতি আমাদের হারাতে পারেনি। কিন্তু ওদের তোষামোদ আমাদের ভুলিয়েছে। বাপুকে তো দেখলুম ওঁদের দু'জনের উপর বেশ খুশি। লেডী পামেলাও তো দেখি প্রার্থনা সভায় যান। গান্ধীভক্তি না ডিপ্লোমেসী কে বলতে পারে?"

"না, না, পামেলা মেয়েটি নিরীহ আর অখল।" মিলি প্রতিবাদ করে।

সুকুমার খেই হাতে নিয়ে বলে, "এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশনের কথাবার্তা ডিপ্লোম্যাটিক হবে না তো কী হবে? সেটাই তো নিয়ম। মহাত্মাজী মহাখুশি। লর্ড লুইসের সাহায্যে জিন্নাকে চালমাত করেছেন। জিন্না কি রাজী ছিলেন নাকি? লর্ড লুইস আলটিমেটাম দিয়ে রাজী করিয়েছেন। রাজন্যদেরও তিনি বুঝিয়েছেন যে ব্রিটেন তার সৈন্য অপসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্যারামাইণ্টসি প্রত্যাহার করবে। রাজন্যরা এখন থেকে স্বাধীন, কিন্তু পরস্পরের আক্রমণ থেকে বা বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে অথবা পাকিস্তানে যোগ দিলে ভালো হয়। তার মানে ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও রেলওয়ে ইত্যাদি সমর্পণ করতে হবে। রাজন্যরা এক এক করে পাটেলের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। অধিকাংশ রাজ্যই তো হিন্দুপ্রধান। মুসলিমপ্রধান রাজ্য আর ক'টাই বা? তবে হায়দারাবাদ আর কাশ্মীরকে নিয়ে মুশকিল। হায়দারাবাদের প্রজা হিন্দু, নিজাম মুসলিম। কাশ্মীরের প্রজা মুসলিম, রাজা হিন্দু। এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধতে পারে।"

সৌম্যর মুখে একটু হাসি ফোটে। "কূটনীতিতে সর্দারজীও কম যান না। সৈন্যসামন্ত দিয়ে এতগুলো রাজ্য জয় করতে কতকাল লাগত? রাজাদের অনেকের সিপাহী আছে। অপরপক্ষে কংগ্রেস সমর্থিত প্রজামণ্ডলও আছে বেশীর ভাগ রাজ্যে। সেই প্রজামণ্ডলগুলি সর্দারজীর ঘুঁটি। তারা চাইবে নির্বাচিত সরকার। সকলের জন্যে একই শাসনতন্ত্র।"

মিলি খেই হাতে নিয়ে বলে "লেডী এডউইনার ধারণা নেহরুর মতো

স্টেটসম্যান আর হয় না। হবে কী করে? হ্যারোর মতো পাবলিক স্কুলে কি পড়েছে? কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মতো কলেজে? সত্যি, নেহরু হচ্ছেন ম্যান অভ্ দি আওয়ার। আর লেডী এডউইনা তাঁর অ্যাডমায়ারার।"

সুকুমার তির্যক হেসে বলে, "অ্যাডমিরেশনটা একতরফা নয়।"

মিলি ওর বরের এক গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেয়। "চুকলি কাটতে চাও তো প্রকাশ্যে কাটো। গোপনে কেন? কাপুরুষ!"

"চৌধুরী, শুনলে তো? সেই বিপ্লবিনী এখন বিমোহিতা। "সুকুমার নালিশ করে।

সৌম্য ওদের দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনার জন্যে বলে, "ইংরেজরা হলো দোকানদারের জাত। দোকানদার বিস্তর চাটুবাক্য দিয়ে খরিদ্দারকে ভোলায়। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও তলে তলে একজন দোকানদার। ঝুটা মুক্তো সাচ্চা মুক্তা বলে আমাদের নেতাদের গছিয়ে দিয়ে যেতে চাইলে বাপু ছাড়া আর কে চিনতে পারবেন? বেনেকে বেনেই চেনে। খতিয়ে দেখতে হবে সত্যিকার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে। ইংরেজদের কমনওয়েলথের হাতে না ভারতীয়দের ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের হাতে। মাউণ্টব্যাটেন নাকি কবুল করিয়ে নিয়েছেন যে কমনওয়েলথে যোগ দেওয়া হবে। এই মরেছে! সর্বস্ব তোমার চাবীটি আমার।" সৌম্য দোকানদারদের বিশ্বাস করে না।

সুকুমার আমতা আমতা করে বলে, "কমনওয়েলথে যোগদান বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে। পাকিস্তান কমনওয়েলথে যোগ দিলে আর ভারত না দিলে দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারের তারতম্য হবে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বেধে গেলে ইংরেজরা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকবে। তবে নেতারা কড়ার করিয়ে নিয়েছেন ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগ দিলেও ভারত সর্বতোভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে। সে রাশিয়ায় দূত পাঠাবে, আমেরিকায়ও। তার ফরেন পলিসি ব্রিটিশ পলিসির অনুরূপ না-ও হতে পারে। তবে ব্রিটিশবিরোধী হবে না।"

"কেন হবে না? ব্রিটেন যদি ভারতবিরোধী পলিসি অনুসরণ করে ভারতেরও ব্রিটিশবিরোধী পলিসি অনুসরণের অধিকার থাকবে। তা নইলে তার সোভরেনটি কিসের? এসব বাজিয়ে নেওয়া চাই, সুকুমার। অমন চতুর জাত আর দ্বিতীয় নেই। ওরা বেনে। বেনের সঙ্গে বেনের মতো

কারবার করতে পারতেন একমাত্র বেনের ছেলে গান্ধী। ওটা বামুনের ছেলের কাজ নয়। তবে তাঁর সঙ্গে পটিদারের ছেলে আছেন বলেই ভরসা হচ্ছে যে আমরা ঠকে যাইনি। ঠকে গেলে বাপু ইতিমধ্যেই টের পেতেন।" সৌম্য বলে।

"মাফ কোরো, ভাই চৌধুরী। তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনে। ভিতরের খবর তো তুমি রাখো না। গান্ধীজী গোঁ ধরে বসেছিলেন বাংলাদেশকে অবিভক্ত রাখতে হবে। বাঙালী হিন্দু মুসলমান স্থির করবে অবিভক্ত বঙ্গ কোন্ রাষ্ট্রে যোগ দেবে। ভারতের ইউনিয়নে না পাকিস্তানে। ওটা যেন একটা দেশীয় রাজ্য আর কী! লর্ড লুইস বাংলাদেশের জন্যে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নের একটি ধারা তাঁর প্ল্যানের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। জবাহরকে জানতে না দিয়ে। তার পর কী মনে করে সিমলায় নেহরুকে বিশ্বাস করে দেখান। পণ্ডিতজী তো রেগে টং। 'বাংলাদেশ যদি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন হয় তবে হায়দারাবাদ কেন নয়? মৈশুর কেন নয়? ত্রিবাঙ্কুড় কেন নয়? বড়োদা কেন নয়? অন্তত এক ডজন ডোমিনিয়ন হবে। আপনি কি ভারতবর্ষকে বলকান বানাতে এসেছেন? আমরা এ প্ল্যান অগ্রাহ্য করব।' লর্ড লুইস দেখেন মহাবিপদ। তিনি ভি. পি. মেননকে দিয়ে আরেকটা প্ল্যান তৈরি করান। নেহরু অনুমোদন করেন। লর্ড লুইস রাতারাতি বিলেত গিয়ে অ্যাটলীকে দিয়ে সংশোধিত প্ল্যান মঞ্জুর করিয়ে আনেন। মহাত্মা তো বলকানের ফাঁদে পা দিচ্ছিলেন। এখন বোকা বনে গেছেন। তবে এটাও ঠিক যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান কখনো একমত হতো না। পণ্ডিতজীর বৃথা আতঙ্ক। 'হিন্দু মুসলমান এক হো' বলে চেঁচালেই কি ওরা এক হবে? গান্ধীজী চাইলেও না, লর্ড লুইস চাইলেও না। বঙ্গভঙ্গটা কিন্তু লর্ড লুইসের আইডিয়া নয়। ওঁর আসার আগেই বিলেতে বসে আমি খবর পেয়েছিলুম যে ওটা ওয়েভেলের মাথায় ছিল।"

সৌম্য বিরক্ত হয়ে বলে, "আরো আগে লর্ড কার্জনেরও মাথায় ছিল। হিন্দু মুসলিম সমস্যার ওটা একটা পুরনো সমাধান। লর্ড পেথিক-লরেন্স একটা নতুন কিছুর সন্ধান দিয়েছিলেন। আমরাও আশা করেছিলুম যে ওইরকম কিছু মাথায় নিয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এদেশে পদার্পণ করেছেন। ওমা, সেই মান্ধাতার আমলের সমাধান! ইনি তো কার্জনকেও আউট-কার্জন

করলেন। তিনি ভারত ভাগ করেননি। ইনি তাও করলেন। বাপু চেয়েছিলেন আগে ইংরেজ বিদায় হোক, তারপর আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মিটমাট করব। মিটমাট দেশ ভাগাভাগির শর্তেও হতে পারত, প্রদেশ ভাগাভাগির শর্তেও হতে পারত, পাকিস্তানও যে হতো না তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটা শর্ত থাকত। সেই মীমাংসাই চূড়ান্ত। মুসলিম লীগ পরে আর কোনো দাবী উত্থাপন করতে পারবে না। দফায় দফায় ঝগড়া ও দফায় দফায় মিটমাট করতে হবে না। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ চিরকালের মতো নিঃশেষ। যেমন ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিবাদ চিরকালের মতো নিঃশেষ। তুমি কি বুঝতে পারছ না, সুকুমার, যে জিন্নার আস্তিনে আরো কয়েকটা তাস লুকনো রয়েছে? সেসব তাস এক এক করে বেরবে। গৃহযুদ্ধ এড়ানো গেছে বলে নিঃশ্বাস ফেলতে পারো, কিন্তু শেষপর্যন্ত গৃহযুদ্ধ লড়তেই হবে। নয়তো চিরকাল কমনওয়েলথে থাকতে হবে।"

সুকুমার ও মিলি শিউরে ওঠে। ওদের নিজেদের ঝগড়াও নিঃশেষ। সুকুমার বলে, "কিন্তু, নেহরু ও পাটেল বলেছেন এটাই ফাইনাল সেটলমেণ্ট। গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে। তবে জিন্না তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে এটা একটা কম্প্রমাইজ।"

"তা হলেই বোঝ! কার হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছ? সেসব দিয়ে সে কার সঙ্গে লড়বে? কেন লড়বে? কোথায় থামবে?" সৌম্য হুঁশিয়ারি দেয়।

আরো কয়েকদিন দিল্লীতে থেকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সে বার বার ওই একই কথা শোনে, ভারতভাগ্য বিধাতা এই পাঁচজন মেন অভ্ ডেস্টিনি—নেহরু, পাটেল, জিন্না, বলদেও সিং আর মাউণ্টব্যাটেন। গান্ধী বাদ। ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয়। আহা, কী নিষ্ঠুর রঙ্গ!

কলকাতায় দু'দিন কাটিয়ে জুলিকে সব কথা শুনিয়ে বাচ্চাদের কোলে পিঠে করে সৌম্য আবার রওনা দেয় পদ্মাপারে। এবার একটু ঘুরে মানসের ও যুথিকার সঙ্গে দেখা করে। অনেকদিন পরে।

"ও কী, সৌম্যদা! তোমার গোঁফ দাড়ি কোথায়! দীপক আর মণি চিনতে পারছে না তুমিই কি ওদের জ্যাঠামশায়।" যুথিকা বলে।

"দীপক তো এখন ইয়াং ম্যান। তবে মণি এখনো ইয়াং লেডী হয়নি।

আয় তোরা, আমার কাছে আয়। আমিই তোদের জ্যাঠামশায়। তোদের দুটি ভাই বোন হয়েছে। ওদের ফোটো দেখাব।" সৌম্য সস্নেহে বলে।

"জুলি আর বাচ্চারা কেমন আছে? ওরা কি এখনো কলকাতায়? কবে ওদের আনছ?" যূথিকা জানতে চায়।

"এ প্রশ্নের উত্তর তোমাকেই দিতে হবে, যূথী। তুমি কি মনে করো ওদের এই ডামাডোলের মধ্যে এপারে আনা উচিত?" সৌম্য চিন্তাকুল।

"বাপু নোয়াখালীতে থাকতে ভয়ের কী আছে?" যূথিকা বলে।

"হাতে নিয়ে লণ্ঠন নোয়াখালী হণ্টন। মানুষের খোঁজ বৃথা, করো দেশ বণ্টন। ছড়াটা কার রচনা, জানো? সোনাদির।" সৌম্য হাসির ভাণ করে।

তিনজনাতে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়। সৌম্যর কণ্ঠে হতাশার সুর। "এরই জন্যে এতকালের তপস্যা! এত স্বপ্ন! এত ধ্যান!"

মানস সান্ত্বনা দেয়। "অহিংস সংগ্রাম দিয়ে সাম্রাজ্য ভাঙা যায়, কিন্তু নেশন গড়া যায় না। যেখানে বহু ধর্ম, বহু ভাষা সেখানে একপক্ষের ইচ্ছায় এক নেশন হবে কী করে? তার জন্যে অত্যাবশ্যক একটা সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের। তেমন একটা শাসনতন্ত্র রচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল আমাদের নেতাদের। কিন্তু তার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে আপস করতে কোনো পক্ষই রাজী নন। জবাহরলাল ও বল্লভভাই চান মেজরিটি রুল, জিন্না কিছুতেই সেটা হতে দেবেন না, কারণ মেজরিটি মানে হিন্দু মেজরিটি। জিন্না চান কংগ্রেস লীগ প্যারিটি, কিন্তু কংগ্রেস তাতে কিছুতেই রাজী হবে না। বিকল্পে জিন্না চান পাকিস্তান। কংগ্রেস তাতে রাজী, যদি পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ হাতে পায়, যায় কলকাতা। লোকে বলে, গান্ধীজী তো ইংরেজকে বিদায় করতেই জন্মেছেন, ইংরেজ বিদায় হলেই তাঁর ভূমিকা শেষ ইংরেজের পরে কে? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। বিরোধ এড়ানোর জন্যে তাঁর আত্মত্যাগী পরামর্শ। কংগ্রেস মন্ত্রীদের অ্যাবডিকেশন! এবার কিন্তু ইংরেজ অফিসাররা থাকবেন না শাসনভার নিতে। অথচ ইণ্ডিয়ান অফিসাররা তো দ্বিধাবিভক্ত। অতএব দেশ দ্বিধাবিভক্ত হতে বাধ্য।"

সৌম্য বিষণ্ণভাবে বলে, "গান্ধীজীর ভূমিকা শেষ হয়নি, মানস। তাকে অকালে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি তো জানো আমাদের দেশে দশ

বারো বছর অন্তর জনগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার আসে। সেই একবার অসহযোগ আন্দোলনের সময়, তার পরে লবণ সত্যাগ্রহের সময়, তার পরে 'কুইট ইণ্ডিয়া' সংগ্রামের সময়। মাঝামাঝি সময়টা জোয়ারবিহীন। সে সময় গঠনমূলক কর্ম বা পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপ। সেটা জনগণের জোয়ার নয়। তার জন্যে বাপুকে অপেক্ষা করতে হয়। তেমনি একটা অপেক্ষার সময় কংগ্রেস হাই কমাণ্ড পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপের দ্বারা সময়ক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন। বাপুর মত নিয়ে। বাপুর দৃঢ়বিশ্বাস ইংরেজ কখনো বিনা শর্তে ভারত ত্যাগ করবে না, সে অনির্দিষ্টকাল পায়চারি করবে, ততদিনে আবার জোয়ারের সময় এসে পড়বে। জোয়ারের মুখে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে গণসংগ্রামের শেষ তরণী। লক্ষ্য নিঃশর্ত স্বাধীনতা। নিঃশর্ত স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করতুম না তা নয়। পাকিস্তান চাইলে সে পাকিস্তানও পেত। কিন্তু আমাদের হাত থেকে। ইংরেজদের হাত থেকে নয়। এ যা হলো এতে ওরা ইংরেজদের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমাদের কাছে নয়। লীগপন্থীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের আসল কারণ ওরা চায় অখণ্ড ভারতে ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। আমরা রাজী হই কী করে? দ্বিখণ্ড ভারতেও ওরা চায় ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। আমরা নারাজ। মাউণ্টব্যাটেন এর মীমাংসা করেছেন লীগপন্থীদের ব্যালান্স না দিয়ে। পাকিস্তান যে কখনো আমাদের মিতা হবে তার স্থিরতা নেই। তার স্বাধীনতার অর্থ আমাদের সহযোগী স্বাধীনতা নয়, প্রতিযোগী বা বিরোধী স্বাধীনতা। আর পাঁচটা বছর সবুর করলে এই অনর্থটা হতো না। কিন্তু সময় দিচ্ছে কে? মিটমাট না হলে মাউণ্টব্যাটেন বলকান বানিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। আর ওদিকে জিন্নাও জেহাদের জন্যে তরোয়ালে শান দিচ্ছেন। জনগণ দাঙ্গার দ্বারা বিভ্রান্ত। বাপু আগুন নেবাতেই ব্যস্ত। তাঁর কাছে সেটাই সবচেয়ে জরুরি কাজ। কংগ্রেস নেতারা চান একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত। তাই মাউণ্টব্যাটেনকে দিয়ে তাঁরা বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করিয়ে নিলেন। অমন একজন নিরপেক্ষ বড়লাট এর আগে আসেননি। তিনি তো বলেন তিনি ভারতভাগ করতেই চাননি। জিন্না হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে কিছুতেই ভোলানো যায় না বা টলানো যায় না। তাঁকে উপেক্ষা করাও ব্রিটিশ পলিসি নয়। কৈকেয়ীর কাছে দশরথের ওয়াদা।"

"বোঝা গেল মুসলিম 'মাস' হচ্ছে মেষ। ওই জিন্নাই মেষপালক। এত

বড়ো একটা সম্প্রদায় গড্ডলিকার মতো অন্ধভাবে একজনের দ্বারা চালিত। জেহাদেও উদ্যত। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। ইতি নেহরু।" মানস মন্তব্য করে।

সৌম্য সেদিনটা থেকে যায়। অর্ধেক রাত অবধি কথাবার্তা গড়ায়। মানস জানায় তার বহুদিনের বাসনা সে ইংরেজীতে একখানা বই লিখবে, নাম রাখবে 'দি আনরিয়ালিস্টস'। যারা পার্টিশন চায় তারা আনরিয়ালিস্ট। নদনদী কখনো ভাগ হতে পারে না। পাহাড় পর্বত কখনো ভাগ হতে পারে না। কোথাও একটা প্রাকৃতিক সীমান্তরেখা নেই। যেখানেই লাইন টানবে সেটা শুধু কাগজের উপরেই হবে। কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে দেখবে দেওয়া যায় না।

মানস দুঃখ করে। "যেটা আনরিয়াল সেটাই হলো রিয়াল। হিন্দু-শিখরাও চায় পার্টিশন। আমিই হলুম আনরিয়ালিস্ট। সৌম্যদা, তোমার কী মনে হয়? এই যে পার্টিশন এটা কি ইনেভিটেবল নয়?"

"অহিংসাবাদীর কাছে কিছুই ইনেভিটেবল নয়। যুদ্ধবিগ্রহও নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামাও নয়, পার্টিশনও নয়। তুমি যদি আমার গালে চড় মারো আমি তোমার গালে চড় না-ও মারতে পারি। তুমি যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করো আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া নাও করতে পারি। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা করো আমি তোমাকে ঘৃণা না-ও করতে পারি। তুমি যদি আমাকে শত্রু ভাবো আমি তোমাকে শত্রু না-ও ভাবতে পারি। সব সময়েই আর-একটা অপশন রয়েছে। সেটা একই মুদ্রায় শোধ না দেওয়ার। তোমার মুদ্রা আমার মুদ্রা নয়। আমার মুদ্রা ত্যাগের, তপস্যার, প্রেমের, মৈত্রীর। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য এঁরা তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমরা তাঁদের দুর্বল উত্তরপুরুষ। দুর্বল বলেই আমরা অহিংসাকে পরিণত করেছি দুর্বলের অহিংসায়। বীরের অহিংসা গান্ধীজীর মতো অল্প কয়েকজনের মধ্যেই নিবদ্ধ। দোষটা অহিংসার নয়, দোষটা আমার মতো দুর্বল মানুষের। তবে যতই দুর্বল হই না কেন আমার চেয়ে যে দুর্বল তার গায়ে আমি হাত দেব না। তার জ্ঞাতিরা যদি অন্যায় করে তবে সে অন্যায়ের শোধ আমি তার উপর তুলব না। নিরীহ মানুষের উপর বদলা নেওয়া অধর্ম। যে-কোনো ধর্ম এই শিক্ষাই দেয়। আমরা বীর হতে না পারি গুণ্ডা হব কেন? আজকের দিনে গুণ্ডারাই হয়েছে বীর। আর বীরদের দেখা নেই। এমন এক লজ্জাকর অধ্যায় আমাদের ইতিহাসে

খুঁজে পাইনে। আমার প্রাচ্য, আমার প্রাচীন, আমাদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ এসব উক্তি এখন আত্মপ্রতারণা। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে, মানস। আমি জানি এই পার্টিশন ইনেভিটেবল নয়, কিন্তু এটাও জানি যে হিংসা প্রতিরোধের শক্তি আমাদের কারোই নেই, বাপুই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁকে আমরা মরতে দিতে পারিনে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু হিন্দু মুসলমানকে বাঁচানোর জন্যে তাঁর বেঁচে থাকা দরকার। ব্রিটিশ বেয়োনেট তাদের বাঁচাতে পারবে না, ইণ্ডিয়ান বেয়োনেট তাদের বাঁচাতে পারবে না, বাঁচাতে পারবে একমাত্র বাপুর আত্মিক শক্তি। সোল ফোর্স। বাপু তো যে-কোনো দিন মরতে প্রস্তুত। মরণকুণ্ঠ তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। কিন্তু যতদিন একজনও সংখ্যালঘু হিন্দু বা মুসলমান তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে ততদিন তাঁকে বাঁচতে হবে।" সৌম্য মানসকে যত্ন করে বোঝায়। যূথিকা ততক্ষণে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুতে গেছে।

"যাক, তুমি পিতৃভক্ত কাসাবিয়াঙ্কা হতে তৈরি হচ্ছ না তো, যদি তাঁর হঠাৎ কিছু একটা হয়? ভগবান না করুন।" মানস জিব কাটে।

"তার আগে আমরা তাঁর পুত্ররা চেষ্টা করব আগুন যাতে না লাগে। বাংলাদেশের পাটাতনে।" সৌম্য আর কী করতে পারে?

দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপ গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছয়। মানস বলে, "সৌম্যদা, এটা আমাদের সত্যের মুহূর্ত। সত্যের স্থান অহিংসারও পূর্বে। ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে। সত্যটা এই মুহূর্তে কী? সত্যটা কি এই যে হিন্দু মুসলিম সমস্যার মূলে তৃতীয় পক্ষের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি? এহো বাহ্য, আগে কহ আর। সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে ইসলাম প্রবর্তনের পর কেবলমাত্র ভারতে নয়, ঈজিপ্টে, সীরিয়ায়, মেসোপোটেমিয়ায়, ইরানে, মধ্য এশিয়ায়। ইসলাম যে দেশেই গেছে সে দেশের মানুষ নতুন ধর্মকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ধর্মকে বর্জন করেছে। পুরাতন ইতিহাসকে অস্বীকার করেছে। পুরাতন ঐতিহ্যকে বাতিল করেছে। আরবী ভাষার নামকরণের ফলে নিজেদের আরব বা আরবতর মনে করেছে। আরবদের পূর্বপুরুষরাই তাদের পূর্বপুরুষ, ভারতীয়দের বা ইরানীদের বা ঈজিপসিয়ানদের পূর্বপুরুষরা তাদের পূর্বপুরুষ নয়। অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করেছে যারা তাদের নাম হয়েছে হিন্দু বা পার্শী বা কপ্ট। তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী বা পলাতক। হাজার বছর পরে দেখা যাচ্ছে ইসলাম ভারতের

সমস্তটাকে বা সবাইকে ইসলামাইজ করতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ ও অধিকাংশ অঞ্চল ভারতীয়ই রয়ে গেছে। অপর পক্ষে ভারতও বহিরাগত গ্রীকদের মতো, বহিরাগত শক হূণ কুষাণদের মতো, বহিরাগত আরব, তুর্ক, মোগলদের ইণ্ডিয়ানাইজ করতে পারেনি। ভারতের আত্তীকরণের শক্তিও ইসলামধর্মী আরব, তুর্ক, মোগলদের বেলা নিস্তেজ হয়েছে। ফলে ওরা ভারতীয় হয়নি। তাই এখন পাকিস্তানী হচ্ছে।"

সৌম্য নীরবে শুনে যায়। মানস বলে যায়, "এখানে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। ভারতীয় হওয়া আর হিন্দু হওয়া এক নয়। হিন্দু না হয়েও পার্শীরা ভারতীয় হয়েছে। কেউ তাদের হিন্দু হতে বলেনি, তারাও তাদের স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস বর্জন করেনি। যে হিন্দু সে ভারতীয় হতে পারে, কিন্তু যে ভারতীয় সে হিন্দু না-ও হতে পারে। মুশকিলটা এইখানে যে ইণ্ডিয়ান আইডিয়া সফল হলে ইসলামিক আইডিয়া সফল হয় না। তেমনি, ইসলামিক আইডিয়া সফল হলে ইণ্ডিয়ান আইডিয়া সফল হয় না। ইণ্ডিয়ান বনাম ইসলামিক এই দুই আইডিয়া দুটি স্রোতের মতো মিশে যায়নি। যে যার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সহ-অবস্থান করে এসেছে। সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদেই এল স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী। সেই একই তাগিদে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ইংরেজদের হাত ছিল এটা যেমন সত্য ওটাও তেমনি সত্য যে প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলিম নেতাদেরও আগ্রহ ছিল। ইংরেজরা চলে গেলেও প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলিম নেতারা থেকে যান। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌথ নির্বাচন বা যৌথ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা চলে না। ইণ্ডিয়া বনাম ইসলাম এই দুই শক্তির সংঘর্ষ রোধ করার অন্য কোনো উপায় ছিল না বলেই ভারতভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ, পাঞ্জাবভঙ্গ। মাঝখানে লৌহ প্রাচীর।"

"তুমি কি বলতে চাও ভাঙা দেশ আর কখনো জোড়া লাগবে না? ভাঙা প্রদেশও আর কখনো জুড়ে যাবে না?" সৌম্য আহত স্বরে সুধায়।

"উভয় রাষ্ট্র যদি সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ না হয় তা হলে এটাই হচ্ছে ফাইনাল তথা পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট। তবে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাব সম্বন্ধেও একই কথা। প্রেমও কাজ করছে, কেবল ঘৃণা নয়।" মানস ভরসা দেয়। অন্ধকার রাত্রে আকাশভরা তারার দিকে তাকায়।

॥ সতেরো ॥

সেদিন মাঝরাতে শুতে যাবার আগে সৌম্য বলে, "আমার আশা ছিল অহিংস ভারত হবে অখণ্ড ভারত। ভারত অহিংস থাকেনি, তাই খণ্ডিত হয়েছে। তবু সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষ এক ও অবিভাজ্য। সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের জনগণ অহিংস। এখন বল পাকিস্তান সম্বন্ধে তোমার কী গণনা? পাকিস্তানের বাঙালীরা কি আবার ভারতীয় হবে?"

"হিন্দুরা হতে চাইবে। মুসলমানরা হতে চাইবে না। ওদের বিবর্তন অন্য ধারা ধরবে। বিবর্তন সূত্রে ওরা বাঙালী হতে পারে। কিন্তু ফের ভারতীয় হবে না। মাইনরিটি হতে তারা নারাজ। ভারত ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক দেশ নয়। তার ভিত্তি ঐতিহাসিক পরম্পরা। যে পরম্পরায় ছেদ কোনোদিন পড়েনি। পড়বেও না। বিচ্ছিন্ন হলে বাঙালী মুসলমান তার সঙ্গে খাপ খাবে কী করে? জোড় মেলাবে কী করে? পরম্পরাভঙ্গের পর খেই হারিয়ে যাবে। খেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙালী হিন্দুও অভারতীয় হতে রাজী হবে না। বাঙালী মুসলমান যদি ভারতীয় হতে নারাজ হয় তো এই বিচ্ছেদই চূড়ান্ত ও চিরন্তন। তবে পরিপূরণের আশা আছে।" মানস সাঙ্গ করে।

"সৌম্যদা", পরের দিন ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করতে করতে যূথিকা বলে, "যে ব্যক্তি নিজের একমাত্র কন্যাকে ত্যাজ্যকন্যা করতে পারে সে কি মানুষ না মনস্টার? পাকিস্তান হতে যাচ্ছে সেই মনস্টারের মুলুক, মনস্টারিস্তান। সময় থাকতে সব হিন্দুকেই, অন্তত সব বর্ণ হিন্দুকেই, মানে মানে অপসরণ করতে হবে। যারা পড়ে থাকবে তারা দফায় দফায় মুসলমান হবে। কী করবে? প্রাণ বড়ো না ধর্ম বড়ো?"

সৌম্য বুঝতে পারে ওটা যূথিকার নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মিলে যায়। সেও তো ত্যাজ্যকন্যা। বলে, "জিন্না সাহেব যাঁকে বিয়ে করেছিলেন সেই রতনপ্রিয়া পেতিতও ত্যাজ্যকন্যা হয়েছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস রতনপ্রিয়ার কন্যা দীনাকেও ত্যাজ্যকন্যা হতে হলো। ট্র্যাজেডীর পর ট্র্যাজেডী। জিন্না সাহেবের জীবনটাও কম ট্র্যাজিক নয়। পত্নীহারা হয়ে তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার

মধ্যেই সান্ত্বনা খোঁজেন। লোকে যেমন আফিমের মধ্যে। লেনিন বলতেন ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। আমি হলে বলতুম, ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু, বোন, মনস্টার কেন তাঁকে বলব? পাকিস্তানও মনস্টারিস্তান নয়। সেখান থেকে হিন্দুদের গণ অপসরণ হবে গণ পলায়ন। আমরা কি গণ পলায়ন সমর্থন করতে পারি? বাপুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথাও হয়েছে আমার। তিনি নোয়াখালী ফিরে আসছেন গণ পলায়ন রোধ করতে। পাকিস্তানই বলো আর মনস্টারিস্তানই বলো, দেশটা তো পূর্ববঙ্গ। শিকড় তো সেইখানকার মাটিতে। শিকড়সুদ্ধ টেনে তুললে আর কোথাও কি শিকড় লাগানো সম্ভব হবে? এটাই একটা মনস্ট্রাস রেমিডি। রোগের চেয়ে দাওয়াই ভয়ঙ্কর।"

যুথিকা মনে মনে চটে যায়। বলে, "নোয়াখালী হবে বাপুর জীবনের ওয়াটারলু। সেখানে তাঁর না যাওয়াই শ্রেয়।"

"সেকথা বললে তিনি জেদ করে যাবেনই। আমরাও বুঝতে পারছি যে বর্তমান অবস্থায় নোয়াখালী গিয়ে বিশেষ কোনো ফল হবে না। যারা পালাবার তারা পালাবেই। যদি না মুসলিম নেতাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়। হতে পারে, যদি কলকাতা শান্ত হয়। নোয়াখালী নির্ভর করছে কলকাতার উপরে। আর কলকাতা নির্ভর করছে সেখানকার হিন্দুদের শুভবুদ্ধির উপরে।" সৌম্য বিশ্বাস করে।

"জ্যাঠামশায়, আমার জন্যে তুমি কী এনেছ?" মণি মনে করিয়ে দেয়।

"ঐ যাঃ! ভুলে গেছি। তোদের জন্যে এনেছি দিল্লীকা লাড্ডু। যা দেশবাসী এখন খুশি হয়ে খাচ্ছে। পরে পশতাবে।" সৌম্য তার ঝোলা উজাড় করে এই বলে বিদায় নেয়।

ভারত ভেঙে পাকিস্তান হতে যাচ্ছে বলে মুসলমানরা খুশি, হিন্দুরা অখুশি। বাংলাদেশ ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ হতে যাচ্ছে বলে হিন্দুরা খুশি, মুসলমানরা অখুশি। যেখানে হাসি বা কান্না এক নয়, সেখানে পরিবার বা নেশন এক নয়। এখন থেকেই তার লক্ষণ স্পষ্ট। আরো স্পষ্ট হবে আরো দু'মাস পরে পনেরোই আগস্ট।

"লক্ষ করেছ কি না, জানিনে, আগস্ট মাসের নয়ই তারিখে কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব পাশ আর পনেরোই তারিখে সত্যি সত্যি ভারত ত্যাগ। মাঝখানে পাঁচবছর ব্যবধান। তেমনি আগস্ট মাসের ষোলই তারিখে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা আর পনেরোই তারিখে সত্যি সত্যি পাকিস্তান লাভ। মাঝখানে এক

বছর ব্যবধান। আগস্ট মাসটার কী মহিমা! স্বাধীনতার সঙ্গে আসছে পার্টিশন, যেন আলোর সঙ্গে ছায়া।" মানস বলে যূথিকাকে।

"যত হাসি তত কান্না বলে গেছেন রাম শর্মা।" যূথিকার মন্তব্য।

"কান্নার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। শুধু হাসির জন্যে নয়। জানিনে পনেরোই আগস্ট কোন্‌খানে থাকব। যেখানেই থাকি হিন্দুর দুঃখ বা মুসলমানের দুঃখ দেখতে হবে। সে দুঃখ মোচন করতে পারব কি না জানিনে। হিন্দু অফিসাররা সবাই যদি ওপারে চলে যান এপারে আমি একা থেকে ক'জন হিন্দুকে রক্ষা করতে পারব? তেমনি, মুসলিম অফিসাররা সবাই যদি এপারে চলে আসেন ওপারে আমি একা থেকে ক'জন মুসলমানকে অভয় দিতে পারব? পেছনে সরকার থাকা চাই। সরকার যদি সরষে হয় ও তার ভিতরেই যদি ভূত থাকে তবে নিজে বাঁচব কি না সন্দেহ। আমার পদত্যাগই শ্রেয়, কিন্তু তা হলে সেটা হবে সেইসব নিরীহ মানুষকে ত্যাগ যারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তা ওরা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। সেটা হবে একপ্রকার বিট্রেয়াল। কারণ বিচারক হিসাবে আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, আমি তার ঊর্ধ্বে।" মানস উচ্চস্বরে চিন্তা করে।

"হ্যাঁ, তোমার সামনে বিবেকের সঙ্কট।" যূথিকা সহমর্মী।

মানসের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করতে আসেন। পার্টিশনের প্রসঙ্গ ওঠে। সাবজজ হরনাথ কাঞ্জিলাল দুর্বল গোবেচারি মানুষ। কেউ কখনো তাঁকে উত্তেজিত হতে দেখেনি। তিনিই আগুন হয়ে বলেন, "আমাদের সেই সোনার চাঁদ ছেলেরা আজ গেল কোথায়? গান্ধীকে কেউ গুলী করতে পারে না?"

মানস শক পেয়ে বলে, "সে কী, সাবজজ সাহেব। আপনি কি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের কথা বলছেন? ওরা কেন গান্ধীজীকে গুলী করে মারবে?"

"উনি কেন বাঙালী হিন্দুকে বাঁচতে দিচ্ছেন না? বাঙালী হিন্দু কেমন করে বাঁচবে, বাংলাদেশ যদি পার্টিশন না হয়, পশ্চিমবঙ্গ যদি হিন্দুর ঘাঁটি না হয়? সংযুক্ত বঙ্গ একটা বর্ণচোরা পাকিস্তান।" সাবজজ রায় দেন।

"প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীরা তো তাঁকে দোষ দিচ্ছে, কেন তিনি পার্টিশন সমর্থন করছেন। ভারতের পার্টিশন।" মানস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"তার মানে তিনি পাকিস্তান সমর্থন করছেন। সেই খেলাফত আন্দোলনের মতো। তিনি মুসলমানের মিতা। হিন্দুর দুশমন। কেউ তাঁকে মারে না কেন?" সাবজজ বিস্মিত।

একদিন আফগান সাহেব আসেন কর্ম উপলক্ষে মানসের চেম্বারে। কাজ সারা হলে বলেন, "এ কী হলো, সার? এমন তো কথা ছিল না। সেবার সেটলড ফ্যাকটকে আনসেটল করতে গিয়ে জেলে গেলেন যাঁরা, দ্বীপান্তরে গেলেন যাঁরা, ফাঁসী গেলেন যাঁরা এবার তাঁরা বা তাঁদের আত্মীয়স্বজনরাই কিনা তাকে রিসেটল করলেন! আবার বঙ্গভঙ্গ। এখন একে আনসেটল করবে কারা?"

মানস সকৌতুকে উত্তর দেয়, "কেন? আপনারা? আপনারা আওয়াজ তুলতে পারেন, পার্টিশন রদ হোক, বাংলার পার্টিশন, ভারতের পার্টিশন।"

"ভারতের পার্টিশন রদ হলে তো পাকিস্তান থাকবে না, সার। আমরা যে পাকিস্তানও চাই, বাংলাদেশও চাই।" আফগান সাহেব খোলসা করেন।

"সেইখানেই তো গোল। বাংলাদেশ বলতে বোঝায় বাঙালীদের দেশ। আর বাঙালী বলতে বোঝায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, সবাই। অপর পক্ষে পাকিস্তান বলতে বোঝায় মুসলমানদের স্থান, আর মুসলমান বলতে বোঝায় বাঙালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বিহারী মুসলমান, সবাই। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের সামিল হয় বাঙালী হিন্দুকে দেশত্যাগ করতে হবে। তার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসবে নানা প্রদেশের অবাঙালী মুসলমান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন হবে উর্দুভাষী, গুজরাটীভাষী, পাঞ্জাবীভাষী। তারা বাংলার ধার ধারবে না, উর্দু চাপিয়ে দেবে। আমরা দেখি আপনারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। সেলফ-ডিটারমিনেশন মানুষের জন্মগত অধিকার। আপনাদের বাধা দেওয়া নিষ্ফল। সংখ্যায়ও আপনারাই বেশী। আমরা তা হলে করি কী? দেশত্যাগ না দেশভাগ? দুটোই মন্দ। বেছে নিতে হলে দেশভাগই কম মন্দ।" মানস মনে করে।

"ওটা হলো অভিমানের কথা। রাগের কথা। আপনারাও বাঙালী, আমরাও বাঙালী। বাঙালী বাঙালীকে খেদিয়ে দিতে পারে? আমরা কি আসামী যে বঙ্গালখেদা করব? আর ওই বেটা বিহারীদের চায় কে? হলোই বা মুসলমান। ওরা শুনছি এর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। পাঁচ লাখ না কত। আপনারা রজ্জুতে সর্পভ্রম করছেন। আমরা সর্প নই। সর্প হচ্ছে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, খোট্টা। ওরাই পশ্চিমবঙ্গে গেড়ে বসবে।" আফগান সাহেব হুঁশিয়ারি দেন।

"কিন্তু আগা সাহেব,' মানস সসম্মানে বলে, "বাঙালী নেশনের জন্যে বাংলাদেশ আর মুসলিম নেশনের জন্যে পাকিস্তান এ দুটোর ভিতরেই যে গরমিল। কোন্‌টার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন? ঝগড়াঝাটি, খুনোখুনি, লুটতরাজ, নারীহরণ ইত্যাদি তো লেগেই থাকবে।"

আফগান সাহেব হেসে ফেলেন। "ওঃ! এই কথা! বার লাইব্রেরীর ইয়ারদের আমি বলি, আরে বাবা, আমরা যদি তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে থাকি তোমরাও আমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাও না কেন?"

মানস হাসি চাপতে পারে না। "শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়েছেন? শ্রীকান্তর কাবুলী সহযাত্রীরা রসগোল্লার হাঁড়ি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় রেখে যায় কাবুলী রুটি। আপনি দেখছি সত্যি একজন কাবুলী। বিশুদ্ধ আফগান।"

প্রথমটা পুলকিত হলেও এর মর্ম অনুধাবন করে আফগান সাহেব ক্ষুণ্ণ হন। "একটা কথা বলে যাই, সার। মনে রাখবেন। অন্তর্বিবাহ বিনা এক নেশন হয় না।'

"আমিও একটা কথা বলি, আগা সাহেব। মনে রাখবেন। অস্তহর্রণ অন্তর্বিবাহ নয়। এটা শুভ, ওটা অশুভ। পার্টিশনের ওটাও একটা নিমিত্ত।" মানস গম্ভীরভাবে বলে।

আর একদিন শ্রদ্ধা জানাতে আসেন মুনসেফ আবুল কাসেম চৌধুরী। বলেন, "আমাদেরও কিছু জমিদারি আছে। জমিদারি কর্মচারীরা কিন্তু সকলেই হিন্দু। কেন, জানেন?" মুচকি হেসে বলেন, "হিন্দুরা খায়, কিন্তু মালিকের জন্যে রেখে খায়। আর মুসলমানরা খায় লুটে পুটে।"

মানস আশ্চর্য হয়। "তা তো জানতুম না। মুসলিম জমিদারের হিন্দু ম্যানেজার দেখেছি। তেমনি হিন্দু জমিদারের মুসলিম বরকন্দাজ।"

"সেইভাবেই মুসলিম আমলে একটা ডিভিসন অভ্ লেবার হয়েছিল। দেওয়ানি বিভাগটা ছিল হিন্দুদের হাতে। তারাই খাজনা আদায় করত, হিসাব রাখত। ফৌজদারি বিভাগটা ছিল মুসলমানদের হাতে। তারাই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করত, বিদেশীর সঙ্গে লড়ত। মুসলিম আমল যাকে বলা হয় আসলে সেটা হিন্দু মুসলমান উভয়ের এজমালী আমল। নইলে কি তা পাঁচশো বছর টিকত? বলা বাহুল্য, সৈন্যদলেও হিন্দু নেওয়া হতো, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও মুসলমান। ব্রিটিশ আমলে একটা বিপর্যয় ঘটে যায়। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা তাদের ভাগটা বাড়িয়ে নেয়। মুসলমানরা

ইংরেজের উপর রাগ করে ইংরেজী শিক্ষাকেও বয়কট করে। পরে যখন হুঁশ হয় তখন দেখে হিন্দু খরগোস এত দূর এগিয়ে রয়েছে যে প্রতিযোগিতায় মুসলিম কচ্ছপের জেতার আশা নেই। একমাত্র ভরসা সেপারেট কোটা, নমিনেশন ইত্যাদি। সেইসূত্রে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মনোমালিন্য। ঝগড়া। দাঙ্গা। পার্টিশন। পাকিস্তান। হিন্দু অফিসাররা শুনছি সদলবলে পাকিস্তান পরিত্যাগ করবেন। সেটা কি ঠিক হবে? ভবিষ্যতে মেলামেশার সুযোগ কোথায়? মিলনের সেতু কোথায়?"

মানস এর উত্তর দিতে পারে না। জাহাজডুবির সময় ইঁদুরই সকলের আগে পালায়। চাকুরে হিন্দুর অবস্থাটা ইঁদুরের মতো। মাথার উপরে ইংরেজ থাকতে যারা দাপটের সঙ্গে শাসন করেছে, বিচার করেছে, ধরপাকড় করেছে, খাজনা আদায় করেছে মাথার উপর থেকে ইংরেজ নেমে গেলে তাদের দাপটও ধূলিসাৎ। হিন্দু অফিসার যাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসেন তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গেই কুইট করতে উদ্‌গ্রীব। নয়তো মানসম্মান থাকবে না। মানস নিজেও তাঁদের একজন। সে মনে মনে স্থির করে রেখেছে যে পাকিস্তানী নিশানকে স্যালিউট করবে না।

একদিন অভ্যাগত হন পুলিশ সাহেব ফজলে রাব্বি। তাঁর সঙ্গেও এই নিয়ে কথাবার্তা। তিনি বলেন, "আপনারা দেশকে ভালোবেসেছেন, কিন্তু দেশের মানুষকে ভালোবাসেননি। সেই অভিমান থেকেই পাকিস্তান। আপনাদের ধারণা বাঙালী বলতে বোঝায় কেবল বাঙালী হিন্দু। বাঙালী মুসলমান বাঙালী নয়। সে শুধু মুসলমান। প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ধারণাও তার অনুরূপ। আপনারাই বাঙালী, আমরা শুধু মুসলমান। দেশ ভাগ হবার আগে থেকেই মানুষ ভাগ হয়ে রয়েছে। মানুষ ভাগ হয়ে রয়েছে বলেই দেশ ভাগ সম্ভব হচ্ছে। খুব যে কেউ কাতর তা মুখ দেখে মনে হয় না। কিন্তু তলে তলে সকলেই দুঃখিত। যেমন আপনারা তেমনি আমরাও। যাক, আমাকে অপশন দিলে আমি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নকেই পছন্দ করব। কারণ পাঞ্জাবী আর হিন্দুস্থানী মুসলমানরাই পূর্ব পাকিস্তানের হর্তা কর্তা হবে, আর আমাকে হয়তো অন্য কোনো প্রদেশে পাঠাবে। ধর্মের চেয়ে ভাষার টানটাও কম প্রবল নয়। আমি বাংলাদেশেই থাকতে চাই, তা এপারেই হোক আর ওপারেই হোক। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যদি সত্যিকার সেকুলার স্টেট হয় তবে মুসলমান বলে আমার প্রমোশন আটকাবে না।"

মানস তাকে আশ্বাস দেয় যে কংগ্রেস সরকার কখনো ধর্ম নিয়ে বাছবিচার করবে না। কংগ্রেসে বহু মুসলমান আছেন। তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব।

"কিন্তু কী দরকার? বাঙালী হিন্দু অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি তাঁরা কেউ পাকিস্তানে চাকরি করতে রাজী নন। তাঁদের খালি পদগুলো আপনারা বাঙালী মুসলমানরাই তো পাবেন। আপনাদের না দিয়ে অবাঙালী-দের দিলে তার প্রতিফল একদিন পেতে হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যথাকালের পূর্বে ডি. আই জি. হবেন।" মানস স্তোক দেয়।

তিনি মাথা নাড়েন। "আপনি বুঝতে পারছেন না, পাকিস্তান দুই নয়, এক। অন্তত উচ্চতর পদগুলোর বেলা। আমাকে যে-কোনোদিন কোয়েটায় বা ডেরা গাজীখানে বদলী করে দিতে পারে। সেখানে আমি মাছভাত খেতে পাব না, বাংলায় কথা কইবার লোক পাব না। বাংলা গান শুনতে পাব না। সবচেয়ে কষ্ট হবে আমার ওয়াইফের, যদি আমি বিয়ে করি।"

"ওমা, সে কী?" যূথিকা বলে, "অপনি এখনো বিয়ে করেননি? চারটির একটিও নেই? আপনি কী রকম মুসলমান?"

রাব্বি হেসে বলেন, "তার জন্যে খোঁটা খেতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। আমি যাঁর সঙ্গে এনগেজড তিনি কলকাতার মেয়ে, ধর্মে খ্রীস্টান। স্কুলমিস্ট্রেস। তিনি আমার জন্যে কলকাতা ছাড়বেন না, আমাকেই কলকাতায় পোস্টিং জোগাড় করতে হবে। সেটা হতেও যাচ্ছিল। এমন সময় রসভঙ্গ করল বঙ্গভঙ্গ। বাঙালী হিন্দুর যে এমন কূটবুদ্ধি তা আমি কেমন করে জানব? আমার ধারণা ছিল সমগ্র বাংলাদেশই পাকিস্তানের সামিল হবে। ইংরেজরাও কম কুটিল নয়। কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। ওদের জন্যে আমরা মুসলমানরা কী না করেছি? কত হিন্দুকে ধরপাকড় করে জেলে পুরেছি। পাকিস্তানে থাকলে ওরা শোধ নিতে পারবে না, সেইজন্যেই তো চেয়েছিলুম পাকিস্তান। পেলুম পাকিস্তান, কিন্তু পোকায় কাটা, বিকলাঙ্গ। না আছে কয়লা, না লোহা, না পেট্রল। কী এর ভবিষ্যৎ! সাতদিনের বিস্ময়! আর ওদিকে দেখুন ইণ্ডিয়া। কী নেই সেখানে? আর পশ্চিমবঙ্গ? কলকাতা একটি সোনার খনি। হিন্দুরাই সমস্তটা ভোগ করবে। তা করুক। ওরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। ত্যাগের পুণ্যে ভোগ। আমি ওদের ঈর্ষা করিনে, দিদি। তবে আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে।"

"বলুন, কী জিজ্ঞাসা।" যূথিকা সহানুভূতিতে গলে যায়।

"হিন্দুরা বলে ওরা পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি। বিজ্ঞতমও বটে। এই কি তাদের বিজ্ঞতার নিদর্শন? দেশভাগ, প্রদেশভাগ। বরাবরের মতো।" রাব্বি সুধান।

মানসই উত্তর দেয়। "গরডিয়ান নট কাকে বলে জানেন তো? যে গিঁট হাত দিয়ে খুলতে পারা যায় না। যাকে এক কোপে কাটতে হয়। হিন্দু মুসলিম সমস্যা তেমনি একটি গরডিয়ান নট। তাই দেশের ও প্রদেশের মানচিত্রটাকে কাঁচি দিয়ে কচ করে কাটতে হলো। এটা যদি সমাধান হয়ে থাকে তবে এর মুখ্য কৃতিত্ব কায়দে আজম জিন্নার, গৌণ কৃতিত্ব কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের। বড়লাটের কী দোষ? তিনি তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কাঁচি না চালাতে। বিজ্ঞ মানুষ গান্ধীজী এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু দাঙ্গা থামাতে না পারলে তাঁর কথার কী দাম? আর বড়লাটেরই বা কী ক্ষমতা? প্রয়োজন ছিল একটা রাজনৈতিক মীমাংসার। সেটা নিখুঁত না হলেও অধিকাংশ হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমানের সম্মতি পেয়েছে। বরাবরের মতো কি না ভাবীকাল জানে।'

রাব্বি ওঠেন। বলেন, "আশ্চর্য হবেন না যদি দেখেন আমিও কলকাতায় পোস্টেড হয়েছি। পাকিস্তানী নাগরিকরূপে নয়, ভারতীয় নাগরিকরূপে। সেটাই আমার অপশন। বাকীটা তদ্বির। আমার নয়, আমার ফিঁয়াসীর।"

অধ্যাপক শরফুদ্দীনকে মানস কট্টর মুসলমান বলেই জানত। তা হলেও তিনি ছিলেন তার বহুদিনের সাহিত্যিক বন্ধু। বাংলাসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। কাছাকাছি অন্য এক জেলায় তাঁর চাকরি। একদিন ছুটি নিয়ে মানসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বলেন, "কে জানত যে পাকিস্তান হলে আপনারা বাঙালী হিন্দুরা সবাই আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? তাই এলুম বিদায় দিতে ও নিতে।"

দু'চার কথার পর তিনি বিমর্ষভাবে বলেন, "হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা সেকালে ছিল ধর্মীয় বিরোধ। একালে কিন্তু তা নয়। একালের বিরোধটা জমিদারে আর প্রজায়, মহাজনে আর খাতকে, পলিটিসিয়ানে আর পলিটিসিয়ানে, চাকুরেতে আর চাকুরেতে। এটা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা। জমিদারি যদি উঠে যায়, মহাজনী যদি বন্ধ হয়, পলিটিসিয়ানরা

যদি যে যার এলাকায় মন্ত্রিত্ব করেন, চাকুরেতে চাকুরেতে যদি প্রতিযোগিতা না হয় তবে এ বিরোধ ক্রমশই এর সার্থকতা হারাবে। তখন দেখবেন হিন্দুতে হিন্দুতে বিরোধ, মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ। আমার ছাত্রের কাছে আমি একজন বুর্জোয়া, আপনার পিয়নের কাছে আপনিও একজন বুর্জোয়া।"

মানস বলে, "ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কী করা যায়? ইতিহাস তো একঠাঁই পায়চারি করতে পারে না। একটা ঝামেলা মিটতে না মিটতে আরেকটা শুরু হবে। এপারেও, ওপারেও, এ সমাজেও, ও সমাজেও। একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? ইংরেজের পর যেমন ভারতীয় বা পাকিস্তানী, জমিদারের পরে কে? মহাজনের পর কে?"

তিনি আমতা আমতা করে বলেন, "মহাজনের পর কে তা আমার অজানা। কিন্তু জমিদারের পর জোতদার এটা স্বতঃসিদ্ধ। স্টেট নয়, স্টেট কিছুতেই নয়। জোতদারই হচ্ছে আমাদের গ্রাম্য অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জোতদার না থাকলে গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। শহর ভরে যাবে গ্রামের বুভুক্ষু মানুষে। তাদের কে জোগাবে খাদ্য? ফসল ফলাবেই বা কে?"

"আপনিও কি জোতদার নাকি?" মানস জেরা করে।

"জী। আমরা বর্ধিষ্ণু জোতদার। প্রতিবেশী হিন্দু জোতদারদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্প্রীতি। সেইজন্যে গ্রাম অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নেই। মামলা বাধলে মুসলমানে মুসলমানে বাধে, হিন্দুতে হিন্দুতে বাধে। শরিকানা মামলা। কাজিয়ার মামলা নিশ্চয়ই আপনার কোর্টে এসেছে। দু'পক্ষই মুসলমান। হিন্দু উকীলদেরও মওকা। লাঠি, সড়কি, ঢাল, তরোয়াল, কোচ, বন্দুক নিয়ে সে কী লড়াই! হুঙ্কার ছেড়ে দুই গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসে দুই দল জোয়ান। প্রথমে বাক্যবর্ষণ, তারপরে উরু চাপড়ানি, তার পরে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই।" অধ্যাপক আশ্বাস দেন।

মানস তার পুরনো প্রশ্নে ফিরে যায়। "জোতদার কি চিরস্থায়ী না তার পরেও কেউ আছে? যেমন ভূমিহীন কৃষক। রুশদেশে ওরা জমিদারদের পর জোতদারদেরও উচ্ছেদ করেছে, জানেন। লিকুইডেশন অভ্ দ্য কুলাকস। এদেশেও কি তেমন কিছু ঘটবে না?" মানস চেপে ধরে।

"ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে। এই হচ্ছে পন্থা। কিন্তু কোথায়? আসাম তো আপনারা আমাদের ছেড়ে দিলেন না?" তিনি অনুযোগ করেন।

"সিন্ধুপ্রদেশ তো ছেড়ে দিয়েছি। সেখানে ভূমির অভাব নেই, লোকের অভাব। একই পাকিস্তান। ভূমিহীনরা না হয় সেখানেই যাবে।" মানস তাঁকে ভাবতে বলে।

আপিস আদালতের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগেই হিন্দুর সংখ্যা বেশী। কেরানীর পর্যায়ে পর্যন্ত। এরা সবাই একসঙ্গে দেশান্তরে গেলে সব ক'টা আপিস আদালত বিপর্যস্ত হবে। মুসলিম লীগ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের মুখপাত্রদের অভয় দেন যে ব্রিটিশ সরকারের নিয়মকানুন তাদের বেলাও বলবৎ থাকবে। কারো চাকরি যাবে না। কারো প্রমোশন আটকাবে না। জিন্না সাহেব স্বয়ং বিবৃতি দেন যে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী নাগরিক ও সম অধিকারী। ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। রাষ্ট্রের ব্যাপার নয়।

তা সত্ত্বেও একধার থেকে প্রায় সকলেই ইণ্ডিয়ার অনুকূলে অপশন দেয়। এমন কী, চাপরাসী আর্দালী প্রোসেস সার্ভার দপ্তরী পর্যন্ত। মানস তো অবাক!

"তোমরা কী করে ওদেশে গিয়ে সংসার চালাবে? তোমাদের তো মাইনেয় কুলয় না। জোত জমি আছে বলেই সংসার চলে।" মানস বলে।

"কোনো মতে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পেলেই বর্তে যাই। আর সব পরে হবে। কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আর নয়। সরকার আশ্বাস দিলে কী হবে, মুসলমানের মুরগী পোষা। ঘাড় মটকাবার ভয় দেখাবার লোকও তো কম নেই। আমরা গেলেই ওদের হাড় জুড়ায়। আমাদের পদগুলো ওরাই পায়।" তারা একবাক্যে নিবেদন করে।

"তোমাদের জায়গা জমির কী হবে?" মানস সুধায়।

"ওসব গেলে আবার হবে, কিন্তু চাকরি গেলে আবার হবে না। তখন তো পালাতেই হবে। আগে থেকে কেন নয়?" তারা উত্তর দেয়।

তাদের হয়ে হেড ক্লার্ক নবীনকিশোর শর্মা সরকার বলেন, "সার, সেই তিনটি মাছের গল্প নিশ্চয়ই পড়েছেন। জেলেরা মাছ ধরতে আসবে শুনে অনাগতবিধাতা একটা দিনও সবুর করে না। সঙ্গে সঙ্গে পালায়। প্রত্যুৎপন্নমতি ধরা পড়ে। কিন্তু তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সে জালটাকে কামড়ে ধরে মরার ভাণ করে। জেলেরা যখন জালসুদ্ধ মাছ ধুতে নিয়ে যায় তখন সে ডুব মেরে বেঁচে যায়। দীর্ঘসূত্রী গড়িমসি করে।

কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারে না। জেলেরা তাকে বাড়ী নিয়ে যায় ও মেরে খায়। আমরা যারা কালবিলম্ব না করে অপশন দিয়ে চলে যাচ্ছি তারা অনাগতবিধাতা। যারা কিছুদিন থেকে নতুন সরকারকে একটা সুযোগ দিতে চায় তারা প্রত্যুৎপন্নমতি। বিপাকে পড়লে সব ছেড়ে ছুড়ে উধাও হয়ে যাবে। আগে থেকেই পরিবারকে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওপারে। বাকী থাকে যারা তারা শত অন্যায় সহ্য করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। তারা দীর্ঘসূত্রীর মতো মরবে। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।"

"না, না, বাঙালী মুসলমান কি অত নিষ্ঠুর হবে?" মানস মাথা নাড়ে।

"বাঙালী মুসলমান কি একমাত্র মুসলমান? বিহারী মুসলমানও আসছে। পাঞ্জাবী মুসলমান অফিসারে ভরে যাবে।" তিনি যতদূর জানেন।

"না, না, ওরাও কাউকে মারবে না।" মানস বিশ্বাস করে।

"সার, ইতিহাস কী বলে? ওদের একহাতে কোরান, আরেক হাতে তলোয়ার। এই সাতশো বছরে ওরা কি একটুও বদলেছে? ইংরেজ ছিল বলেই মুখোশ পরেছিল। এখন মুখোশ খুলবে। আমাদের সামনে হয় ধর্মান্তর, নয় দেশান্তর। আবার মূর্তিভঙ্গ, মন্দিরভঙ্গ।" নবীনবাবু হাত জোড় করেন।

একদিন পুলিশ, দু'ভাগ হয়ে মিছিল করে বেড়ায়। একদল হাঁকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। আরেকদল 'জয় হিন্দ্'। একদলের হাতে সবুজ নিশান। আরেকদলের হাতে তেরঙা ঝাণ্ডা। ওরাও অপশন দিয়েছে।

আমরা কোথায় আছি? ত্রিভঙ্গ সিভিল সার্ভিস। এক ভাগ রাজত্ব গুটিয়ে নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছে। আপাতত নিরপেক্ষ। আরেক ভাগ পাকিস্তানের জন্যে দিন গুনছে। আরো এক ভাগ স্বাধীন ভারতের দায়দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত হচ্ছে। স্বার্থের মিল কারো সঙ্গে কারো নয়। তিনটি পাখী যেন একই গাছের ডালে একটা রাত কাটাচ্ছে। ভোর হলেই কে কোথায় উড়ে চলে যাবে। আর দেখা হবে না।

বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্যে মাউণ্টব্যাটেনকে উভয় রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারল করার প্রস্তাব হয়। জিন্না সাহেব গোড়ায় রাজী হলেও পরে পেছিয়ে যান। তাঁর রাষ্ট্রের তিনিই হবেন গভর্নর জেনারল। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ইকুয়ালিটি। যেমন গান্ধীজীর জীবনের মূলমন্ত্র লিবার্টি। জিন্না সাহেব এইবার প্রমাণ করবেন যে তিনি রাজবংশীয় গভর্নর জেনারল লর্ড

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সমান মর্যাদাবান। তিনিও এক বড়লাট। সাধারণ মুসলমান জয়ধ্বনি করবে। বাদশা বনে গেলেও যে কেউ আরো উৎফুল্ল হতো না তা নয়। তবে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতো। সেটা মুসলিম লীগ পলিসি নয়। হিন্দুদের চেয়ে বেশী লয়াল হওয়াটাই মুসলিম লীগের আজন্ম অনুসৃত নীতি। কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাইবার আগে লীগ সেটা চেয়ে রেখেছে। কংগ্রেসকেও বাধ্য হয়ে সেটা চাইতে হয়েছে। নইলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। পার্লামেণ্টে চার্চিলের দল বিনা প্রতিবাদে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ করে দেন। সেটা কি তাঁরা করতেন, যদি ভারত প্রথম দিনেই রেপাবলিক হতো? পাকিস্তানের দিক থেকে যতদিন যুদ্ধের আশঙ্কা থাকবে ভারতকে ততদিন কমনওয়েলথে থাকতে হবে। তবে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর এই বন্দোবস্ত হয় যে কনস্টিট্যুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী যদি রেপাবলিকান কনস্টিটিউশন পাশ করে ব্রিটেন সেটা মেনে নেবে। তখন স্বাধীন ভারত কমনওয়েলথে থেকে যাবে।

কথাবার্তায় 'হিন্দুস্থান' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও আইন অনুসারে স্বাধীন ভারত হয় ইউনিয়ন অভ্ ইণ্ডিয়া। এতদিন ছিল এম্পায়ার অভ্ ইণ্ডিয়া। এম্পায়ার থেকে ইউনিয়ন একটা মস্ত বড়ো পরিবর্তন। এটার জন্যে দুইভাবে দাম দিতে হয়। প্রথমত, মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বা প্রদেশাঙ্গগুলিকে পৃথক হতে দিয়ে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে। ছিন্ন যেটা হলো সেটা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক। ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ করার পর ভারত সংক্রান্ত আর কোনো বিল পাশ করার এক্তিয়ার সে পার্লামেণ্টের রইল না।

বাকী রইল আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। সেটার আগে বাউণ্ডারি কমিশন বসবে। ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাউণ্ডারি লাইন নির্ধারিত হবে। সার সীরিল র‍্যাডক্লিফকে সে ভার দেওয়া হয়। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের উপর নির্ভর করছে কয়েকটি জেলার ও মহকুমার ভাগ্য। মুসলিম লীগ এখনো কলকাতা দাবী করে। সেইজন্যে কলকাতার হিন্দুরা এখনো হাতিয়ারে শান্ দিচ্ছে। স্বপনদার বাড়ীতে কোলাপসিবল আয়রন গেট লাগানো হয়েছে। দীপিকাদি লিখেছেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে একটা ছায়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়েছে। এঁরাই

অফিসার নির্বাচন করছেন। কাকে কোথায় বসাবেন স্থির করবেন। লীগ মন্ত্রীরা পূর্ববঙ্গ নিয়েই থাকবেন। লাটসাহেব কায়া ও ছায়া উভয় মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে সেতুবন্ধন করবেন। সুহরাবর্দী সাহেব অর্ধেক ক্ষমতা হারিয়েছেন। সেটা লাভ করেছেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ত্যাগী দেশসেবক। ইতিহাস তাঁকে একটা সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু তাঁর জন্মস্থানের মাটিতেই তিনি ক্ষমতাশূন্য বিদেশী। মালিকান্দাও তাঁর কাছে বিদেশ।

॥ আঠারো ॥

গভীর আনন্দ ও প্রগাঢ় বিষাদ মানসকে একই কালে অভিভূত করেছিল। দুই শতক পরে দাসত্ব দূর হচ্ছে, সেই সঙ্গে দাস মানসিকতাও, যা প্রচ্ছন্নভাবে সকলের জীবনে সক্রিয় ছিল। মানসও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজভক্তি ও দেশপ্রেমের জোড় মেলাতে গিয়ে সে নিজের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারেনি। এখন থেকে তার দ্বিচারিতার অবসান। তাই আনন্দ।

অথচ এ কী অদ্ভুত বিধিলিপি যে ইংরেজ যতদিন ইণ্ডিয়াও ততদিন! ইংরেজ চলে গেলে ইণ্ডিয়া বলে যা থাকবে তাতে না থাকবে পশ্চিম পাঞ্জাব, না সিন্ধুপ্রদেশ, না পূর্ববঙ্গ। 'জনগণমন অধিনায়ক' এই মহান সঙ্গীত কেমন করে তার জাতীয় সঙ্গীত হবে? অংশত অসত্য হবে না? তেমনি, 'বন্দে মাতরম্'? সপ্তকোটি কণ্ঠের বেশীর ভাগই তো এখন থেকে পাকিস্তানী। তাদের জাতীয় সঙ্গীত আর যাই হোক 'বন্দে মাতরম্' নয়। চর্মগত ভেদ যদি বা গেল ধর্মগত ভেদ এল। তাই বিষাদ।

"মীনিংলেস! অর্থহীন!" মানস রাত জেগে পায়চারি করে।

"চল, শুতে চলো। তুমি যার অর্থ খুঁজছ তা কোনোকালেই পাবে না। বৃথা তোমার শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ। মেনে নাও। মেনে নাও।" যুথিকা বলে।

"কেমন করে মেনে নেব, জুঁই? শুধু বাংলাদেশ নয়, বাঙালী জাতি দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওদের সাহিত্য দু'ভাগ হয়ে যাবে, সঙ্গীত দু'ভাগ হয়ে যাবে, শিল্প দু'ভাগ হয়ে যাবে, সংস্কৃতি দু'ভাগ হয়ে যাবে, পরে যারা জন্মাবে তারা দেখবে তাদের উত্তরাধিকার দু'ভাগ হয়ে গেছে। উত্তর-পুরুষের জন্যে আমরা কী রেখে যাচ্ছি, যা সার্বজনীন, যা কমন? বাংলাভাষা?

তার একভাগও তো উর্দুর মতো আরবী ফারসীবহুল হবে। অপর ভাগ হিন্দীর মতো সংস্কৃতবহুল। জনমনের কাছাকাছি যেতে এত যে সাধনা করলুম সব বৃথা। ভাষাই হচ্ছে মানুষের মনের রক্ত। সে রক্ত হিন্দুর রক্ত বা মুসলমানের রক্ত নয়। বাঙালীর রক্ত। তাকে বিভক্ত করা যায় না। গেলে দু'পক্ষেরই রক্তশূন্যতা। সাহিত্যও হবে রক্তশূন্য।" মানস বিলাপ করে।

"তা হলে কি তুমি চেয়েছিলে সারা বাংলা পাকিস্তানের পাকস্থলীতে তলিয়ে গিয়ে পরিপাক হয়ে যাক?" যূথিকা সকৌতুকে সুধায়।

"কক্ষনো না। আমি পাঁচহাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আমি কেন দেড় হাজার বছরের ইসলামী সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে যাব। আমি অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করব।" মানস উত্তর দেয়।

"তা হলে কি তুমি চেয়েছিলে স্বাধীন ও সার্বভৌম যুক্তবঙ্গ? যার শাসনতন্ত্রের মূলে যৌথ নির্বাচন।" যূথিকা জেরা করে।

"তাই বা কেমন করে বলি? সেই নজির অনুসরণ করত স্বাধীন ও সার্বভৌম আসাম, স্বাধীন ও সার্বভৌম ওড়িশা, স্বাধীন ও সার্বভৌম হায়দারাবাদ ইত্যাদি বলকান রাষ্ট্র। জবাহরলালের এই শঙ্কা আমারও শঙ্কা। দেশটাকে বলকান না বানিয়ে ইংরেজ একটা মহৎ কীর্তি করেছে। আমরা যদি বলকান হতুম তবে ইণ্ডিয়ান নেশন বলে কিছু থাকত না। ফেডারেশনই ছিল আমাদের অভীষ্ট। কিন্তু তার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক হলে হিন্দুপ্রাধান্য অবশম্ভাবী। জিন্না সাহেব তার জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ডাইরেক্ট অ্যাকশন তাঁর সহিংস প্রতিরোধ। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমদের চেয়ে সেপারেটিস্ট মুসলিমদের জোর বেশী। মুসলিম জনমত তাঁদের দিকে। পাকিস্তানের মূলে একটা ভাইটাল আর্জ। যুক্তি তার কাছে পরাস্ত।" মানস আক্ষেপ করে।

"সেপারেটিস্ট বলতে কি কেবল মুসলমান বোঝায়? শিখ বোঝায় না? পাঞ্জাবী হিন্দু বোঝায় না? বাঙালী হিন্দু বোঝায় না? যেখানেই মেজরিটির প্রাধান্য সেখানেই মাইনরিটির জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তোমার ধারণা সেপারেট ইলেকটোরেট থেকে সেপারেটিস্ট মুসলমান। তা নয়। সেপারেটিস্ট মুসলমান থেকেই সেপারেট ইলেকটোরেট। প্রথমবার বঙ্গভঙ্গ যে হয়েছিল সেটাও সেপারেটিস্ট মুসলমানদের খাতিরেই। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তার বিরোধী ছিলেন তাঁরা জানতেন যে বাংলাদেশ জোড়া লাগলে মুসলমানরাই হবে

মেজরিটি। ঢাকার বদলে তাঁরা কলকাতা পাবেন। নইলে কলকাতা পাবেন না। তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সুনিশ্চিত ছিল। চাকা ঘুরে গেছে। মুসলিম প্রাধান্যের ভয়ে বাঙালী হিন্দু আজ সেপারেটিস্ট। হিন্দুর ছেলে ফোর্থ হয়েও ডেপুটি হবে না, মুসলমানের ছেলে ফিফথ হয়েও ডেপুটি হবে। তারপর সেই হিন্দুর ছেলে যদি চাকরি চায় তো সাব-ডেপুটি হয়ে সেই ডেপুটির অধীনে কাজ করবে। হিন্দু এই অন্যায়ের হাত থেকে উদ্ধার পেতে বাংলাদেশের পার্টিশন চাইবে না? অথচ সে ন্যাশনালিস্ট। কারণ সে ব্রিটিশবিরোধী। এই মাপকাঠিতে মুসলমানদের অধিকাংশ ন্যাশনালিস্ট নয়। যারা ব্রিটিশবিরোধী তারা পাকিস্তানবিরোধী। তাদের জোর আর কতটুকু?" যূথিকা যতদূর বোঝে।

মানস চিন্তা করে বলে, "হিন্দুর হামবড়া ভাব ও মুসলমানের হামছোটা ভাব, সুপিরিয়রিটি ও ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, সাত আট দশক ধরে কাজ করে এসেছে। কংগ্রেসের আদিপর্ব থেকেই মুসলমানদের অনীহা। ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুর বিবাদে মুসলমানের কী? বিবাদটা যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের এটা যে কয়েকজন বোঝেন তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেন। যেমন, জিন্না সাহেব। তিনিও পরে বলে বসেন, আগে হিন্দু মুসলিম মিটমাট, পরে ইঙ্গ ভারতীয় মিটমাট! গান্ধীজীর মত এর বিপরীত। পরাধীন দেশের প্রথম কাজ স্বাধীনতা অর্জন। পরে সাম্প্রদায়িক মিটমাট। দেখা গেল কিপলিং-এর পূর্ব ও পশ্চিমের মতো হিন্দু ও মুসলিম 'নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল মীট।' দেশ দু'ভাগ, প্রদেশ দু'ভাগ। আমার তো আশঙ্কা ভারত ও পাকিস্তান 'নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল মীট।' তবে আশারও কারণ আছে। হিন্দু একদিন হিন্দুত্বের উর্ধ্বে উঠবে। মুসলমান ইসলামের উর্ধ্বে। ধর্মীয় অর্থে নয়, রাজনৈতিক অর্থে। অর্থনৈতিক অর্থে। অন্তঃপরিবর্তন বলতে আমি এই বুঝি। এর একটা আভাসও দেখতে পাচ্ছি। কোথায়, জানো?"

যূথিকা সংশয়ের স্বরে সুধায়, "কোথায়? তোমার মাথায়?"

"জিন্না সাহেবের ভাষণে। অবিশ্বাস্য, তবু সত্য।" মানস ড্রয়ার থেকে কাগজটা বার করে এনে পড়ে শোনায়। জিন্না বলেছেন:

"We are starting the State with no discrimination, no distinction between one community and another, between caste or creed, We are starting with this fundamental principle

that we are all citizens and equal citizens of one State. We should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time the Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual but in the political sense as the citizens of the Nation."

শুনতে শুনতে যুথিকার চোখে জল দেখা দেয়। সে বলে, "হ্যাঁ, ইনি আমার ছেলেবেলার সেই জিনা। তবে এঁর মেয়েটির কী অপরাধ ?"

"পার্টিশনের ফলে হিন্দুর হামবড়া ভাব ও মুসলমানের হামছোটা ভাব যদি দূর হয় তবে এর একটা মিনিং আছে। এটা একটা ছদ্মবেশী আশীর্বাদ।" মানস অবশেষে মেনে নেয়।

একদিন দেবাদিদেব গুহ আসেন দেখা করতে। সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সুনীলবরণ রক্ষিত। লাইডেন বিশ্ববিশ্ববিত্যালয়ের ডক্টরেট পেয়ে ইণ্ডোনেশিয়ায় গবেষণা করেছেন।

গুহ বলেন, "শুনছি কলকাতার হিন্দুরা স্বাধীনতাদিবসে সেখানকার মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করবে। পার্ক সার্কাস নাকি পাকিস্তান হয়েছে। সেটাকে হিন্দুরা হিন্দুস্থানে পরিণত করবে। মুসলমানদেরও দোষ আছে। র‍্যাডক্লিফ কমিশনের কাছে সওয়াল করেছে যে হুগলী নদীটাই নাকি নৈসর্গিক সীমান্তরেখা। কলকাতা তার পূব দিকে। অতএব পূর্ববঙ্গে। লড়াই করে ওরা যা পায়নি অ্যাওয়ার্ড হিসাবে পাবে। র‍্যাডক্লিফ যেন দ্বিতীয় এক ম্যাকডোনাল্ড। র‍্যাডক্লিফ তো পলিটিসিয়ান নন, তিনি একজন জজ। তিনি কি অমন একটা রোয়েদাদ দিয়ে আরেক দফা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ঘটাবেন ?"

"না, বোধহয়। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়। ম্যাকডোনালডের অ্যাওয়ার্ড শুনেছি গোড়ায় সে রকম ছিল না। বড়ো বড়ো ঝানু সিভিলিয়ানরা তাঁকে বলেন, স্যার, আপনি কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে চান ? ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মতো বেঙ্গল গভর্নমেণ্টও টেররিস্টরা হাতের মুঠোয় পাবে। কংগ্রেসে এখন তাদেরই পাল্লা ভারী। ম্যাকডোনালডের কলম বেঁকে যায়। এবারকার পরিস্থিতি সেবারকার মতো নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এমনিতেই ধ্বংসের মুখে। ব্রিটিশ স্বার্থ বলতে যদি বাণিজ্যিক স্বার্থ বোঝায় তবে

সেটা কংগ্রেসের কৃপায় সুরক্ষিত হতে পারে। কাজেই কংগ্রেসকে তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দেওয়া ব্রিটিশ পলিসি নয়। কংগ্রেস তো গোটা বাংলাদেশটা দাবী করছে না। পশ্চিমবঙ্গ পেলেই সে খুশি। বলা বাহুল্য, কলকাতা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয় না। হুগলী নদীকে সীমান্তরেখা কার্জনও তো করেননি। ব্রিটিশ জজেরা প্রিসিডেণ্ট দেখে বিচার করেন। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়বেই।" মানস নিঃসংশয়।

"আমরা কিন্তু ভাবছি আমাদের পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু ভাইবোনদের কথা। কলমের একটি খোঁচায় ওদের ভাগ্যের এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। ইংরেজদের তাতে কী? র‍্যাডক্লিফই বা কেমন করে বুঝবেন কলকাতার এদিক ওদিক হলে কার কী আসে যায়? নদী যে একটা নৈসর্গিক সীমান্তরেখা এটা কি ইউরোপের ইতিহাসে বিতর্কিত হয়নি? ফ্রান্স কি বরাবর রাইন ফ্রন্টিয়ার দাবী করেনি? তাই নিয়ে লড়েনি? হুগলী নদী যদি সীমান্তরেখা না হয় তবে আর কোন নদী হবে সীমান্তরেখা? পদ্মা, গোরাই, মধুমতী? ল্যাণ্ড ফ্রন্টিয়ার পাহারা দেওয়া মোটেই কার্যকর হবে না। এপারের লোক ওপারে, ওপারের লোক এপারে নিত্য যাতায়াত করবে। চোরা চালান করবে। চুরি ডাকাতী করে এপার ওপার করবে। শেষপর্যন্ত লোকবিনিময় না করে উপায় থাকবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হবে। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এসে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা।" গুহ অনুমান করেন।

"লোকবিনিময় কারো পক্ষে ভালো হবে না, মিস্টার গুহ। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ তো তুরস্ক আর গ্রীস নয়। হিন্দু মুসলমান যদি একসঙ্গে বসবাস না করে তবে হিন্দু মুসলমানের মিটমাট হাজার বছরেও হবে না। উল্টে হাজার বছরের সাধনা মাটি হবে। ক্ষমতার বাঁটোয়ারা না হয়ে রাজ্যের বাঁটোয়ারা হচ্ছে। এই যথেষ্ট নয় কি? এর পরিণাম কি প্রজারও বাঁটোয়ারা? তাও কি কখনো হয়?" মানস বিশ্বাস করে না।

রক্ষিত বাধা দিয়ে বলেন, "কেন? হলাণ্ডে বেলজিয়ামে হয়নি? যারা পেরেছে তারা পা দিয়ে ভোট দিয়েছে। তাই হলাণ্ড প্রায় প্রটেস্টাণ্ট, বেলজিয়াম প্রায় ক্যাথলিক। তবে পুরোপুরি হয়নি, এটা ঠিক। এদেশও পুরোপুরি মুসলিম বা পুরোপুরি হিন্দু হবে না। কিন্তু বহুপরিমাণে হতে পারে।"

"না, ডক্টর রক্ষিত, তুলনাটা ঠিক হলো না। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের

সম্পর্কটা ল্যভ্‌ হেট রিলেশনশিপ। পরস্পরকে আমরা ভালোও বাসি, শুধু যে ঘৃণা করি তা নয়।" মানস তর্ক করে।

এবার রক্ষিত তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, "ইণ্ডোনেশিয়ায় তো আমি কেবল প্রেমই দেখেছি। ও দেশের মুসলমানরাও রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পাগল। একদা এ দেশের মুসলিম শাসকরাও রামায়ণ মহাভারতের তর্জমা করিয়ে এ দেশের লোকের সঙ্গে মন মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। আর এ দেশের লোকও ফার্সী ভাষা শিখে পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল। মালিক মহম্মদ জায়সী যে পদ্মিনীর উপাখ্যান রচনা করেন তাতে পদ্মিনী ছিলেন রূপে গুণে অদ্বিতীয়া আর আলাউদ্দীন ছিলেন ভিলেন। গোড়ায় নামকরণ ছিল হিন্দু বনাম তুর্ক, তুর্ক বনাম মোগল। হিন্দু বনাম মুসলমান এই নামকরণ সাতশো বছরের নয়, চারশো বছরের। মোগলরা আসার পর মোগল আর তুর্ক ক্রমশ একাকার হয়ে যায়। তখন তাদের মিলিত নাম হয় মুসলমান। তখন থেকেই হিন্দু বনাম মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্র এক নয়, দুই। তবু পুরোপুরি দুই হয়নি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, কথক নৃত্য, উর্দু সাহিত্য, মহরম আর হোলি ছিল উভয়েরই মিলনসেতু। আকবর বাদশাহ দুই সম্প্রদায়কে একসূত্রে গাঁথতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরও তাঁরই নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু শাহ্‌ জাহানের আমল থেকেই শুরু হলো বিপরীত নীতি। তার পরাকাষ্ঠা আওরংজেবের আমল। দারা শিকোর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের একাত্মবোধের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। দুই নেশন তত্ত্বের শিলান্যাস তখন থেকেই। ব্রিটিশ আমলে শাসক শ্রেণী এর সুযোগ নিয়ে গোড়ার দিকে পক্ষপাত দেখায় হিন্দুর উপরে, শেষের দিকে মুসলমানের উপরে। মুষ্টিমেয় বিদেশী অন্য কোনো উপায়ে এত বড়ো একটা দেশকে পায়ের তলায় রাখতে পারত না। বিশেষত তার পলিসি যখন নয় এদেশেই বসবাস করা ও বিস্তর লোককে খ্রীস্টান করে ক্রমে ক্রমে সংখ্যাবহুল হওয়া। মিউটিনির দিন হিন্দু মুসলিম একজোট হয়েছিল, এক হয়নি। খেলাফত আন্দোলনের দিনও তাই। একজোট হওয়া এক হওয়া নয়। জোট একদিন ভেঙে যায়। কোয়ালিশন করে পাঁচ দশ বছর চালানো যায়, কিন্তু পার্মানেণ্ট কোয়ালিশন বলে কোনো শাসনব্যবস্থা সম্ভব নয়। পার্মানেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট বলতে পার্টিশনই বোঝায়। কেউ যদি কাউকে ভালো না বাসে, কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস না করে, তবে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ

বাঁটোয়ারাই শ্রেয়। আবার কবে সেতুবন্ধন হবে, কেমন করে হবে এসব ভেবে লাভ আছে কি? আমি তো দেখছি পার্টিশনও শেষ কথা নয়, এর পরে লোকবিনিময়।"

মানস ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "দিস্ কান্ট্রি ক্যান নট লিভ হাফ হিন্দু অ্যাণ্ড হাফ মুসলিম। লিঙ্কন যা বলেছিলেন এটা তারই অনুসরণ। তবে সিদ্ধান্ত যখন একবার নেওয়া হয়ে গেছে যে পার্টিশন হবে স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত তখন আমাদের কাজ সেটাকে মান্য করা। কিন্তু লোকবিনিময় তার সামিল নয়। মহম্মদ তুঘলকের ফারমান ছিল দিল্লী থেকে লোক অপসরণের। মহম্মদ আলী জিন্নার ফারমান যদি হয় দুই রাষ্ট্র থেকে লোক অপসরণের কে সেটা মান্য করবে? হিন্দু মুসলমানের বিবাদ কি এমন এক বিবাদ যা পার্টিশনেও মিটবে না?"

এর উত্তর দেন গুহ। "এই বিবাদের আরো এক ডাইমেনসন আছে, মল্লিক সাহেব। পাকিস্তানে হিন্দু জমিদারদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হবে। হিন্দু মহাজনদের পাওনা সুদ মুছে ফেলা হবে। আসলটাও অস্বীকার করা হতে পারে। ইসলামে সুদ হারাম। হিন্দু আমলাদের পঞ্চম বাহিনী অপবাদ দিয়ে যদি বরখাস্ত না করা হয় তবে এক পদ নামিয়ে দেওয়া হবে। যেমন, জজকে সাব-জজ পদে।'

মানস লাল হয়ে যায়। "নেভার।"

গুহ মাফ চান। "ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

মানস ঠাণ্ডা হয়ে বলে, "ঠিক। পার্টিশনটা কেবল রাজনৈতিক বাঁটোয়ারা নয়, এটা একপ্রকার সমাজতান্ত্রিক ওলটপালট। জমিদার ও মহাজনকে উৎখ্যাত করা হবে, আমলাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। বিপ্লবের দিন ওটাও সম্ভবপর, এটাও সম্ভবপর। কিন্তু আমার কী? আমি মুক্তি চাই। আমাকে মুক্তির স্বাদ দিতে পারে এমন পদ এখনো সৃষ্ট হয়নি, পরেও হবে না। যত উচ্চ পদই হোক না কেন, আমাকে তা বেশীদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। আমার মনে পড়ে যাবে যে আমি অন্য রাজ্যের মানুষ, যে রাজ্য এ রাজ্য নয়। আমাকে খুঁজে নিতে হবে সেই রাজ্য যেখানে আমি রাজা, যেখানে আমার প্রত্যেকটি লিপিকর্ম এক একটি সৃষ্টি। জীবনের বেশ কিছু অংশ বনবাসেই কেটে গেল আমার। এখন স্বরাজ্যে ফিরতে হবে। কিন্তু সে স্বরাজ্য জাতীয়তাবাদীদের স্বরাজ নয়। যদিও আমি একজন ভারতীয় হিসাবে তেমন স্বরাজ্যের জন্যেও অপেক্ষা করছি।"

"জানিনে আপনি কিসের স্বপ্ন দেখছেন। আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল কেমব্রিজ থেকে র‍্যাংলার হয়ে ফেরার পর ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে নিযুক্তি। আমি, মশায়, সে পদ প্রাণ থাকতে ছাড়তুম না, যদি একবার পেতুম। আমার অনুরোধ আপনি পদত্যাগ ইত্যাদির কথা স্বপ্নেও ভাববেন না, নয়তো সারাজীবন পশতাবেন। তবে এটাও ঠিক যে স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান হলে অনেকেই মানে মানে পদত্যাগ করতে চাইবেন, যদি না পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বদলীর সুযোগ পান। তাঁদের কাছে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় পাকিস্তান ত্যাগের স্বাধীনতা, হিন্দুস্থানে উপযুক্ত পদলাভের স্বাধীনতা। এক অদ্ভুত অস্থিরতা লক্ষ করছি বাঙালী হিন্দু অফিসারদের জীবনে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ ভাগ হয়ে গেলে তাঁরা কোথায় দাঁড়াবেন? বল, মা তারা, দাঁড়াই কোথা? আমি অফিসার নই। তাই আমার মনে অস্থিরতা নেই। আমি এইপারেই থাকব, যাই থাক না কপালে। জমিদারি কেড়ে নিলে ক্ষতিপূরণ তো দেবে। না শুধু মুসলিম জমিদারদেরই দেবে, হিন্দু জমিদারদের দেবে না? এখন থেকে আমি অতটা নৈরাশ্যবাদী না। আমি আশাবাদী।" গুহ উচ্চস্বরে চিন্তা করেন।

রক্ষিত বলেন, "আমার মতো পুরাতত্ত্ববিদের স্থান পাকিস্তানে নয়, যদিও মোহঞ্জোদরো আর হরপ্পা পাকিস্তানেই পড়বে। আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ জোগাড় করে নিয়েছি। ভাবনা কেবল পৈত্রিক সম্পত্তিটুকুর জন্যে। জানেন তো পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা শুধু চাকরি দেখে কারো সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয় না। যেমন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা দেয়। চাকরি আজ আছে, কাল নেই। আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি আছে, মাটিতে স্টেক আছে। আমরা সলিড বুর্জোয়া। সেটা আমি প্রমাণ করব কী করে যদি, বাস্তুচ্যুত হই?"

মানস তাঁকে আশ্বাস দেয়। "জিন্না সাহেবের স্টেটমেণ্ট কি পড়েননি? পাকিস্তানের হিন্দুরা সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে সম-অধিকারী হবে। মুসলমানের সম্পত্তি যদি থাকে তো হিন্দুর সম্পত্তিও থাকবে। আর দেরি না করে শুভকর্মটা সেরে নিন, ডক্টর রক্ষিত। আমার দৃঢ়বিশ্বাস পাকিস্তানী মুসলমানদের অচিরেই অন্তঃপরিবর্তন হবে। আমি তো আমার অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ওপারে যাবেন না, এপারেই থেকে যান। পাকিস্তান হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানের অন্তঃপরিবর্তন হবে। 'ভাই রে' বলে মুসলমান হিন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরবে।"

যুথিকা টিপ্পনী কাটে, "ওঃ কী আমার দয়াময় ভাই রে !"

"অন্তঃপরিবর্তনে আমিও বিশ্বাস করি।" গুহ বলেন, "তবে সেটা সহসা আসে না। আসে কঠোর অভিজ্ঞতার পরে। যখন দেখা যাবে জমিদার একজনও নেই, মহাজন একনও নেই, হিন্দু আমলাদের একজনও নেই, তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের মুসলমান নিষ্কণ্টক নয়, তার কষ্টার্জিত ধন লুটেপুটে খাচ্ছে পাঞ্জাবী ফৌজ, পশ্চিমা আমলা ও গুজরাটী সওদাগর তখন এক ও অবিভাজ্য মুসলিম নেশনের বুলি ফাঁকা শোনাবে। তার পরে এক ও অবিভাজ্য বাঙালী জাতির উপর নজর পড়বে।"

রক্ষিত বলেন "তার আগে যে পদ্মা আর ভাগীরথী দিয়ে বহুৎ পানি গড়িয়ে গিয়ে থাকবে। চোখের পানি থেকে আরো একটা নদী সৃষ্টি হয়ে থাকবে। যার কূল নেই, কিনারা নেই। শত চেষ্টা করেও যার উপর সেতুবন্ধন করতে পারা যাবে না। ইণ্ডোনেশিয়ার মুসলমানরা কিছু কম মুসলমান নয়, কিন্তু তারা তার চেয়ে বেশী ইণ্ডোনেশিয়ান। তারা দেশের বৈশিষ্ট্য, জাতির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু এদেশের মুসলমানদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এদের শিকড় কোথাও নেই, শিকড় গাড়বার জন্যে এরা চায় নিজেদের জন্যে এটা হোমল্যাণ্ড। এরা যেন একদল জিপসী কি বেদে কি বেদুইন। ইংরেজরা যাবার সময় এই বেদুইনদের সেটল করে দিয়ে যাবে যেখানে সেটা কোথাও একটা গোটা প্রদেশ, কোথাও আধখানা প্রদেশ, কোথাও প্রদেশের দশ আনা, কোথাও প্রদেশের সিকিভাগ। সব মিলিয়ে পাকিস্তান। একদল বেদুইনকে সেখানে সেটল করাতে গিয়ে আরেকদল মানুষকে বেদে বানাতে হবে। যাদের শিকড় হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ও গভীর। ছিন্নমূল এই বেদের দল যেখানে যাবে সেখানে কি শিকড় গেড়ে বসতে পারবে? সে শিকড় গভীর হতে কতকাল লাগবে? অন্তপরিবর্তন হয়তো একদিন হবে, কিন্তু কত দাম দিয়ে? রক্তমূল্য তো বটেই, কিন্তু সেই একমাত্র মূল্য নয়। যারা বেঁচে থাকবে তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্য, তাদের পারিবারিক কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তোমার গুরু, তোমার পুরোহিত, তোমার ঠাকুর, তোমার চাকর, তোমার ধোপা, তোমার নাপিত এরাও কি তোমার সঙ্গে গিয়ে অন্য কোথাও বসত করবে নাকি? সেখানকার সমাজে তুমি খাপ খাবে কী করে? পার্টিশন বাঙালীকে কাঙালী করবে। বঙ্গভূমি হবে দুই নেশনের রঙ্গভূমি। এর চেয়ে ইণ্ডোনেশিয়া কত ভালো! বালী দ্বীপে হিন্দুও আছে, কিন্তু একই নেশন।"

"আমি কিন্তু এখান থেকে নড়ছিনে, ভাই। জন্মভূমি থেকে গণপলায়ন বীরের ভূমিকা নয়। কতক হিন্দু স্বস্থানে থেকে যাবে। আমরা হব বালীদ্বীপের হিন্দু। তাদেরই মতো সসম্মানে বেঁচে থাকব।" গুহ আশা করেন।

যূথিকা টিপ্পনী কাটে, "তাদেরই মতো মিউজিয়াম পীস। দেশবিদেশ থেকে পর্যটকরা আসবে দেখতে। বাটিক বস্ত্র কিনবে।"

গুহ মৃদু হেসে বলেন, "হিটলারী আমলে বিস্তর শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক দেশত্যাগী হন। কিন্তু কতক থেকে যান, অথচ নাৎসী হন না। তাঁরা যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থার নাম ইণ্টার্নাল মাইগ্রেশন। তাঁদের মাইগ্রেশনটা বাহির থেকে ভিতরে। আমিও আমার মনোজগতে দেশান্তরী হব। হিটলার ও তার নাৎসীরা আজ কোথায়? ধূমকেতুর মতো তাদের উদয় আর অস্ত। তেমনি, জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগেরও। সাধারণ মুসলমানের উপর আস্থা রাখতে হয়। সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে তার প্রতিযোগী সম্পর্ক নয়, পরিপূরক সম্পর্ক। বাঁ হাতের সঙ্গে যেমন ডান হাতের। সে যদি উন্মত্ত হয় তবে তা অল্পকালের জন্যে।"

মানস স্মরণ করিয়ে দেয়, "সব লোককে তুমি কিছুকাল বোকা বানাতে পারো, কিছু লোককে চিরকাল, কিন্তু সব লোককে চিরকাল নয়।"

সেই যে কামালউদ্দীন সাহেব, যিনি কলকাতায় মীর আবদুল লতিফ সাহেবের বাড়ীতে স্বপনদাকে ও মানসকে বলেছিলেন, "পাকিস্তান না গোরস্থান" তিনি একদিন আসেন কথাটা মানসকে মনে করিয়ে দিতে। বলেন, "গোরস্থান তা হলে সত্যি সত্যি হতে চলল। এর জনক নিজেই নালিশ করছেন এই রাষ্ট্র ভায়েবল নয়। এই বিজোড় শিশুটি তবে বাঁচবে কোন যাদুবলে? আমার লীগপন্থী বন্ধুরা তো আমাকে বয়কট করেছিলেন। এখন তাঁরাই আমার কাছে এসে বলছেন, 'পারফিডিয়াস অ্যালিবিয়ন'। কারণ সে কংগ্রেসকেই দিল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব, আর কলকাতাকে করল পশ্চিমবঙ্গের সামিল। আমি ওঁদের বোঝাই যে রাজনীতিতে কেউ চিরশত্রু নয়, কেউ চিরমিত্র নয়। কংগ্রেস একদা শত্রু ছিল ঠিকই, কিন্তু তার কারণ ব্রিটেন ছিল ভারতের স্বাধীনতার শত্রু। বিশেষ করে চার্চিল গোষ্ঠী। লীগের দুর্ভাগ্য যে চার্চিল এখন প্রধানমন্ত্রী নন। জিন্না সাহেব এখন মুরুব্বিহীন।"

মানস তাঁর সঙ্গে একমত হয় না। বলে, "না, না, গোরস্থান নয়। জিন্না

সাহেব পেয়ে গেছেন বেলুচীস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। যেটা সব চেয়ে স্ট্রাটেজিক অঞ্চল। বেলুচী আর পাঠানদের মতো বিশ্বস্ত কমরেডদের কংগ্রেস নেতারা পথে বসিয়েছেন। আমার মতে কংগ্রেসও পারফিডিয়াস। কে যে পারফিডিয়াস নয় তাই ভাবছি। জিন্না সাহেবও তো চার কোটি মুসলমানকে পথে বসিয়ে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন। তবে শুধু অ্যালবিয়নকেই পারফিডিয়াস বলা কেন? আমাদের নেতারাও তাই।"

কামালউদ্দীন স্বীকার করেন। "জী। পেছন ফিরে তাকাচ্ছি আর দেখছি ইংরেজদের দোষ নয়, আমাদের নেতাদেরই দোষ। বছর দশেক আগে কংগ্রেস যখন আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করে কেন্দ্রের দিকে হাত বাড়ায় তখন আমরা কয়েকজন গিয়ে মহাত্মাজীকে বলি, 'কই, বাংলাদেশে তো কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিল না। তবে কেমন করে ক্ষমতার অংশ পাব?' আমি তখন কংগ্রেসে। তিনি বলেন, 'মুসলমানরা সবাই কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না কেন? তা হলে তো কংগ্রেস আরো জোরদার হয়। স্বরাজ অর্জন করে। তারপরে ক্ষমতা ভাগের প্রশ্ন ওঠে।' আমরা বুঝতে পারি যে তিনি চান আমরাও যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মুসলমানদের মতো কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বরাজের পর মন্ত্রিত্বের ভাগ পাই। তাঁকে বোঝানো শক্ত যে বাংলার কংগ্রেস হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের কুক্ষিগত। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আমরা একটিও ভোট পাব না। তার চেয়ে কৃষক প্রজা দলে যোগ দেওয়াই সুবুদ্ধি। আমি তাই করি। কিন্তু পরে দেখা যায় মুসলিম লীগের প্রভাব বাড়ছে। হক সাহেব লাহোরে গিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তখন জিন্না সাহেবের তারকা উর্ধ্ব গগনে। কৃষক প্রজা পার্টির আকাশ অন্ধকার। তখন আমরা কয়েকজন যাই কায়দে আজমের সকাশে। লজ্জার সঙ্গে কবুল করছি যে আমিও। তাঁরও দেখি গান্ধীজীর মতো মনোভাব। বলেন, 'মুসলমানরা সবাই মুসলিম লীগে যোগ দেয় না কেন? তা হলে তো লীগ আরো জোরদার হয়। পাকিস্তান কেড়ে নেয়।' তার মানে কৃষক প্রজা দলকে মুসলিম লীগে বিলীন হতে হবে। মুসলিম লীগ তো নাইট আর নবাবদের দল। খান বাহাদুর আর খান সাহেবদের কুক্ষিগত। আমরা সেখানে পাত্তা পাব কেন? হতাশ হয়ে ফিরে আসি। হতাশ কণ্ঠে বলি, 'পাকিস্তান না গোরস্থান!' না, গোরস্থান নয়, তবে কলকাতা না থাকলে ফাঁকিস্তান। এর জন্যে দায়ী যেমন লীগ তেমনি কংগ্রেস। কারো হাতই পরিষ্কার নয়।"

মানস তাকে সান্ত্বনা দেয়। "পাকিস্তানের যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে। ঠিকমতো ব্যবহার করলে পাকিস্তানীরা সকলেই খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবে। কলকাতার জন্যেই তো মন্বন্তরটা হলো। আর মন্বন্তর হবে না। কত বড়ো বাঁচোয়া!"

বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা দিব্যেন্দু চক্রবর্তী শহরে এসেছেন শুনে মানস তাঁকে নৈশ ভোজনের আমন্ত্রণ জানায়। তিনি গ্রহণ করেন। সাহিত্যসূত্রেই আলাপ পরিচয়। তিনিও একদা সাহিত্যিক ছিলেন। রাজনীতি সাহিত্যকে গ্রাস করেছে। পূর্ণ গ্রাস।

ভদ্রলোক আটটার জায়গায় এগারোটা বাজিয়ে দেন। মানস ও যূথিকা অভুক্ত। তিনি করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আহারে বসে যান। খেতে খেতে বলেন, "আজকের পরিস্থিতিতে আমরা একান্ত অসহায়। যে শহরেই যাই একটার পর একটা মীটিং। ইটিং ভুলে যাই। সর্বত্র ওই একই প্রশ্ন। আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ কী? আমাদের মেয়েদের বিয়ে হবে কোন্‌খানে? আমি আশ্বাস দিই, আমরা থাকতে আপনাদের ভয় কিসের? পশ্চিমবঙ্গ একটা শক্ত ঘাঁটি। যখন খুশি যাবেন, যখন খুশি আসবেন, যতদিন খুশি থাকবেন। পাশপোর্ট লাগবে না, ভিসা লাগবে না। একই মুদ্রা। মুদ্রাবিনিময় করতে হবে না। কাস্টমসের বালাই থাকবে না। মালপত্র যার যেমন দরকার তিনি তেমন আনাবেন, তিনি তেমন পাঠাবেন। পার্টিশন তো উভয় পক্ষের ভোটেই হয়েছে। হয়েছে শান্তির জন্যে, হয়েছে প্রগতির জন্যে। প্যানিকের কোনো কারণ নেই। অহেতুক স্থানত্যাগ করবেন না। ঘরবাড়ী, জায়গা জমি ছেড়ে গেলে বেদখল হয়ে যায়। পরে আর দখল ফিরে পাওয়া যায় না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকুন।"

"খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন, মিস্টার চক্রবর্তী।" মানস তারিফ করে।

"কে কার কথা শোনে।" তিনি একটু দম নিয়ে বলেন, "প্রত্যেক সভাতেই দু'চারজন ত্যাঁদড় থাকে। আমাকে জেরা করে। 'আপনিই না জানুয়ারি মাসে আমাদের বলেছিলেন পার্টিশন হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে? সর্দারজীই না পণ করেছিলেন, পাকিস্তান তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না? মহাত্মাজীই না ঘোষণা করেছিলেন যে পার্টিশন হলে সেটা হবে তাঁর জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ, ভিভিসেকশন? পশ্চিমবঙ্গের ঘাঁটির স্বার্থে আপনারা পূর্ববঙ্গের বাঙালকে বলি দিলেন। ধিক্ আপনাদের! বাঙাল আপনাদের অপরাধ

ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু ভুলতে পারে না। গ্রেট ডিভাইড শুধু নয়, গ্রেট বিট্রেয়াল।' আমি তো হাঁ।" তিনি ছুরি কাঁটা তুলে রাখেন।

"ও কী! খাওয়া বন্ধ করলেন যে!" যূথিকা অনুযোগ করে।

"গ্রেট বিট্রেয়াল! আমরা ট্রেটর!" তিনি কপালে হাত দিয়ে বলেন।

"তারপরে যা বলে তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। 'নেতাজীর সঙ্গে আপনাদের তুলনা! তিনি থাকলে সারা ভারত ও সারা বাংলা জয় করে নিতেন। রফা করে ভারতের একাংশ বাংলার একাংশ নয়। আপনারা আপস করছেন। নাই বাংলার চেয়ে কাণা বাংলা ভালো। আপস না করলে এর চেয়ে ভালো বার্গেন পেতেন না। এটা হাতছাড়া করলে পরে পশতাতে হতো। বাট্ অ্যাট্ হোয়াট্ কস্ট্? আপনারা যে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকছেন তার অন্ত কোথায় তা কি ঠাহর করতে পারছেন?' আমিও ভড়কাবার পাত্র নই, দিয়েছি মুখের মতো জবাব। বলেছি, 'সুড়ঙ্গের অন্তে কী? ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ? আমরা তার জন্যে প্রস্তুত হতে চাই বলে টাইম কিনলুম, স্পেস বেচলুম। যেমন লেনিন করেছিলেন ব্রেস্ট লিটোভস্কে সন্ধিসূত্রে। আজ আমরা প্রস্তুত নই, অসময়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে হারব না জিতব কোন্ জ্যোতিষী গণনা করে বলতে পারে? নেতাজী অতুলনীয়। কিন্তু তিনিও কি যুদ্ধে জিতলেন? যেখানে জয় পরাজয় অনিশ্চিত সেখানে এই বার্গেনই বেস্ট বার্গেন। বার্গেন যত ভালোই হোক না কেন তার জন্যে কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। আমরা নাচার হয়ে ছেড়েছি। যেমন লেনিন ছেড়েছিলেন। ইতিহাস আমাদের অপরাধ ক্ষমাও করবে, ভুলেও যাবে।" তিনি আহারে মন দেন।

"তা হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধল না, আপনারা বিনা যুদ্ধে পঞ্চগ্রাম সমর্পণ করলেন। এযুগে যার নাম পাকিস্তান।" যূথিকা পরিহাস করে। "আমরা আর একটা মহাভারত হারালুম। না, আপনাদের কেউ মনে রাখবে না। মনে রাখবে মহাত্মা গান্ধীকে ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে।"

॥ উনিশ ॥

পাঞ্জাব থেকে মর্মান্তিক খবর আসতে আরম্ভ করে। সেসব শোনার পর মানস আর স্থির থাকতে পারে না। আবার রাত জেগে পায়চারি শুরু করে। যূথিকা তাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। সুধায়, "তোমার কী হয়েছে, বলো তো ?"

"মরাল সিকনেস। কায়িক নয়, মানসিক নয়, নৈতিক অসুখ। এর কোন চিকিৎসা নেই, জুঁই। আমাকেই আমার ভিতর থেকে প্রতিরোধ শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। 'আপনি অবল হলি যদি, বল দিবি তুই কারে ?' কিন্তু কোথায় সেই বল ? ভাবছি। পায়চারি করতে করতে ভাবছি।" মানস উত্তর দেয়।

যূথিকা বুঝতে পারে না নৈতিক অসুখ কী ও কেন। জানতে চায়।

"জুঁই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই দুর্ভাগা দেশে বহুবার হয়েছে। তার বেলা কী করতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু এর বেলা আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ়। যা শুনছি তা যদি সত্য হয় তবে একটা সম্প্রদায় আর একটা সম্প্রদায়কে মেরে কেটে, তার বাড়ীঘর জ্বালিয়ে, তার সম্পত্তি লুটেপুটে, তার নারীদের বেইজ্জত করে তাকে তার জন্মভূমি থেকে বিলুপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। এ দেশ আধ্যাত্মিক দেশ বলে আমরা গর্ব করি। কোথায় থাকে সেই গর্ব ? এই যদি হয় ধর্ম তবে অধর্ম কী ? এই যদি হয় সভ্যতা তবে অসভ্যতা কী ? এই যদি হয় সংস্কৃতি তবে অসংস্কৃতি কী ? এই ব্যাধি যখন বাংলাদেশে সংক্রামিত হবে তখন কেমন করে এর সঙ্গে মোকাবিলা করব আমি ? আইনে এর কী প্রতিষেধ বা প্রতিকার ? এটা একজাতের মাস হিস্টিরিয়া। প্লেগও বলতে পারো।" মানস যতদূর বোঝে।

যূথিকা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। "দুই যমজ শিশু জন্ম নিচ্ছে। নাড়ীর বাঁধন কেটে যাচ্ছে। রক্তস্রাব তো হবেই। এতদিন আমরা যা দেখলুম তা গর্ভযন্ত্রণার পর প্রসবযন্ত্রণা। এখন যা দেখছি তা প্রসবের পর রক্তস্রাব। তুমি কী করতে পারো, আমি কী করতে পারি ? নেতারাই বা কী করতে পারেন ? করতে পারত ইংরেজ, তাও মার্শাল ল দিয়ে। সাধারণ

আইনে কুলোত না। কিন্তু সে তো যাচ্ছে। সে যাচ্ছে বলেই তো এসব ঘটছে। সে না গেলে এসব ঘটত না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চাপা থাকত। ঘটে গিয়ে বরাবরের মতো চুকে যাক।”

মানস জবাব দিতে পারে না। কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন দিল্লী থেকে চিঠি। সুকুমার লিখেছে, “সহযোগী আর্মিটেজ আমার চেয়ে আরো বেশী ভিতরের খবর রাখেন। তাঁর কাছে শুনলুম মিস্টার জিন্না নাকি পণ করেছিলেন যে পাকিস্তান হাসিল করার জন্যে তিনি দরকার হলে এক কোটি মুসলমানকে স্যাক্রিফাইস করবেন। ওরা যে কেবল হিন্দু ও শিখদেরই মেরে মরত তা নয়, ইংরেজদেরও রেহাই দিত না। ওদের মতো ফ্যানাটিকদের পক্ষে সবই সম্ভব। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। জিন্নার ওস্তাদী। লা জওয়াব জিন্না। তাই ইংরেজরা ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি রাজ্য ভাগ করে দেয়। কংগ্রেস রাজী না হলেও পাকিস্তান হতো। তবে প্রকারান্তরে। আর লীগ রাজী না হলেও পাঞ্জাব ভাগ, বেঙ্গল ভাগ হতো। তবে প্রকারান্তরে। জিন্না যতটা আশা করেছিলেন ততটা পেতেন না। আর কংগ্রেসও যতটা হারাবে আশঙ্কা করেছিল ততটা হারাত না। মাউণ্টব্যাটেনের সাফল্যের শুভ সঙ্কেত তাঁর নিরপেক্ষতার মধ্যেই নিহিত। তিনি কিন্তু একটি ক্ষেত্রে বিফল হয়েছেন। সেটা শিখদের ক্ষেত্রে। তিনি শিখিস্থান দিতে পারেননি, তার দরুন শিখরা হতাশ। শিখিস্থান না পেলেও পাকিস্থানের মধ্যেই নানকানা সাহেবকে তারা করতে চেয়েছিল তাদের ভ্যাটিকান। মাউণ্টব্যাটেন সাহসই পেলেন না জিন্নাকে এ বিষয়ে বলতে। পাছে আবার অপমানিত হন। হয়েছেন তো একবার, যখন জিন্না তাঁকে পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল না করে নিজেকেই করেন। শিখরা অবুঝ। তারা মুসলমানদের উপর আক্রোশ মেটাতে গিয়ে মহামারী বাধিয়ে দিয়েছে।”

মানস পড়ে শোনায়, যুথিকা শোনে। “বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল। যেমন শিখ তেমনি মুসলমান। এক হাতে তালি বাজে না। লেগে গেছে অঘোষিত গৃহযুদ্ধ। এর মধ্যে হিন্দুরাও জড়িয়ে পড়েছে। হিন্দুও মার খাচ্ছে, মার দিচ্ছে। শুনছি এর প্রস্তুতি চলছিল সাত আট বছর ধরে। মহাযুদ্ধে ইংরেজ হেরে গেলে পাঞ্জাব হবে কার? হিন্দুর না মুসলমানের না শিখের? হিন্দুর, কারণ মুসলিম আমলের আগে হিন্দু আমল ছিল। মুসলমানের, কারণ শিখ আমলের আগে মুসলমান আমল ছিল। শিখের, কারণ ব্রিটিশ আমলের

আগে শিখ আমল ছিল। সাত আট বছর ধরে এরা তিন দাবীদার লোহা কিনে নিয়ে হাতিয়ার বানিয়েছে। হাতিয়ার হাতে পাবার জন্যে যুদ্ধের রংরুট হয়েছে। সেই সূত্রে লড়াইয়ের তালিম পেয়েছে। যুদ্ধের পর বেকার হয়ে মারামারির জন্যে সবার হাত নিস্‌পিস্‌ করছে। যদি কাড়াকাড়ি করে কিছু পাওয়া যায়। মুসলমানরা তবু তো পাঞ্জাবের একাংশ পেয়েছে, শিখেরা কী পেয়েছে? হিন্দুদের সঙ্গে জোট বেঁধে পাঞ্জাবের বাকী অংশ। সেটাও তাদের একার নয়। হিন্দুরাই পাবে তার সিংহভাগ। শিখদের মেজাজ এখন মণিহারা ফণীর। নানকানা সাহেব এখন বিদেশে। সেখানে তীর্থ করতে গেলে ছাড়পত্র লাগবে। ভাবা যায়? মুসলমানের যেমন মক্কা শরীফ শিখের তেমনি নানকানা সাহেব। মক্কা যদি খ্রীস্টানদের দখলে যেত মুসলমানরাও মারমুখো হতো।

ভাই মল্লিক, এর কোনো প্রতিকার নেই। মাউণ্টব্যাটেন কল্পনাও করতে পারেননি যে এরকম বিভ্রাট ঘটবে। পাঞ্জাবের গভর্নর জেঙ্কিন্স তাঁকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন যে পাঞ্জাব অবিভাজ্য। ওয়েভেল বেঙ্গল ভাগ করার কথা ভেবে রেখেছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের বেলা তিনি নীরব। অথচ পাঞ্জাব ভাগ না করলে তাঁকে ভারতেই থেকে যেতে হতো। সমস্তটা তো মুসলিম লীগকে দিয়ে যেতে পারতেন না। শিখরা প্রত্যেকটি ইংরেজের গলা কাটত। জিন্নার জেহাদের ভয়ে যদি পাকিস্তান দিতে হয়ে থাকে তো শিখ সর্দারদের ভয়ে পূর্ব পাঞ্জাব দিতে হয়েছে। কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে এই যে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, আর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে শিখ আর হিন্দু।

ওদিকে রাজন্যদের কী দুর্দশা! সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, অগ্নিবংশী ক্ষত্রিয় বলে যাঁদের দর্প তাঁরা এখন দিল্লীতে ধর্ণা দিচ্ছেন পণ্ডিত নেহরু আর সর্দার পাটেলের দুয়ারে। বিশেষ করে সর্দার পাটেলের। মুখে তিনি বলছেন তিনি রাজন্যকুলের বন্ধু। কাজে কিন্তু তাঁদের প্রজাকুলের স্বজন। রাজন্যরা নামেই রাজা মহারাজা থাকবেন, তাঁদের আসল ক্ষমতা চলে যাবে প্রজা প্রতিনিধিদের হাতে, তার মানে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হাতে, তার মানে সর্দারজীর হাতে। আপাতত তাঁরা ডিফেন্স ও ফরেন অ্যাফেয়ার্স দিল্লীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। আগে থেকেই ছিল দিল্লীর হাতে। সন্ধিসূত্রে। এবার অ্যাকসেসন সূত্রে। বাদ বাকী ক্ষমতা তাঁদের হাতেই থাকছে, কিন্তু সেটা

কাগজপত্রে। সর্বত্র মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। মন্ত্রীরা তাঁদের মনোনীত নন, সর্দারজীর। তার মানে ইংরেজের প্যারামাউণ্টশ্লী গেল, কংগ্রেসের প্যারামাউণ্টশ্লী এল।

আমি ইদানীং মিলির তদ্বিরে লেডী মাউণ্টব্যাটেনের সৌজন্যে একটা ঠিকে চাকরি পেয়েছি। মাউণ্টব্যাটেনরা যতদিন আমি ততদিন, যদি না চাকরিটা পাকা হয়। মিলির পিছুটান আছে। সে এদেশেই থাকবে, ছেলেকে ডুন স্কুলে পড়াবে, যদি পণ্ডিতজীর সৌজন্যে তার অ্যাডমিশন হয়। স্বাধীন ভারতে মিলি ওকে জেনারেল কি অ্যাডমিরাল বানাবে। এয়ার মার্শাল কেন নয়?”

“ওমা, শান্তিনিকেতন পছন্দ হলো না!” যুথিকা ঠেস দিয়ে বলে, “এই তোমার বিপ্লবী নায়িকা?”

মানস সহাস্যে বলে, “বিপ্লবের পর বিপ্লবীরাই তো হয় নতুন শাসকশ্রেণী। ‘ডটারস অভ্ দি আমেরিকান রেভোলিউশনের নাম শুনেছ? আমেরিকার স্বাধীনতা সমরকে বলা হয় আমেরিকান রেভোলিউশন। বিপ্লবীদের কন্যাদের একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় ডটারস অভ্ দি আমেরিকান রেভোলিউশন। তাঁদের কন্যারাও হন সেই গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারিণী। উত্তরাধিকারসূত্রে কন্যাদের কন্যারাও, তাঁদের কন্যারাও, কন্যাপরম্পরাক্রমে একালের কন্যারাও সেই আদি গোষ্ঠীর ধারাবাহিনী। এঁদের চেয়ে রক্ষণশীল সেদেশে আর কেউ নয়। আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্স, পুলিশ, আদালত, প্রতিনিধিসভা, বড়ো ব্যবসায় সর্বত্র এঁদের অদৃশ্য অঙ্গুলি। সেদেশের মতো এদেশেও একটি নতুন শাসকশ্রেণীর পত্তন হতে যাচ্ছে। একটি নতুন রাজন্যশ্রেণীর। দেড়শো বছর বাদেও এই শ্রেণীর হাতেই শাসনক্ষমতা থাকবে। এঁদের কন্যারাও হবে ঘোর রক্ষণশীল।”

“তা কি কখনো হয়?’ যুথিকা মানতে চায় না। “বিপ্লবী বলতে আরো একদলকেও বোঝায়। তারা সমাজতন্ত্রবাদী। মিলি তা নয়। আজ মিলিদের সুদিন এসেছে। ত্রিশ বছর বাদে বাবলীদেরও সুদিন আসতে পারে। মিলিরা বামপন্থী জাতীয়তাবাদী হতে পারে, কিন্তু দারিদ্র্য দূর না করতে পারলে জনগণ তাদের পরিত্যাগ করবে। তখন সমাজতন্ত্রবাদীরাও একটা সুযোগ পাবে। ত্যাগের ঐতিহ্য থেকে জাতীয়তাবাদীরা যতই সরে যাবে, যতই ভোগবিলাসে আসক্ত হবে, যতই তাদের প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবে ততই তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে।”

"অসম্ভব নয়।" মানস স্বীকার করে। "ভারতের সীমান্তের ওপারেই সোভিয়েট রাশিয়া। চীনের বিপ্লবীরা যদি সফল হয় তবে কমিউনিস্ট চীন। এই দুই শক্তির আদর্শ এদেশের জনগণকেও আকর্ষণ করবে। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে শুধুমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলেই কংগ্রেস বেশীদিন গণসমাদর পাবে না। তাকে সর্বতোভাবে গান্ধীপন্থী হতে হবে। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র গান্ধীবাদ। কংগ্রেস যদি গান্ধীকে পরিত্যাগ করে তবে জনগণও কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করবে।"

"এইবার তুমি যা বলেচ ঠিক বলেছ। এখন একটু সংসারের দিকে মন দাও দেখি। আর ক'টাই বা দিন বাকী? এর মধ্যে এখান থেকে ঘরকন্না গুটিয়ে নিতে হবে। তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে। কী কী সঙ্গে নেবে? কী কী বিক্রী করবে? কী কী দান করবে?" যুথিকা জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, ভাববার সময় এসেছে। কলকাতা থেকে ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি পেয়েছি। অর্ডার আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে। আমার আদালতের কাজকর্ম আমি গুটিয়ে এনেছি। নাজিরকে বলেছি বিলগুলো একত্র করে নিয়ে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেব। মালপত্র বাঁধাছাঁদার জন্যেও তিনি লোক পাঠাবেন। মালগাড়ী বন্দোবস্ত করবেন, মাল বুক করবেন। পনেরোই আগস্টের আগে তো কলকাতায় যোগ দিতে পারছিনে, পোস্ট খালি হবে না। আপাতত হাওড়ায় যাচ্ছি। পোস্ট খালি। সার্কিট হাউসের জন্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখেছি। কিন্তু কলকাতায় বাসা কোথায় পাব, কবে পাব, এসব এখান থেকে চিঠি লিখে স্থির হবার নয়। এই ডামাডোলের মধ্যে কে কার জন্যে ভাববে? পূর্ববঙ্গ থেকে একটা বিরাট বাহিনী যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে। হিন্দু অফিসার, কেরানী, পিয়ন, পুলিশ, প্রফেসর। যেন মিলিটারি ইভাকুয়েশন।" মানস বিয়াল্লিশ সালের উপমা দেয়।

বদলীর হুকুম পাওয়ার পর বাবুচিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে।

"কলকাতার হিন্দুরা আজকাল অসভ্য হয়েছে, শুনছি। রাস্তার মাঝখানে ওকে দিগম্বর ক'র চিনতে চাইবে হিন্দু না মুসলমান। তার পর যা করবে তা তুমি অনুমান করতে পারো। আমার সাধ্য নেই যে ওকে আমি বাঁচাই। বাধা দিলে আমাকেই না শ্মশানে পাঠায়!" মানস শিউরে ওঠে।

"তাই যদি হয় তবে ভারতপসন্দ মুসলমানদের তোমরা রক্ষা করবে কী

করে? ওরা প্রাণের ভয়ে পাকিস্তানে পালাবে। সেখানে ইসলামপসন্দ মুসলমানরা ওদের মুখ দেখবে না। ওরা হিন্দুরও অধম। কলকাতার হিন্দুদের এসব বোঝা উচিত। এত বড়ো ট্র্যাজেডীতেও ওদের শিক্ষা হয়নি! আরো বড়ো ট্র্যাজেডী ডেকে আনবে যখন দুই পারের মানুষ প্রাণের মায়ায় এপার ওপার করবে। আর কেউ কেউ হয়তো সম্পত্তির মায়ায় ইসলাম কবুল করবে।" যূথিকা আশঙ্কা করে।

"হ্যাঁ, কলকাতার হিন্দুদের এসব বোঝা উচিত। দেশ ভেঙে গেছে, কিন্তু জাতি ভেঙে যায়নি। জাতিও ভেঙে যাবে, যদি ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিমশূন্য ও পাকিস্তান হিন্দু-শিখশূন্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এ হেন পরিণতি আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। এর কোনো প্রয়োজনও নেই। তা ছাড়া এর শেষ পরিণতি হবে হিন্দু রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ। সে যুদ্ধে বিশ্ব মুসলিম পাকিস্তানের পেছনে দাঁড়াবে। হিন্দু রাষ্ট্রের পেছনে দাঁড়াবে কে? একমাত্র নেপাল। ফলাফল হবে আরো বড়ো ট্রাজেডী। স্বাধীনতা একটা আশীর্বাদ না হয়ে হবে একটা অভিশাপ।" মানস এ বিষয়ে নিশ্চিত।

নাসেরকে সঙ্গে নেওয়া হবে না শুনে দীপক বিস্মিত হয়। "কেন, নাসেরদা যাবে না কেন? ওর অপরাধটা কী?"

"অপরাধটা ওর নয়, বাবা।" মানস উত্তর দেয়। "কলকাতা এখন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এমনিতেই আমাদের যথেষ্ট ঝুঁকি। নাসেরের ঝুঁকি আরো বেশী। কখন মুখ ফস্‌কে জলকে 'পানি' বলে বসবে আর অমনি মারা পড়বে। বাপুর মিশন যদি সফল হয়, মুসলমানদের প্রাণ যদি নিরাপদ হয় তা হলে পরে আমরা ওর কথা ভাবব। ওকে মাস তিনেকের মাইনে দিয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আর কোথাও কাজ পেয়ে যাবে। এখানে না হোক ঢাকায়। সেখানেই হচ্ছে রাজধানী।"

মণিও তার মাকে একই প্রশ্ন করে। "নাসেরদা যাচ্ছে না কেন?"

"দেশ ভাগ হয়ে গেলে নাসেরদা হবে পাকিস্তানী। পাকিস্তানীরা হিন্দুস্থানে বিদেশী। বিদেশীকে কলকাতায় থাকতে দেবে না। ওকে ফিরে আসতে হবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।" যূথিকা দশ বছরের মেয়েকে বোঝায়।

মণি বোঝে না। দুঃখ পায়। দীপক বোঝে। সেও দুঃখ পায়। আরো দুঃখ পায় নাসের। এত ভালোবাসা সে আর কোথায় পাবে?

হিন্দু আমলারা বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আসেন না। কারণ তাঁরাও পশ্চিমযাত্রী। মুসলমান আমলারা একে একে আসেন ও দুঃখ প্রকাশ করেন। আর দেখা হবে না। হলেও এক অপরের কাছে বিদেশী। বেশীক্ষণ থাকেন সেরেস্তাদার ওমর আলী খোন্দকার। উদারপন্থী মুসলমান। ব্রাহ্মসমাজে যান। হিন্দুরাও তাঁকে সমীহ করে। পরেন ইউরোপীয় পোশাক।

বলেন, "হিন্দুরা সদলবলে চলে গেলে আপিস আদালত কাণা হয়ে যাবে, সার। এঁদের জায়গায় যদি বিহার থেকে একদল আসে তবে বারোটা বাজবে।"

মানস তাঁকে আশ্বাস দেয় যে বিহার সরকার কারো উপর চাপ দেবেন না। মুসলমানরাও সমান নাগরিক। উন্নতির আশায় যদি কেউ আসেন সেটা আলাদা। তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

ওমর আলী সাহেব বলেন, "অনুমতি দেন তো নিবেদন করি, হিন্দু মুসলমানের ঝগড়াটা ধর্মের ঝগড়া নয়। হিন্দুরাও পীরদের কাছে যায়, মুসলমানরাও জ্যোতিষীর কাছে। এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এই সত্যটা একদিন না একদিন মেঘমুক্ত হবে। আমরা হয়তো ততদিন বেঁচে থাকব না। তা হলে এটা কিসের ঝগড়া? এর মূলে কী আছে? এক কথায় বৈষম্য। মোগল আমলে বিস্তর হিন্দু আমলা ছিলেন, কিন্তু মুসলিম আমলাদের স্থান তাঁদের উপরে। সাড়ে পাঁচশো বছর সেইভাবে চলেছিল। আরো দু'শো বছরও চলত, যদি না ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে বসত। ইংরেজ আমলে দেখা গেল হিন্দু আমলারাই উপরে, মুসলিম আমলারা নিচে। এত নিচে যে লোয়ার ডিভিসন কেরানীর পদেও মুসলমানদের দেখতে পাওয়া যেত না পঞ্চাশ বছর আগে। এখনো আপার ডিভিসন কেরানীর পদে মুসলিম সংখ্যা খুব কম। ইংরেজ চলে গেলে হিন্দুরাই তাদের শূন্য পদ পূরণ করবে, মুসলমানদের তাতে কী? এই চিন্তা থেকেই এসেছে দেশ ভাগ। কিন্তু প্রদেশ ভাগের কথা মুসলমানদের কারো মাথায় আসেনি। এর জন্য দায়ী হিন্দুরাই। এর জন্যে সাজা পেতে হবে হিন্দুদেরই বেশী। প্রত্যেকেরই জমি আছে, বাড়ী আছে। সেসব তারা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। এপারেই ফেলে রেখে যাবে। সেসব ক্রমে ক্রমে বেদখল হবেই। তখন ওপার থেকে সিংহের মতো গর্জন করবে। ওরাই যেন ব্রিটিশ সিংহের উত্তরাধিকারী, তেমনি বলবান। ফাঁকা আওয়াজ। মরলে মরবে ওপারের মুসলমান, এপারের মুসলমানদের

গায়ে ফোস্কা পড়বে না। অমন করে মানুষের মনে লোভ জাগিয়ে দেওয়াও পাপ। তা ছাড়া জমি অনাবাদী রাখলে ফসলে টান পড়বে। লোকে না খেতে পেয়ে মরবে। কোন্ রাষ্ট্র এটা বরদাস্ত করবে?”

মানস স্বীকার করে যে কথাটা ঠিক। সেইজন্যেই গান্ধীজী বলেছেন যে যেখানে আছে সে সেইখানে থাকবে। তাঁর আবার নোয়াখালী আগমনের উদ্দেশ্যও তাই। একই উদ্দেশ্য কলকাতায় যাত্রাভঙ্গের। জিন্না সাহেবও ইতিমধ্যে মত পালটেছেন। তিনিও লোকবিনিময় চান না।

সেরেস্তাদার মানসকে অনুরোধ করেন একজন চাপরাশিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কলকাতা থেকে ফিরে আসবে। খরচ সরকার থেকে পাবে। চারদিকের অবস্থা থমথমে। কখন কী হয় বলা যায় না। পথে কে জানে কী বিপদ ঘটবে! মানস দ্বিধা করে। তিনি বলেন, “এটা আপনার ন্যায্য অধিকার।”

একজন চাপরাশি যাবে শুনে আব্বাস আলী পা বাড়ায়। এই তার কলকাতা দেখার প্রথম ও শেষ সুযোগ। সে ট্রামে চড়বে, চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখবে। কলকাতায় নাকি বাঘের দুধও কিনতে পাওয়া যায়।

“কলকাতায় আবার দাঙ্গা বাধতে পারে। তোমার ভয়ডর নেই?” নাজির সাহেব জিজ্ঞাসা করেন।

“আমার উর্দি আর চাপরাশ দেখলে গুণ্ডারা ভয় পাবে। এখনো তো ইংরেজ রাজত্ব খতম হয়নি। তার আগেই আমি ফিরে আসব।” আব্বাস বলে।

যূথিকার কষ্ট হচ্ছিল তার মহিলা সমিতির কাটুনী শাখার মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। শাখাটা তারই প্রবর্তন। এরা মাসে মাসে কিছু রোজগার করত। সেটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? যদি আর কেউ তাদের সহায় না হন?

“দিদি, আবার কবে আসবেন?” জানতে চায় ওরা।

“কী করে আসব? আমি যে বিদেশী।” যূথিকার চোখে জল।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রস্থানের পূর্বসন্ধ্যায় মানস তার ক্লাবে গিয়ে পার্টিং কল করে। সেখানে সেদিন বিলিয়ার্ডস খেলছিলেন কলকাতার কৌঁসিলি আখতারউজ্‌জামান। মানসকে দেখে খেলা ছেড়ে আলাপ জুড়ে দেন। বলেন, “জীবনটা আমার তছনছ হয়ে গেল, মিস্টার মল্লিক। ক্যালকাটা

হাইকোর্টে আমার প্র্যাকটিস সবে জমতে শুরু করেছিল, এমন সময় এই ব্রেক। ড্যাম ইওর পার্টিশন।"

"আপনাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঙ্গলের কী হলো?" জানতে চায় মানস।

"জানেন না বুঝি?" তিনি হুইস্কির ছোটা পেগে চুমুক দিয়ে বলেন, "জিন্নার আপত্তি ছিল না। গান্ধীর আশীর্বাদ ছিল। সুহরাবর্দী ও শরৎ বোস আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। কোয়ালিশনে মুসলিম লীগ নারাজ। সেপারেট ইলেকটোরেটে কংগ্রেস নারাজ। নেহরু তা ছাড়া বাংলাদেশকে বলকান হতে দেবেন না। পাছে চারদিকে বলকানীকরণের ধুম পড়ে যায়। দুই ডোমিনিয়নই ঢের। তৃতীয় কোনো ডোমিনিয়ন গড়তে দেওয়া চলবে না। এখন নেহরুই তো মালিক। তিনি যা করতে বলেন মাউণ্টব্যাটেন তাই করেন।"

মানস মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষ নিয়ে বলে, "তাঁর কথা হলো, যে যুক্তিতে ভারত ভাগ হবে সেই যুক্তিতে বাংলাদেশও ভাগ হবে। ভারতের বেলা এক যুক্তি বাংলাদেশের বেলা আরেক যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। জিন্না যদি এ যুক্তি না বোঝেন তো ভাগবাঁটোয়ারা না করেই মাউণ্টব্যাটেন ভারতত্যাগ করবেন, আর-কোনো ভাইসরয় তাঁর জায়গায় আসবেন না। ব্রিটিশ শাসনও থাকবে না। তখন বল্লভভাই পাটেলের ভাষায় 'কেওস অ্যাণ্ড অ্যানার্কি'। আমরা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসাররাও তাঁর আঁচ পাচ্ছিলুম। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে আমাদের রিপোর্টও পৌঁছচ্ছিল। তিনি যে শুধু নেহরুর কথাই শুনছেন তা নয়, আমাদের কথাও শুনছেন। আমরা চাই একটা সেটলমেণ্ট। তা সে ভাগবাঁটোয়ারা করেই হোক আর না করেই হোক। ভাগবাঁটোয়ারার জন্যে পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মাউণ্টব্যাটেনও নন, বুরোক্রাটরাও নন। আর পলিটিসিয়ানদের পেছনেই তো জনতা।"

অর্ধেক কথা মিস্টার জামানের কানে যায় না। তিনি আপনার চিন্তায় বিভোর। বলেন, "জীবনটা আমার তছনছ হয়ে গেল। তবে ঢাকা হাইকোর্টে তেমন কোনো প্রতিযোগিতা থাকবে না। অনায়াসেই উপরে উঠতে পারব। রুটিও কিছু জুটবে। কিন্তু, জানেন তো, 'ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড এলোন'। ব্রেডের সঙ্গে ওয়াইনও চাই। এই মুসলমানের রাজ্যে আমি ওয়াইন পাব কোথায়? এই ক্লাবও তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই প্রাণভরে পান করছি।"

মানসের হাসি পায়। সে জিজ্ঞাসা করে, "প্রতিযোগিতা থাকবে না কেন? মীর আবদুল লতিফও কি আসবেন না?"

"না, মিস্টার মল্লিক। তিনি মরে গেলেও কলকাতা ছাড়বেন না। এতকাল ন্যাশনালিস্ট থেকে, স্বরাজের জন্যে জেল খেটে, তিনি পাকিস্তানের জন্যে ভোল পাল্টাবেন না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যেদিকে তিনিও সেদিকে। ভারতে চার কোটি মুসলমান পড়ে থাকবে। তিনিও তাদের একজন দুর্দিনের সাথী। তাদের ফেলে পাকিস্তানে চলে আসা তাঁর মতে গুনাহ্।" জামান সাহেব বলেন।

মানস শুনে মুগ্ধ হয়। বলে, "তাঁর দিক থেকে সেটাই ঠিক। ভয় নেই, মদও বন্ধ হবে না, ক্লাবও বন্ধ হবে না। মদ মোগল আমলেও ছিল। পাকিস্তানী আমল তো মোগল আমলেরই নবপর্যায়। আমার শুভেচ্ছা রইল। খোদা হাফেজ।"

এর পরে সে যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে।

ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ দিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে রাজী হয়ে গেছে। তাঁরা ভারত কিংবা পাকিস্তান যে কোনো এক সরকারের কাছ থেকে যে যার সুবিধা অনুসারে পাবেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নয়। এটা একটা ত্রিপাক্ষিক বন্দোবস্ত। ভবিষ্যতে ভারত বা পাকিস্তান এর খেলাপ করতে পারবে না। মানস যদি চায় সেও ভারত কিংবা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে পেনসন পেতে পারবে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কারো কাছ থেকে নয়। একযাত্রায় পৃথক ফল। ইউরোপীয়দের জন্যে এক বন্দোবস্ত, ভারতীয় বা পাকিস্তানীদের জন্যে অন্য বন্দোবস্ত। মানস মনে মনে স্বীকার করে যে নিজের দেশের সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা করা অন্যায়। বড়ো জোর পেনসন দাবী করা যায়। অকালে অবসর নিলে আনুপাতিক পেনসন।

জেলা শাসক রিকম্যানের চাকরি আরো কম দিনের। তিনিও পাবেন আনুপাতিক পেনসন। সেই টাকায় সংসার চালাবেন কী করে? দেশে ফিরে গিয়ে অন্য এক চাকরি খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু সেখানে তাঁর মুরুব্বির জোর নেই। আজেবাজে চাকরিও তিনি চান না। এই যেমন ম্যাঞ্চেস্টার পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান পদ। কিন্তু এতকাল দাপটের সঙ্গে ভারত শাসন করার পর ওটা কি একটা অ্যান্টক্লাইমাক্স হবে না?

"আপাতত নিউজীল্যাণ্ডেই আমি যাচ্ছি। আমার স্ত্রী সেই দেশের মেয়ে। তিনি আমার আগেই গেছেন। দেখা যাক বরাতে কী আছে। আমি খুব একটা আশাবাদী নই, জজ।" রিকম্যান বলেন।

লোকটি কেবল কর্মপটু নন, নিয়মিত পড়াশুনা করেন। তাঁর নিজেরই এক প্রাইভেট লাইব্রেরী। বিচিত্র পুস্তকসংগ্রহ। মানস মাঝে মাঝে ধার করে পড়ে। তিনি বিক্রী করতে নারাজ। নইলে মানস খানকয়েক কিনত। বাজারে দুষ্প্রাপ্য।

কথাপ্রসঙ্গে রিকম্যান বলেন, "পাকিস্তান কি জিন্নার কথায় হয়েছে? তার পেছনে আছে ব্রিটিশ মিডল ইস্টার্ণ পলিসি। মিডল ইস্টের মুসলিম দেশগুলিতে ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সেসব দেশের মুসলমানদের সেন্টিমেণ্ট গণ্য করা চাই। নইলে মিডল ইস্ট থেকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে। তাছাড়া ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণের পর প্রয়োজন হলে পাকিস্তানী সৈন্যই তো ভরসা। ভারতীয় সৈন্যরা ভারতের বাইরে কোথাও যাবে না। এটাই গান্ধী, নেহরু, পাটেলের পলিসি। জিন্নার পলিসি তেমন নয়। পাকিস্তানী সৈন্য মিডল ইস্টের যে কোনো দেশে যেতে পারবে। সেটা মুসলিম স্বার্থও বটে। প্যান-ইসলামিজম থেকেই পাকিস্তানের জন্ম। আর যা দেখছেন তা বাহ্য। ব্রিটেনের পক্ষে পাকিস্তানই সুবিধের।"

মানস দুঃখ পায়। বলে, "তা হলে ব্রিটেনই নাটের গুরু?"

"না, না, বিশ্বাস করুন। ভারত ছেড়ে যাবার সময় আমাদেরি হাতে গড়া ভারতকে আমরা টুকরো টুকরো করে যেতে চাইনি। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন স্কীম খারিজ হলে আমাদের আর কিছু করবার থাকে না। বলা বাহুল্য, মুসলিম লীগকে অন্যভাবে তুষ্ট করলে মুসলিম লীগই ব্রিটিশ স্বার্থের পাহারাদার হতো। প্রয়োজন হলে সৈন্য সরবরাহ করার জন্যে চাপ দিত। মিডল ইস্ট সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতুম। ভাবী মহাযুদ্ধ সম্বন্ধেও, যদি বাধে। আমাদের মনে একফোঁটাও হিন্দুবিদ্বেষ নেই। মুসলিম প্রেমে যে আমরা অন্ধ তাও নয়। লেট আস পার্ট অ্যাজ ফ্রেণ্ডস।" তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দেন।

মানস জোরসে নাড়া দিয়ে বলে, "নট অ্যাজ রুলার্স অ্যাণ্ড রুলড।"

পরের দিন সন্ধ্যায় ট্রেন। স্টেশনে পৌঁছে মানস শোনে পনেরো মিনিট লেট। ওয়েটিং রুমে যূথিকা, দীপক ও মণিকাকে বসিয়ে সে প্ল্যাটফর্মের

একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়ায়। তার সঙ্গে যোগ দেন বঙ্কিমবাবু, তাঁর হাতে ফুলের তোড়া। বলেন, "পুনর্দর্শনায় চ।"

"পুনর্দর্শনায় চ।" মানস প্রতিধ্বনি করে। "আবার দেখা হবে বইকি। কিন্তু পাকিস্তানে নয়। এখানে আমি বিদেশী।"

"তা হলে কোথায়? ভারতে? সেখানে যে আমিও বিদেশী।" তিনি করুণ স্বরে বলেন। "বোধহয় তৃতীয় কোনো দেশে, যেখানে আমরা উভয়েই বিদেশী। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই যুগ যে যুগে আমরা দু'জনেই এক দেশে স্বদেশী ছিলুম।"

"আপনি কি মনঃস্থির করেছেন যে পাকিস্তানেই চিরজীবন থাকবেন? ভারতে গিয়ে সেখানকার নাগরিক হবেন না?" মানস জিজ্ঞাসু।

"আমিই হব শেষতম সেই হিন্দু পূর্ববাংলার মাটিকে যে 'মা'টি বলে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর সকলে চলে গেলেও আমি অচল। কে আমার কী করতে পারে? রাখবে তো জেলে। তার জন্যে আমি সাতাশ বছর ধরে সদা প্রস্তুত।" বঙ্কিমবাবু বলেন।

তাঁর ওই জীর্ণ শীর্ণ চেহারা দেখে মানসের বিশ্বাস হয়। বার বার জেল খেটে তিনি যেন শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছেন। মানস বলে, "না, না, জেলে রাখবে না। কেনই বা রাখবে? আপনি তো পঞ্চম বাহিনীর একজন নন। অহিংসাবাদী গঠনকর্মী। বাপুও তো বলছেন তিনি আজীবন নোয়াখালীতে থাকবেন।"

ট্রেন এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওঠে উৎকট আওয়াজ ও উন্মত্ত হল্লা। ট্রেনের একটা কামরা লক্ষ করে ছুটতে থাকে শত শত মানুষ। সবাই কি সেই কামরায় উঠবে?

সেরেস্তাদার ওমর আলী সাহেব মানসের খোঁজে আসেন। বলেন, "ও কিছু নয়, সার। নতুন স্টেশন মাস্টার এই ট্রেনে এলেন। এই প্রথম একজন মুসলমান এই প্রাইজ স্টেশনের ভার পেলেন। আশি বছর ধরে এটা ছিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের একচেটে। সেই শর্তে মহারাজা জমি দিয়েছিলেন। ও যা শুনছেন তা বোমার আওয়াজ। গান স্যালিউট। সরকার থেকে নয়, পাবলিক থেকে।"

মানস তো চিত্তির! তার খেয়াল হয় এই সেদিন তার অধীনস্থ চণ্ডীপুর চৌকীতে একজন মুসলিম মুনসেফ নিযুক্ত হয়েছেন। একদিন সেটা ছিল

ব্রাহ্মণদের একচেটে। সেই শর্তে অপর এক মহারাজা বাড়ী ভাড়া দিয়েছিলেন।

"নেমেসিস।" তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। বঙ্কিমবাবু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান। মানস বোঝায়, "অন্যায়ের প্রতিকার একভাবে না একভাবে হয়। তার জন্যে দেশ ভেঙে যায়, প্রদেশ ভেঙে যায়, মানুষ মরে, মানুষ পালায়, মানুষ তার পূর্বপুরুষের ভিটা হারায়।"

ট্রেন ছেড়ে দেয়। কামরায় আর কোনো যাত্রী ছিলেন না। ওরা চার জনে যে যার বার্থে গা মেলে দেয়। দীপক ও মণিকা ঘুমিয়ে পড়ে। মানস ও যূথিকা জেগে থাকে। পদ্মা পার হবার সময় মানস বলে, "পদ্মা এক পাড় ভাঙে, আরেক পাড় গড়ে। ইতিহাসও তেমনি। ভারত না ভাঙলে পাকিস্তান গড়া হয় না। তাই সে ভারত ভাঙে। বাংলাদেশ না ভাঙলে পশ্চিমবঙ্গ গড়া হতো না, তাই সে বাংলাদেশ ভাঙে। স্বপ্নভঙ্গ হয় গান্ধীর, তা না হলে জিন্নার স্বপ্ন সার্থক হতো না। পদ্মা নির্বিকার। ইতিহাসও তেমনি। কিন্তু এই শেষ নয়। এর পরে আরো আছে। বিচ্ছেদ থেকে আসবে বিরহ। বিরহ থেকে মিলন।"

॥ বিশ ॥

শিয়ালদা স্টেশনে নেমে যূথিকার প্রথম কথা, "চল, নন্দন ও নন্দিনীকে দেখতে যাই।" তার মানে জুলির বাচ্চা দুটোকে।

"চাচী, আপনি বাঁচি!" মানস বিরক্ত হয়ে বলে, "আগে তো নিজের বাচ্চাদুটোকে বাঁচাও। কলকাতা এখন কুরুক্ষেত্র।"

প্ল্যাটফর্মে কেউ রিসিভ করতে আসেনি, কিন্তু বাইরে যেতেই পুলিশের লোক সেলাম করে। ব্ল্যাক মারিয়া না কী বলে ওকে। বন্ধ ভ্যান। ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাতে হয়। সামনে ও পেছনে সশস্ত্র পুলিশ গার্ড জজ পরিবারকে নিয়ে যায় চোর ডাকাতের মতো। অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে দেয় হাওড়া সার্কিট হাউসে।

সেখানে অপেক্ষা করছিলেন পুলিশ বন্ধু ফিদা হোসেন। তিনিই পুলিশ থেকে যানের ব্যবস্থা করেছিলেন। মানস তাঁকে ধন্যবাদ দেয়। সার্কিট হাউসটা

মানসের নামে রিজার্ভ করা হয়েছে দেখে তিনিই পুলিশ ওয়্যারলেসে মেসেজ পাঠান, যাতে সে তাঁকে একদিনের জন্যে সেখানে একটু ঠাঁই দেয়। তার মেসেজ পেয়ে সেও মেসেজ পাঠায় তিনি যেন তার জন্যে যানের ব্যবস্থা করেন। এই হলো ইতিহাস। জীবনে কে যে কখন কোন্ কাজে লাগে তা কে বলতে পারে? সাধারণ ট্যাক্সি সে সময় নিরাপদ নয়। খুনোখুনি থামেনি। গান্ধীজী আসছেন আসন্ন মহামারী নিবারণ করতে। গভর্নর তো যাবার মুখে। পুলিশেও অদলবদল।

ফিদা হোসেন বলেন, "আমি এখন হোমলেস, মিস্টার মল্লিক। পরিবারকে ঢাকায় রওনা করে দিয়ে কলকাতায় কোয়ার্টার্স খালি করে দিয়েছি। খালি পেয়ে এই সার্কিট হাউসেই উঠেছিলুম, কিন্তু শুনি এটা আপনার জন্যেই রিজার্ভড। তাই আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। একখানা ঘরই যথেষ্ট।"

মানস খোশ মেজাজে বলে, "একখানা কেন, দু'খানা নিন।"

"নো, থ্যাঙ্কস। কালকেই আমার ভারী মালপত্তর রওনা হয়ে যাবে। ভাঙা মাসের মাইনেটাও কালকেই পেয়ে যাব। কালকেই হিন্দুস্থান থেকে চির বিদায়।" তাঁর কণ্ঠস্বরে খেদ। হিন্দুস্থান থেকে মুসলিম অফিসারগণের ঐতিহাসিক এক্সোডাস।

সার্কিট হাউসে পুলিশ পাহারা ছিল। পরিবারকে সেখানে নজরবন্দী রেখে মানস যায় আদালতে চার্জ নিতে ও তার পরে সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে তার পরবর্তী পদের ও বাসস্থানের খোঁজখবর নিতে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ লোকারণ্য। সাহেবরা না থাকায় পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে, তাই যারা কখনো ঢুকতে পারত না তারাও ঢুকে বারান্দা গুলজার করছে। থেকে থেকে এঁর ওঁর ঘরে ঢুকে তদ্বির। বড়ো বড়ো রাঘব বোয়ালদেরও চুনোপুঁটির হাল। কেউ কেয়ার করে না কার কী মর্যাদা। গোটা পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু কর্মচারী-কুলের এক্সোডাস। থুড়ি, মাশরিকি পাকিস্তান থেকে। অফিসার, কেরানী, পিয়ন ঘেঁষাঘেঁষি করে চলাফেরা করছেল।

ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল একজনমাত্র ইংরেজকে। মানসের একই বছরের সহযোগী। এই সেক্রেটারিয়াটেই একদা ইনি সেলাম কুড়িয়েছেন। এখন এঁকে ঘণ্টা কয়েক ধরে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কে একজন কেরানী-বাবু। তাঁর হাত থেকে লাস্ট পেসার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ইনি কেনিয়ায় না

নাইজেরিয়ায় পাড়ি দেবেন। ভারত থেকে ইউরোপীয় অফিসারবৃন্দের ঐতিহাসিক এক্সোডাস।

একই কালে তিন তিনটে এক্সোডাস দর্শনের সুযোগ বহু ভাগ্যে মেলে। তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম ভেঙে আবার তিনটি ধারা ত্রিপথগামী হলো।

একজন মুসলিম আণ্ডার-সেক্রেটারি তখনো চার্জ দেননি। ফাইল নিয়ে বসেছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন হিন্দু অফিসার তাঁদের নিয়োগের আদেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। মানস ঘরে ঢুকে শুনতে পায় তিনি বলছেন, "হোয়াট আ ফল, মাই কান্ট্রিমেন!" তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। মানসেরও মন কেমন করে। আর ক'দিন বাদে আর 'মাই কান্ট্রিমেন' বলতে পারা যাবে না। কত বড়ো পতন!

বাসার জন্যে সেক্রেটারিয়াটের অন্য এক কক্ষে যায়। তার বন্ধু পালিত বলেন, "বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। এর মধ্যেই সব ক'টা বাড়ী বিলি হয়ে গেছে। খালি আছে মাত্র দুটো। একটা টালিগঞ্জে। সেটা দূরে। আর একটা বালিগঞ্জে। এটাই সুবিধের, কিন্তু দু'দিন আগে বর্ডারলাইনে খুন হয়ে গেছে। রক্তের দাগ এখনো শুকোয়নি। কাছেই সাপের গর্ত। শত শত সাপ। আপনার যদি সর্পভীতি না থাকে তবে আপনি সেই বাড়ীতে গিয়ে পুলিশ পাহারায় বাস করতে পারেন। আর নয়তো—"

মানস এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে বালীগঞ্জের বাড়ীটাই তার নামে বুক করে। কারণ সেটা স্বপনদার বাড়ীর খুব কাছে। সাপ কলকাতায় কোন্‌খান থেকে এল তা অবশ্য সে বুঝতে পারে না। বন্ধুর দিকে তাকায়। তিনি বলেন, "এতদিন মানুষ বলেই জানতুম। ষোলই আগস্টের দিন দেখি মানুষ নয়, সাপ।"

মানস যায় বাড়ী দেখতে। তার পূর্ববঙ্গের কুঠির আউটহাউসও এর চেয়ে বড়ো। তা হলেও কলকাতা শহর আর খানদানী মহল্লা। এই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে! সে স্বপনদার সন্ধানে যায়।

কোলাপসিবল আয়রন গেট। সামনে গুর্খা দারোয়ান। সে চ্যালেঞ্জ করে। মানস বলে, "ফ্রেণ্ড।" তখন দারোয়ান তার হাতে একটা স্লিপ বই দিয়ে পূরণ করতে বলে। মানস হাঁক ছাড়ে, "রামদীন।" অমনি বেয়ারা ছুটে এসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম করে। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠতে গিয়ে মানস দেখে আবার এক কোলাপসিবল আয়রন গেট। "বৌদি" বলে ডাক

দিতেই তিনি বেরিয়ে এসে গেট খুলে দেন। সেই শেষ নয়। আরো এক কোলাপসিবল আয়রন গেট। সেটা স্বপনদার স্টাডির। "স্বপনদা" বলে ডাক দিতেই সেটাও চিচিং ফাঁক হয়।

"এ কে? তুমি! মানু!" স্বপনদা কোলাকুলি করে ভিতরে টেনে নিয়ে যান। "দেখছ তো, বাঙালীর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বাঙালীকে গুর্খা পুষতে হচ্ছে। বাঙালীরা এক আত্মঘাতী জাতি। পরকে আপন করতে জানে না, আপনকে পর করতে জানে। বুঝতে পারছি আমরা মূলত বাঙালী নই, বঙ্গভাষী হিন্দু ও মুসলমান। দুর্যোগের আলোয় এটা একটা রিভিলেশন।"

মানস জানায় সে এ পাড়ায় বাসা পেয়েছে। কলকাতায় চাকরি।

"বাঃ। তা হলে আর দেরি কেন? ঝটপট এসে পড়ো। গোলমাল তো মিটে আসছে। তবে পনেরোই আগস্ট ভালোয় ভালোয় পার না হলে বিশ্বাস নেই। সেদিন শুনছি হিন্দুরাই মুসলমানদের উপর শোধ তুলবে। ইংরেজ তো থাকবে না, কোন্ বাবা বাঁচাবে? তাই শহীদ গিয়ে গান্ধীজীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। বলেছে, কলকাতা একটা অগ্নিকুণ্ড। তার উপর এক কলসী পানি ঢালুন। ছায়ামন্ত্রীরা প্রকৃতপক্ষে কায়ামন্ত্রী হয়েছেন। শহীদ এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। গভর্নরেরও সে গুমর নেই। তিনি এখন মানে মানে সরে পড়তে পারলেই সুখী হন। এখন হিন্দুরাই তুঙ্গে।" স্বপনদা উদ্বিগ্ন।

মানস জানতে চায় মীর সাহেবও কি নিরাপদ। না তিনিও মানে মানে সরে পড়বেন। স্বপনদা বলেন, "না, তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ছাড়বেন না। টুকটুক আর তার দলবল তাঁর বাড়ীঘর পাহারা দিচ্ছে। হিন্দুরাই সেসব দখল করতে চায়। চকোলেট আর তার দলবল অন্যত্র পাহারা দিচ্ছে। হিন্দুরাই সর্বত্র অ্যাগ্রেসিভ।"

ফলের রস খেতে খেতে মানস সুধায়, "বৌদি, আপনিও কি আপনার দলবল নিয়ে আপনার চেনা মুসলমানদের রক্ষা করছেন?"

বৌদি ফিক করে হাসেন। "হ্যাঁ, আমিও রক্ষা করছি বইকি। আমি যাঁকে রক্ষা করছি তিনি একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান। অথচ মুসলমানদের হাত থেকে তাঁর সুরক্ষার জন্যেই কোলাপসিবল আয়রন গেট, গুর্খা দারোয়ান, স্টেনগান। তার পর তিনি কি শুধু একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান? তিনি একজন প্রচ্ছন্ন ইংরেজও বটে। তাঁর স্বজাতি তাঁর সুরক্ষার জন্যে গোরা সৈনিক পাঠায়নি বলে তাঁর কী অভিমান! এমন কী, গোরা সার্জেন্ট পর্যন্ত আসে

না। সবাই এক একটি চাচা। যাদের নীতি আপনা বাঁচা। তা হলে ইনিই বা আপনাকে বাঁচাবেন না কেন? তাই এটা তাঁর আপন খাঁচা।"

মানস হাসি চাপতে পারে না। স্বপনদার দিকে তাকায়। তিনি ধরা গলায় বলেন, "মানু, এটা হাসির ব্যাপার নয়। আমার পক্ষে জীবন মরণের ব্যাপার। আমি যার ধ্যান করেছিলুম তা ইস্ট ওয়েস্ট সীন্থেসিস। কিন্তু ওয়েস্ট যদি চলেই গেল তবে ইস্টের সঙ্গে সীন্থেসিস হবে কী করে? বিরোধ থেকেও সীন্থেসিস হতে পারে। কিন্তু বিচ্ছেদ থেকে নয়। তার পর আমার আরো একটা ধ্যান ছিল। সেটা হিন্দু মুসলিম সীন্থেসিস। মুসলমানরা যদি চলেই গেল তবে হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সীন্থেসিস হবে কী করে? আবার বলি, বিরোধ থেকেও সীন্থেসিস হয়। কিন্তু বিচ্ছেদ থেকে নয়! আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে। বৃথাই আমার নাম স্বপনমোহন। তাই আমার জীবনও ব্যর্থ হয়েছে। এখন এ জীবনের অর্থ কী? শুধুমাত্র অর্থোপার্জন ও অর্থ দিয়ে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে সন্তোষ? আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েণ্ট এসেছে। কোন্ দিকে টার্ণ করব বলতে পারো।"

মানস সহসা এর উত্তর খুঁজে পায় না। বৌদির দিকে তাকায়। বৌদি গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, "আমিও কি জানি? আমারও তো কত আশা ছিল। স্বাধীনতা বলতে বোঝাবে এক সুখস্বর্গ। কিন্তু চারিদিকে যা দেখছি তাতে সুখের ভাগ কতটুকু? মুসলমান প্রতিবেশীরা উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যে নতুন গভর্ণমেণ্ট ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী সকলেই যাতে আছেন। মুসলিম সংখ্যা কম বলে মুসলমানদের ওজন কম নয়। মৌলানা আজাদ একাই একশো। জিন্না সাহেব থাকলে তিনিও হতেন একাই এক হাজার। প্রভাব কি সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়? মীর সাহেবকে পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রী করা উচিত ছিল। তা হলে মুসলিম সাধারণের আস্থা জন্মাত। আমার তো কোনো ভয়েস নেই। আমি চীৎকার করলেও কেউ কান দেবে না। আমার চেনা মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে আমি কীই বা করতে পারি? তবে টুকটুক করছে। বাবলী করছে। ডুলিও করত, যদি তার বাচ্চা দুটোকে মাই দিতে না হতো।"

"নিজে মাই দিচ্ছে?" মানস অতটা প্রত্যাশা করেনি।

"নিজে না দিলে আর কে দেবে, বলো? দুধ মা? ওসব জমিদারবাড়ীতে দেখা যেত। জমিদারপত্নীরা তাঁদের রূপযৌবন বাঁচাতে তৎপর ছিলেন।

বাচ্চা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমরা আধুনিকারা ফীডিং বটল পছন্দ করি। জুলিকে আমি ফীডিং বটল দিয়ে এসেছি। কিন্তু সে বলে তাতে মাতৃত্বের সুখ পাওয়া যায় না। শোন কথা! অমন করলে কি ব্রেস্টের শেপ থাকে? ওই ফীডিং বটলই একালের দুধ মা। জুলি মেয়েটা দু'দুটো বাচ্চাকে মাই দিতে দিতে পেত্নী বনে যাবে। ওকে উদ্ধার করতে হবে। যূথিকা যদি একবার বলে।" বৌদি ফরমাস দেন।

মানস মুচকি হাসে। "আমাদের ছেলেমেয়ে মায়ের দুধ খেয়েছে।"

ফীডিং বটলের প্রসঙ্গ শুনে স্বপনদা বলেন, "জামালকে বিদায় দেবার পর থেকে আমার কষ্টের সীমা নেই। ওকে আমি চন্দননগর থেকে ফরাসী রান্না শিখিয়ে এনেছিলুম। ও ছিল পয়লা নম্বর ফরাসী শেফ। শেখ জামাল নয়, শেফ জামাল। আমরা ওকে হিন্দুস্থান পার্কে নিয়ে যেতে পারিনে, সেখানে ওর জীবন বিপন্ন। ওর জন্যে আমাদেরও। মুর্শিদাবাদ শুনছি পাকিস্তানে পড়েছে। ওর নিবাস নুরপুরে আমার মামাদের জমিদারিতে। এদিকে আমার দশা ছাখ। আমাকে ফীড করে কে? কোথা থেকে এক ঠাকুর জোগাড় করা হয়েছে। ওর রান্না ঠাকুর দেবতাদেরই মুখে রুচতে পারে। আমি তো ঠাকুর কি দেবতা নই। ওর হাতে খেতে খেতে আমার অগ্নিমান্দ্যের উপক্রম হয়েছে।"

"ও ঠাকুর আমার বাপের বাড়ীর ঠাকুর। ওর মতো রাঁধুনি সারা কলকাতা শহরে নেই। ওকে আমি ছাড়িয়ে দিতে রাজী আছি। কিন্তু জামালকে বহাল করতে অক্ষম। পাড়ার ছেলেরা ওকে সাপের মতো সাফ করবে। আমরা যদি বাঁচাতে যাই আমরাও মরব।" বৌদি সন্ত্রস্তভাবে বলেন।

"তা হলে, মানু, দেখছ তো দেশের অবস্থা। এটা কি একটা সভ্য দেশ? মানুষকে সাপের মতো সাফ করবে। এ দেশ কখনো সেকুলার হবে? জবাহরলাল বললেই হলো। ষোলই আগস্ট একটা সেট-ব্যাক হয়ে গেছে। পনেরোই আগস্ট যদি সেট-ফরওয়ার্ড না হয় তবে এ দেশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যাবে। তখন কি দেশ স্বাধীন ছিল না? স্বাধীনতাই কি সব? চাই প্রগতি। ইংরেজরা আমাদের প্রগতি বিধান করেছে। সেটাও তো কম মূল্যবান নয়।" স্বপনদা নিঃসন্দেহ।

"তোমার বোন বাবলী তো বলে, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। তোমারও কি সেই মত? এ স্বাধীনতা মূল্যহীন?" দীপিকাদি জেরা করেন।

"না, না, মূল্যহীন কেন হবে ? এর জন্যে কম মূল্য দিতে হয়নি। গান্ধী, নেহরু, সুভাষ, আজাদ কি কম ত্যাগ করেছেন ? আর আমাদের সৌম্য ? চকোলেট তাদেরই একজন যারা বলে সোভিয়েট রাশিয়াই তাদের ফাদারল্যাণ্ড ! ফাদারল্যাণ্ডের মুক্তি তাদের কাছে সাচ্চা। মাদারল্যাণ্ডের মুক্তি তাদের ভাবনা নয়, তাই স্বদেশের স্বাধীনতা তাদের কাছে ঝুটা। মানু, তুমি কী বলো ?" স্বপনদা মানসের দিকে তাকান। "ভাঙা বাংলায় কি কখনো বিপ্লব হতে পারে ?"

"এ অঙ্গুর খট্টা হ্যায়।" মানস বিকৃত মুখভঙ্গী করে।

"শেয়াল যা বলেছিল।" বৌদি হাসেন ও হাসান।

স্বপনদা দার্শনিকতা করেন। "মহামায়ার মায়া! ষোলই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন। পনেরোই আগস্ট দেশ দু'ভাগ ও ব্রিটিশ অপসরণ। বলতে পারো জিন্নার ওস্তাদী। ওস্তাদের মার শেষরাত্রে। তিনি ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু না করলে কি পার্টিশন হতো ? আর পার্টিশন না হলে কি দেশ স্বাধীন হতো ? গান্ধীজী বলেন, "কুইট ইণ্ডিয়া।" জিন্না সাহেব বলেন, "ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট।" দু'জনের মধ্যে জিন্নারটাই ফলেছে। কিন্তু আমার মতে কারণ থেকে কার্য নয়, কার্যের জন্যেই কারণ। এক নির্ধারিত পরিণাম ঘটনাবলীকে করেছে চুম্বকের মতো আকর্ষণ। জিন্নাই বলো, গান্ধীই বলো, নেহরুই বলো, মাউণ্টব্যাটেনই বলো, সকলেই নিমিত্তমাত্র। ইনস্ট্রুমেণ্ট অভ্ ডেস্টিনি।"

"আর তুমি কিসের নিমিত্তমাত্র ? এই বিরাট বিষয় নিয়ে একটি বিরাট উপন্যাসের ? ট্র্যাজেডী আর কমেডী মিলে ট্রাজি-কমেডীর ?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"আমি দেখে যাচ্ছি। আমি দর্শক। মহামায়ার মায়া এসব। যার রহস্যভেদ করতে পারছিনে। তাই লিখছিনে।" স্বপনদার কৈফিয়ৎ।

মানস সেবার তর্ক করেছিল। এবার করে না। প্রসঙ্গ পালটে দেয়। জানতে চায় স্বপনদার হাত পায়ের কাঁপুনি আছে না গেছে।

"জলের মাছ ডাঙায় গেলে ছটফট করে। জলে ফিরে এলে তা করে না। আমিও আমার মানস সরোবরে ফিরে এসেছি। নিয়মিত অবগাহন করছি, সন্তরণ করছি। এই লাইব্রেরীই হচ্ছে আমার মানস সরোবর। আর আমি এই সরোবরের মরাল। হাত পা কাঁপছিল হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হয়ে। এখন আর

কাঁপে না, তবে আবার কাঁপবে যদি প্রাণের দায়ে আবার পালাতে হয়।" স্বপনদা আশঙ্কা করেন।

"আর পালাতে হবে না।" অভয় দেন তাঁর তাগ্নিনী। "র‍্যাডক্লিফ আমাদের কলকাতা না দিয়ে পারবেন না। যদি বেইমানী করে পাকিস্তানকে দেন তবে আমরা সিভিল ওয়ারের ডাক দেব।"

"তা হলে আবার আমার হাত পা কাঁপবে, রাণু।" স্বপনদা আর্ত স্বরে বলেন।

"না, তোমাকে আমি লাইব্রেরী থেকে সরাব না। ওইখানেই তালাবন্ধ করে রাখব। কলকাতা জিতে নিতে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে। যদি প্রতিরোধ আসে। আসবে না, আশা করি।" বৌদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"র‍্যাডক্লিফ অমন কোনো উপলক্ষ দেবেন না, বৌদি। কলকাতা পাচ্ছে বলেই কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান মেনে নিচ্ছে। এর মধ্যেই কলকাতার পুলিশ পুরোপুরি হিন্দু হয়ে গেছে। মুসলিম অফিসাররা পাকিস্তানে চলে গেছেন। অস্ত্রশস্ত্র সমেত। চেয়ার টেবিলও সঙ্গে নিয়ে। যে দু'একজন আছেন তাঁরাও যাবার মুখে। ইংরেজ দেখলুম একজনমাত্র, তিনিও যাত্রী। হ্যাঁ, লাট সাহেব এখনো রয়েছেন, কিন্তু তিনিও সাক্ষীগোপাল। তবে তাঁর পরেই প্লাবন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে আমরা বাঁচতে ও বাঁচাতে পারব। এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যে গান্ধীজী তাঁর নোয়াখালী যাত্রা ভঙ্গ করেছেন। স্বাধীনতা দিবস রক্তপাতে কলুষিত হবে না। হলে আমরা বাপুকে হারাব।" মানস কাতর স্বরে বলে।

"আমরাও কি হারাতে চাই? তা বলে আমরা হারতেও চাইনে। মনে রেখো এটা একটা লড়াই। ওরা লড়কে নিয়েছে পাকিস্তান, কিন্তু লড়কে নিতে পারেনি কলকত্তা। এটাও যদি লড়কে নিতে যায় তবে রক্তপাত অনিবার্য। ওরা তো একদিন আগে স্বাধীন হচ্ছে। কী মজা! দিল্লীর বদলে করাচী পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম।"

এটা স্থির হয় যে পনেরোই আগস্ট ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে পরে মানস সপরিবারে তার নতুন বাড়ীর দখল নেবে। সেদিন আহারের নিমন্ত্রণ রইল। পরে একদিন সবাই মিলে জুলির বাচ্চাদের দেখতে যাওয়া যাবে।

সার্কিট হাউসে ফিরতেই যূথিকা জানতে চায়, "এত দেরি কেন?"

"স্বপনদাদের সঙ্গে দেখা করে এলুম। একই পাড়ায় থাকেন। বাড়ীটা

বর্ডার লাইনে। তাই কেউ এখনো দাবী করেনি। সাপের উপদ্রব শুনে পেছিয়ে গেছে! অর্থাৎ গুণ্ডা মুসলমানের। পনেরো তারিখটা দেখে ষোলই আমরা যাচ্ছি। সেদিন বৌদির নিমন্ত্রণ। পরে একদিন সবাই মিলে জুলির বাচ্চাদের দেখতে যাওয়া যাবে। এই ক'টা দিন সবুর করো।" মানস সাধে।

"এখানে নজরবন্দী হয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা অস্থির। যে যাই বলুক আমরা পনেরোই নতুন বাসায় যাচ্ছি। বর্ডার লাইন বলে ভয় করব না। ওসব সাপ টাপ বাজে অজুহাত। তোমাকে না দিয়ে আর কাউকে দেবার মতলব। সেইদিনই জুলির বাচ্চাদের মুখ দেখব।" যুথিকা তার সিদ্ধান্ত জানায়।

মানসের খেয়াল ছিল না যে রাত বারোটায় ইংরেজী মতে তারিখ বদল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজকুলের প্রস্থান। ভারতীয় রাজপ্রতিনিধিদের প্রবেশ। রঙ্গমঞ্চ এক মুহূর্তের জন্যেও শূন্য থাকবে না। বাইরে বোমার আওয়াজ ও মানুষের চিৎকার শুনে সে ঠাওরায় অন্যান্য রাতের মতো আবার দাঙ্গা। একটি অমোঘ মুহূর্ত পার হয়ে যায়। যুথিকা এসে তার তন্দ্রা ভাঙায়। বলে, "শুনছ তো? দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই হৈ হুল্লোড়। বোমার ধুম।"

আলো ফুটতেই শহরের গণ্যমান্যরা মানসকে ধরে নিয়ে যান ময়দানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করতে। অপ্রত্যাশিত সম্মান। পতাকা উত্তোলনের পর অনুরোধে পড়ে সে সমবেত জনতাকে বলে, "এই শুভদিনটি এমনি আনন্দ নিয়ে বার বার ঘুরে আসুক। এর সঙ্গে যে বেদনা জড়িয়ে আছে সে বেদনা দূরে যাক।" এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ভয়ার্ত মুসলমানকে সে অভয় দেয়। তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।

সেখান থেকে একদল আদালতের কর্মচারী তাকে ধরে নিয়ে যান আদালত প্রাঙ্গণে। সেখানেও পতাকা উত্তোলন। সে বলে, "লোকে এখন থেকে আমাদের কাছে অনেক বেশী প্রত্যাশা করবে। পূরণ করতে না পারলে আবার পালাবদল। এতজনের এতকালের সাধনার ফল যেন হেলায় না হারাই।"

এর পরে সে সপরিবারে রওনা হয় কলকাতায় তার নতুন আস্তানার অভিমুখে। লক্ষ করে রাজপথে মিছিলের পর মিছিল, মুহুর্মুহু ধ্বনি, প্রচণ্ড উদ্দীপনা। যেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে দেশসুদ্ধ লোক

পাগল হয়ে গেছে। যে যার সঙ্গে পারে কোলাকুলি করছে। হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই। ধনিক শ্রমিক ভেদ নেই। আছে শুধু নরনারী ভেদ। দেশটা ফ্রান্স নয়। নইলে মেয়ে পুরুষে হাত ধরাধরি করে রাস্তার মাঝখানে নাচানাচি করত। মুসলমানরা হিন্দুদের গায়ে গোলাপপানি ছিটাচ্ছে। হিন্দুরা মুসলমানদের কপালে রক্তচন্দনের টীকা দিচ্ছে। কে বলবে একদিন আগেও এরা খুনখারাপি করেছে? এ কি ক্লান্তি থেকে শান্তি? না স্বাধীনতার সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে রূপান্তর?

মানস লক্ষ করে লাটভবনের চূড়ায় রাজাজীর ব্যক্তিগত নিশান। আপিসে আদালতে কোথাও ইউনিয়ন জ্যাকের নিশানা নেই। সর্বত্র ত্রিবর্ণ পতাকায় ছয়লাপ। ইংরেজরা অদৃশ্য। এক ইংরেজ মহিলা গড়ের মাঠে আপন মনে গল্‌ফ খেলছেন, কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি কি খবর রাখেন না যে পটপরিবর্তন হয়েছে?

সেই আশ্চর্য দিনটির সন্ধ্যায় আবার আহ্বান। এবার কংগ্রেস কর্মীদের ঘরোয়া সমাবেশে। সেখানে তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। আর সবাইকে নিম্নাসনে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। সে-ই একমাত্র ভাষণ দেয়। বলে, "শুনে এসেছিলুম কলকাতায় আজ এক লঙ্কাকাণ্ড হবে। তার বদলে যা হয়েছে তা অভাবিতপূর্ব। মানুষের অন্তরে এত ভালোবাসা, এত সৌহার্দ্য নিহিত ছিল! পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ, ইচ্ছা করলে আমরা কী না করতে পারি? পৃথিবীর চেহারা বদলে দিতে পারি। ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা যখন ভাবি তখন ভারতের গৌরবময় অতীতও ম্লান হয়ে যায়। অতীতের সঙ্গে একশোবার অন্বয় রক্ষা করব। আমরা ভুঁইফোঁড় নই। কিন্তু পূর্বানুবৃত্তি করতে গিয়ে যেন পুনরাবৃত্তি না করি। স্বাধীনতা এনে দিয়েছে পুনর্নবায়নের সুযোগ। স্বাধীনতা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। এর পরবর্তী পদক্ষেপ সাম্য। লিবার্টির পর ইকুয়ালিটি। অন্য কথায় সামাজিক ন্যায়, সোসিয়াল জাসটিস। এই প্রাচীন দেশকে রাতারাতি নবীন করা বিপ্লবেরও অসাধ্য। একে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দিনে দিনে নবীন করতে হবে। শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অর্থেও। বেদ বেদান্ত, রামায়ণ মহাভারত মহান হলেও শেষ কথা নয়। চাই নতুন ধ্যান, নতুন দৃষ্টি, নতুন সৃষ্টি। নতুন অথচ উচ্চ মানের। শুধু রাজনীতিক ও সৈনিকদের নিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নয়। কবি ও মনীষীদেরও চাই।"

দিনমান মানসের মনে থাকে যে স্বাধীন ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী সেদিন বেলেঘাটার হাইদারী নিবাসে চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী অনশনরত। স্বাধীনতার অমৃত সেবন তাঁর জন্যে নয়, তিনি দেশভাগ তথা প্রদেশভাগের বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করেছেন। তাঁর আজকের ভাবনা কেমন করে কলকাতা শহরকে ভ্রাতৃরক্তপাত থেকে বিরত রাখবেন। কলকাতা নিবৃত্ত থাকলে পূর্ববঙ্গও নিবৃত্ত থাকবে। পাকিস্তানের স্বাধীনতাও রক্তপাত থেকে মুক্ত হবে।

শহর যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো শান্ত হয়। অন্তত একটা দিনের জন্যে লোকে ভুলে যায় যে তারা গোটা বছর ধরে মারামারি করেছে। স্বপনদা মিরাক্লে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেন যে গান্ধীজী না থাকলে ও অনশন না করলে ভয়াবহ ঘটনা ঘটত। গান্ধীজীর মতো ব্যক্তি থাকতে পরিণামের চুম্বক যে ঘটনার পর ঘটনাকে লোহার শলার মতো আকর্ষণ করবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

সেদিন যূথিকা তার নতুন ঘরদোর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে। আসবাবপত্র সাজায়। পিয়ানো বাজায়। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেয় স্বপনদার বাড়ী এল্‌কের সঙ্গে খেলা করতে। পরে একসময় সেও যায় একবেলা খেতে। রাতের রান্না নিজের বাড়ীতেই হয়।

পরের দিন ওরা সবাই মিলে জুলির বাচ্চাদের দেখতে যায়। যূথিকা একটিকে কোলে নেয়। দীপিকাদি আরেকটিকে। জুলি হাঁ হাঁ করে ওঠে। যেন তার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে। দুই মাসীর আদরে বাচ্চা দুটো কিন্তু দিব্যি আরামে থাকে। মায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।

যূথিকা বলে, "এটার নাম গুণ্ডা। ওটার নাম গুণ্ডী। কিন্তু অমন নাম তো ভদ্রসমাজে চলে না। তাই নাম রাখছি নন্দন আর নন্দিনী।"

জুলি খুশি হয়। "কিন্তু ওর থেকে বোঝা যাবে না যে ওরা যমজ। যেমন রূপ আর রূপী। ওদের বাপের দেওয়া নাম। তবে এখনো পাকা হয়নি। হবে অন্নপ্রাশনের সময়। ওদের বাপ খালাস পেলে।"

দীপিকাদি অবাক হন। "সে কী? আবার কবে জেলে গেল?"

"না, জেলে যাবে কেন? জলন্ত জাহাজের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপটেনের হুকুমে কাসাবিয়াঙ্কার মতো। ক্যাপটেন আপনি বাঁচবেন কি-না সন্দেহ। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। এবারকার পণ হয়েছে এপারে মুসলমানকে বাঁচানো, ওপারে হিন্দুকে বাঁচানো।" জুলি ব্যাখ্যা করে।

"করেঙ্গে বড়ো শক্ত ব্যাপার, জুলি। বাকীটা আমি নাই বা বললুম। সৌম্যকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে।" দীপিকাদি বলেন।

"মাউণ্টব্যাটেন এমন খেলা খেলেছে যে ইংরেজরা একজনও বিপন্ন নয়, বরং জনপ্রিয়। দিল্লীতে জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে, মাউণ্টব্যাটেনকী জয়। অথচ যাঁর জন্য দেশ স্বাধীন হলো সেই নেতাজী দেশের মাটিতে পা দিতে পারছেন না। তাঁর সমূহ বিপদ। কী করে মানুষ আনন্দ করবে? বাপু তো অনশন করছেন। ইচ্ছে করে বেলেঘাটা গিয়ে তাঁর সেবা করতে। কিন্তু আমার বাচ্চাদের দেখবে কে? মা'র কত কাজ। আর এ দুটো কি কম দুষ্টু?" জুলি তার বাচ্চাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়।

ওদিকে মিসেস সিন্‌হা কথা বলছেন স্বপনদার সঙ্গে। "নতুন গভর্নর এলেই তাঁর লেডী আমাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করতেন। বছরে একবার করে বাঁধা নিমন্ত্রণ। সেসব দিন কি আর আসবে! আহা. ফ্রেঞ্চ মেনু।"

"Gone with the wind! দু'শো বছরের সাম্রাজ্য একটি রাতের স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল! আহা, ফ্রেঞ্চ মেনু!" স্বপনদা সমবেদনা জানান।

ফ্রেঞ্চ শুনে মানসের মনে পড়ে ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

"Bliss was it in that dawn to be alive,
And to be young was very heaven."

"ওয়ার্ডসওয়ার্থ তখন তরুণ ছিলেন। আমরা তো আর তরুণ নই।" স্বপনদা করুণস্বরে বলেন, "তরুণ হলে তরুণীদের সঙ্গে প্যারিসের মতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাচতুম। ফরাসী বিপ্লবের দেড়শো বছর পরেও চৌদ্দই জুলাই ওরা নাচে। পনেরোই আগস্ট কই কাউকে জোড়ে জোড়ে পথে ঘাটে নাচতে দেখা গেল না। যারা নেচেছে তারা ক্যালকাটা ক্লাবে বা স্যাটারডে ক্লাবে নেচেছে।"

"কী ঘেন্না!" মিসেস সিন্‌হা রুমাল দিয়ে হাসি চাপেন। তার পর সেই রুমালে চোখ মুছে বলেন, "নাচবে কোন্ আহ্লাদে? যার স্বামী জ্বলন্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে কি মনের আনন্দে নাচতে পারে? না হলে কার সঙ্গে নাচবে? যার গুরু বিষ পান করে নীলকণ্ঠ সে কি অমৃত পান করে নাচতে পারে? রাতের মাঝখানে চিৎকার করে বলেছে, আমি যদি এমনভাবে আটক না হতুম তা হলে দেখতুম কেমন করে পার্টিশন হয়। থাকতেন যদি নেতাজী তা হলে তিনিও দেখতেন কার সাধ্য দেশ ভাগ করে, প্রদেশ ভাগ করে।"

"হ্যাঁ, ওর মুখখানি দেখে মায়া হয়। বেচারি যেন কালি মেখেছে। কিন্তু ওটা ওর ভুল ধারণা। দেশের লোকই পার্টিশন চেয়ে নিয়েছে। কেউ ভারতের পার্টিশন, কেউ পাঞ্জাবের পার্টিশন, কেউ বাংলার পার্টিশন। যে যা চেয়েছে মাউণ্টব্যাটেন তাকে তা দিয়েছেন। যীশুকে ওঁর দেশের লোকই ক্রুশে বিঁধতে চেয়েছে। পাইলেট কী করবেন ? তিনি হাত ধুয়ে ফেলে বলেছেন, এই নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তপাতের জন্যে আমি দায়ী নই।" স্বপনদা মনে মনে হাত ধুয়ে ফেলেন।

ওদিকে যুথিকা বলছে জুলিকে, "তোমার খোকাখুকুর মুখ দেখার আনন্দে দু'জনের জন্যে দুটি গিনি দিয়ে যাচ্ছি। ওরা দীর্ঘজীবী হোক। বাপমায়ের যোগ্য সন্তান হোক।"

দীপিকাদি ও কাজ আগেই সেরে রেখেছিলেন। জুলি খুশি হয়। কিন্তু কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, "ওটা তো ইংরেজদের মুদ্রা। ওতে ওদের রাজার মাথা।"

"কী করা যায়, বলো ! তোমরা যেদিন নতুন মুদ্রা বার করবে সেদিন আরেক দফা মুখ দেখব। হয়তো আরেক জুটির।" যুথিকা রঙ্গ করে।

"না, না, যুথীদি। আর নয়। এবার বৌদির পালা।" জুলি হাসে।

"আমার যদি হয় তো একটিই হবে।" বৌদি ঠিক জানেন।

"সেটির জন্যে আমি এখন থেকেই একটি গিনি জমিয়ে রাখব, যদি স্বদেশী মুদ্রা না পাই।" জুলি কথা দেয় গম্ভীর মুখে।

"আমিও।" যুথিকা হাসে। "বৌদির খোকা হবে স্বাধীন দেশের সন্তান। ওর জন্যে গিনি নয়, সোনার মোহর।"

দীপিকাদির মুখে হাসি নেই। বলেন, "কোথায় সে ?"

ওদিকে স্বপনদা বলছেন মানসকে, "এই মুহূর্তে আমরা ফরাসীদের চেয়েও স্বাধীন। আমাদের দেশ থেকে ব্রিটিশ দখলদার সৈন্য অপসরণ করছে। ফ্রান্সে এখনো মার্কিন সৈন্য মজুত। ফরাসীদের নৃত্য প্রাণশূন্য।"

"ব্রিটেন থেকে রোমান সৈন্য অপসরণের মতো ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসরণ। ইতিহাসের দুই অসাধারণ ঘটনা। দুই বিস্ময়। পার্টিশন না হলে, পা কাটা না গেলে আমরা তাণ্ডব নৃত্য করতুম। ভৈরবীদের নিয়ে।" মানস চুপি চুপি বলে।

॥ একুশ ॥

কথাটা দীপিকাদির কানে যায়। তিনি যূথিকাকে বলেন, "আমাদের গোলামি দু'শো বছরের নয়, সাতশো বছরের। মুসলমান আর ইংরেজ একের পর এক আমাদের গোলাম করে রেখেছে। সাতশো বছরের দাসত্ব থেকে অবশেষে আমাদের মুক্তি। তবু আনন্দ কই? পূর্ববঙ্গ এখনো পরাধীন।"

জুলির মা মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বেন না। এলাহি বন্দোবস্ত। স্বপনদা বলেন, "আমরাও এত সহজে ছাড়ব না, মাসিমা। দুই নাতি নাতনির খাতিরে দু'বার ভোজ দিতে হবে। একবার যথেষ্ট নয়।"

"তা তো বটেই। কিন্তু আগে ওদের বাপটিকে আসতে দাও। ও বেচারা হয়তো ওর গুরুর মতো অনশন টনশন কিছু করছে।" মিসেস সিন্‌হা বলেন।

"ইংরেজ রাজত্ব শেষ।" স্বপনদা জুলিকে বলেন, "তোমাদের ভূমিকাও শেষ। এখন থেকে তোমরাও আমাদের পাঁচজনের মতো ঘরসংসার করো। বাচ্চা দুটো রোজ একটু একটু করে বাড়ছে। তা তো স্বচক্ষেই দেখছি। এদের দাবী আগে, না পাবলিকের দাবী আগে? আর পাবলিকের দাবীর কি অন্ত আছে? স্বাধীনতা হলো, এখন বলবে স্বর্গ হলো না কেন?"

"ওই কথাটা ওকে আর ওর বরকে বুঝিয়ে দাও, বাবা স্বপন। ওই বাচ্চা দুটোকে মানুষ করবে কে? আমার কি আর সে বয়স আছে? সৌম্যর গুরুভাইয়েরা তো এখন গভর্নমেণ্ট গঠন করেছেন। যেমন দিল্লীতে তেমনি কলকাতায়। ওঁদের ধরলে কি একটা চাকরি মেলে না?" মিসেস সিন্‌হা জিজ্ঞাসা করেন।

"মেলে। মেলে। চাইলেই মেলে। স্বাধীনতার অর্থ কী? স্বাধীনতার অর্থ, অর্থ। স্যাক্রিফাইসকে ক্যাশ করাই স্বরাজের মর্ম। সৌম্য যদি চাকরি করতে রাজী থাকে তো ওর জন্যে একটা জাঁকালো পদ সৃষ্টি করতে হবে। সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল অভ্ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন।" স্বপনদা ইঙ্গিত করেন।

"ধ্যেৎ!" জুলি চটে যায়। "ও কখনো ওরকম ছোট চাকরি নেবে না। ওকে ডাইরেক্টর জেনারেল করলেও না। চাইলেই ও মন্ত্রী হতে পারে।

বাপুর একটা ইশারাই যথেষ্ট। কিন্তু তাও না। ওর সামনে আরো বড়ো ভূমিকা। স্বাধীনতার পরের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোদয়। তার জন্যে সঙ্ঘ গঠন করতে হবে। সেকালে যেমন বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ একালে তেমনি গান্ধী, ধর্ম, সঙ্ঘ। ধর্ম অবশ্য হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম বা খ্রীস্টান ধর্ম নয়। ধর্ম হচ্ছে নীতিধর্ম। সত্য ও অহিংসা। বুদ্ধের যেমন সারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন গান্ধীর তেমনি বিনোবা ও বাদশা খান্‌। দুঃখের বিষয় বাদশা খান্‌কে ভারতে পাওয়া যাবে না। তিনি পাকিস্তানের ভার নেবেন। সৌম্য যেন একনিষ্ঠ এক ভিক্ষু। আর আমি যেন ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া।"

"কিন্তু ওদের তো ছেলেমেয়ে ছিল না।" যূথিকা রসভঙ্গ করে।

"কী করে জানব? বুদ্ধের তো ছিল। ব্যবস্থা একটা কিছু হবে। তা বলে সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল! খাদিকর্মী বলে কি এতই গরিব? নেই নেই বলেও ওর যা আছে তা খায় কে? তার সঙ্গে আমার যা আছে তা জুড়লে আমরাই কত লোককে খাওয়াতে পারি।" জুলি ঠাট্টাও বোঝে না।

তখন মানস তার পক্ষ নেয়। "জুলি বৌদির যা বক্তব্য তা বোধ হয় সৌম্যদারও বক্তব্য। এককালে আমাদের রাষ্ট্রও ছিল, সঙ্ঘও ছিল। তা নইলে সম্রাট অশোককে শান্তির পথে প্রবর্তিত করত কে? পরিচালিত করত কে? নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়ে আমাদের একালের রাষ্ট্রনায়করা যে যুদ্ধবাদী হবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? গান্ধীজী যতক্ষণ আছেন ততদিন তিনিই গ্যারাণ্টি। কিন্তু গান্ধীজীর পর কে? বুদ্ধ না থাকলে সঙ্ঘ। তেমনি গান্ধী না থাকলে সঙ্ঘ। ভার নিতে হবে আরো কয়েকজন অনুগত শিষ্যের মতো সৌম্যদাকেও। অতএব জুলি বৌদিকেও।"

জুলি তা শুনে আনন্দে হাততালি দেয়। "হীয়ার! হীয়ার!"

"শহীদ হতে হবে না তো?" জুলির মা হকচকিয়ে যান।

"কে বলতে পারে? অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। দেশের নেতারা যদি গান্ধীজীর অবর্তমানে নীতিভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, দেশের লোকও যদি তাঁদের সংযত না করে নিজেরাই উচ্ছৃঙ্খল হয়, তা হলে সৌম্যদার মতো সত্যাগ্রহীরা শুধু জেলে গিয়ে সন্তুষ্ট হবেন না, আরো দূরে যাবেন।" মানস বাকীটা চেপে যায়।

"বুঝেছি।" জুলির মা মুখ ভার করেন। "সে তখন দেখা যাবে। এখন

ওসব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাক। খুশি হয়ে মিষ্টি মুখ করো তোমরা। আর এই দুটি প্রাণীকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করো।"

সকলে একবাক্যে দীর্ঘায়ু কামনা করেন ও মিষ্টান্ন ভোজনে মন দেন।

যুথিকা প্রস্তাব করে, "ঘটা করে অন্নপ্রাশন ও নামকরণ যাতে হয় তার জন্যে পিতার উপস্থিতি চাই। তাঁকে চিঠি লেখা যাক।"

"হ্যাঁ। পূর্ববঙ্গ এখন শান্ত। অবশ্য বলতে নেই। টাচ উড। কাঠ ছোঁও। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা হয়তো ঠাণ্ডা, কিন্তু করাচী থেকে ফরমান কি ফতোয়া এলে গরম হতে কতক্ষণ! এটা যদি শুধুমাত্র হিন্দু মুসলমানের শরিকী মামলা হতো তবে কবে মিটে যেত। কিন্তু তা তো নয়। এর পেছনে আরব আছে, ইরান আছে, তুরস্ক আছে, গোটা ইসলামী দুনিয়া আছে। আর আছে ইংলণ্ড, আমেরিকা, পর্টুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। আমরা নিতান্তই নিঃসঙ্গ। ওই ক'টি ন্যাশনালিস্ট মুসলিম আমাদের সম্বল। স্বাধীন হয়েও কি আমাদের সোয়াস্তি আছে? মুসলিম লীগকে বহিষ্কার করতে পেরেছি। কিন্তু একই কাজ করছে হিন্দু মহাসভা। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী লবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।" দীপিকাদি দুঃখ করেন।

"কংগ্রেসের উপরেই ওদের রাগ। কংগ্রেস কেন একাই রাজ্যভোগ করছে? ওদের ভাগ দিচ্ছে না? কী করে দেবে, যদি পলিসি এক না হয়? পরের বারের নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোটে হারিয়ে দিতে পারলে রাজ্য তো ওদেরই। না পারলে বুঝতে হবে লোকে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক নীতি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি, অল্পস্বল্প সমাজতন্ত্র অভিমুখী নীতি পছন্দ করে।" মানস যতদূর বোঝে।

"সমাজতন্ত্র দূর অস্ত্! আমি জার্মানীতে ছিলুম। সোশিয়াল ডেমোক্রাট-দের সঙ্গে মিশেছি। ডেমোক্রাট হয়ে সোশিয়ালিস্ট হওয়া শক্ত। সোশিয়ালিস্ট হয়ে ডেমোক্রাট হওয়া শক্ত। এটা যেন একই কালে দুই ফ্রণ্টে লড়াই। কংগ্রেস যদি সোশিয়াল ডেমোক্রাট হয় তাকেও দুই ফ্রণ্টে লড়তে হবে। তার হাতে সমাজতন্ত্র সফল হলে গণতন্ত্র বিফল হবে। গণতন্ত্র সফল হলে সমাজতন্ত্র বিফল হবে। এ সমস্যা হিন্দু মুসলিম সমস্যার চেয়েও অমীমাংস্য।" স্বপনদার মতে।

"হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মূলে রয়েছে নারীহরণ ও ধর্মান্তরীকরণ সম্বন্ধে বিপরীত মনোভাব। এ দুটি বিষয়ে মতান্তর থাকতে ওরা কখনো এক হবে

না। বাংলাদেশও না। নোয়াখালীর ঘটনাই উভয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। গান্ধীজী এখনো বিশ্বাস করেন যে হিন্দুরা আল্লাহো আকবর আর মুসলমানরা বন্দে মাতরম্ বলে মন্ত্র পড়লে হিন্দুর হৃদয় মুসলমানের হবে, মুসলমানের হৃদয় হিন্দুর হবে। তিনি এই আটাশ বছরে কিছুই শেখেননি, কিছুই ভোলেননি। ফরাসী দেশের Bourbon রাজাদের মতো। তাঁর বেঁচে থাকা না থাকার উপর কিছুই নির্ভর করে না।" দীপিকাদি বলেন।

জুলি মর্মাহত হয়। "বাপুকে আমরা অকালে হারাতে চাইনে। তিনি চলে গেলে রাষ্ট্র থাকতে পারে, কিন্তু সভ্য গড়ে উঠবে না। অন্তত বাংলাদেশে। অহিংসার সাধনা উঠে যাবে। সত্যাগ্রহ বলে যা চলবে তার মধ্যে সত্যের ভাগ কম। অসত্যের ভাগ বেশী। আমরা তা হলে কিসের পত্তন করে যাব? লোকে আমাদের দিকে তাকাবে কেন? তাকাবে বাবলীদের দিকে। ওদের প্রোফেটের দিকে। মার্কসবাদ এখন একটার পর একটা দেশ জয় করে চলেছে। চীনও শুনছি ওদের দিকে ঝুঁকছে। তা হলে কি লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাবে?"

"কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী?" দীপিকাদি প্রশ্ন করেন।

"লেনিন বলেছিলেন কমিউনিজম পিকিং-এর পথ দিয়ে কলকাতায় যাবে আর কলকাতার পথ দিয়ে প্যারিসে। চীন যদি লাল হয় তবে ভারতের একাংশ কেন সমস্তটাই লাল হতে পারে, বৌদি। নীলের পক্ষ আমরা নেব না। গান্ধীপন্থীরা পুঁজিপতি বা জমিদারদের শিবিরভুক্ত নয়। তাঁদের নিজেদের একটা শিবির আছে। তাতে দু'চারজন পুঁজিপতি ও জমিদার আছেন। বুদ্ধের শিবিরেও অনাথপিণ্ডদ ছিলেন। সেকালের একজন সেরা শ্রেষ্ঠী। আমাদের কাছে কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। ছোটও না, বড়োও না। সব শ্রেণীকে নিয়ে আমরা কাজ করি। কিন্তু সে কাজ আমাদের মতবাদসম্মত কাজ। শ্রেণীযুদ্ধে আমরা বিশ্বাস করিনে। যেমন করিনে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে নেমেছিলুম তারা ইংরেজ বলে নয়, তারা সাম্রাজ্যবাদী বলে। যেই ওরা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিল অমনি ওরা আমাদের বন্ধু বনে গেল। মাউণ্টব্যাটেনকে আমরাই আমাদের প্রথম গভর্নর জেনারেল মনোনয়ন করেছি।" জুলি একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

"তার মানে তোমাদের নেতারা ধড়িবাজ পলিটিশিয়ান। হেরডকে আউট-হেরড করার মতো জিন্নাকে আউ-জিন্না করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনকে বসিয়ে

দিয়েছেন দিল্লীর সিংহাসনে। দুনিয়ার দৃষ্টি তাঁর উপরেই। জিন্নার উপরে নয়। বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। হা হা! কোথায় হাজার বছরের দিল্লী আর কোথায় একশো বছরের করাচী! বারো বছর আগে প্রদেশের রাজধানীও ছিল না। আর মাউণ্টব্যাটেনও কম ধড়িবাজ নন। কংগ্রেস নেতাদের এমনভাবে বশ করেছেন যে তাঁরা কমনওয়েলথে যোগ দেবার জন্যে লীগ নেতাদের চেয়েও ব্যাকুল। ফলে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অনায়াসে লাভ করেছেন। কমনওয়েলথের মাথার উপরে ইংলণ্ডের রাজা থাকবেন, তাই রাজন্যদেরও মান থাকবে। নইলে কি তাঁরা বিনা প্রতিরোধে যোগ দিতেন? রেপাবলিকের প্রস্তাব পাশ করার পর নেতাদের খেয়াল হয় যে ডোমিনিয়ন হওয়াই লাভজনক। বুদ্ধির যুদ্ধে জিন্না সাহেব যা পেয়েছেন নেহরু ও পাটেল তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছেন। বেচারা মৌলানা আজাদের জন্যে দুঃখ হয়। আরো দুঃখ হয় খান্ আবদুল গফ্ফার খানের জন্যে।" দীপিকাদি ব্যথিত।

"সব চেয়ে ট্র্যাজিক ফিগার কিন্তু গান্ধীজী।" স্বপনদা বলেন। "সারা জীবনটাই ত্যাগ করে এলেন, কিছুই ভোগ করলেন না। ওঁরই তো মাউণ্টব্যাটেনের আসনে বসার কথা। পড়ে আছেন বেলেঘাটার হায়দারী মঞ্জিলে। এক পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ী। আবর্জনায় ভরা। শহীদকেও সাথী করেছেন। তাতে হিন্দুদের প্রচণ্ড আপত্তি। তবে মুসলমানদের প্রবল আস্থা। পাঞ্জাবে পঞ্চান্ন হাজার সৈনিকের বাউণ্ডারি ফোর্স থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে বা পালাচ্ছে। এখানে ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স। তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। মাউণ্টব্যাটেন তো অবাক! ওই একটি মানুষের জন্যে কত লোক বাঁচল। তবে তাদের ঘরবাড়ী বহুক্ষেত্রেই বেদখল। হিন্দুরা সরকারের হুকুম মানবে না। পুলিশকে ভয় করে না। বেদখলকারীরা মালিক হয়ে বসে আছে। ওঠাতে গেলে বোমাবাজি।"

মানস জানতে চায়, "মীর সাহেবের উপরেও কি বোমাবাজি?"

"না, সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে যশোবিকাশ রায়ের কন্যা যশোধরা ওরফে টুকটুক। আর তার দলবল। তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান আছে। জানো তো, ও মেয়ের প্রথমে বিয়ে হয়েছিল বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে, তার পরে আমেরিকান খ্রীস্টানের সঙ্গে। ও একাই একটা হস্‌পিস চালাচ্ছে। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান লাঞ্ছিতারা অতিথি। মাদার সুপিরিয়র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। একদিন যেয়ো দেখতে। নৈতিক সমর্থন চাই।" স্বপনদা বলেন।

"আচ্ছা, আমরা একটু গুছিয়ে নিই।" যুথিকা আগ্রহ দেখায়।

"আমাদের সাধ্য থাকলে আমরা নোয়াখালীতেও হস্‌পিস চালাতুম। বিহারেও। পাঞ্জাবেও। কিন্তু কর্তাদের ছেড়ে যাই কী করে? আমার তো চাকরিও আছে। তার উপর এক কুকুর। সন্তানের মতোই প্রিয়। শুনছি মধুমালতী পাঞ্জাবে খুব কাজ করছে। লেডী মাউণ্টব্যাটেনের উৎসাহে ও সাহায্যে। বিস্তর মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। করেছেন প্রধানত মৃদুলা সরাভাই। জবাহরলালের উৎসাহে ও সাহায্যে।" দীপিকাদি সংবাদ দেন।

"মধুমালতী কে? আমাদের মিলি? ও নাকি এখন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে হাসপাতালে হাসপাতালে রেফুইজী ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরছে। ওর সেবাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা আছে। ও একজন পাকা নার্স। বিলেতেও জার্মানদের ব্লিৎস ক্রীগের সময় জখমী ব্যক্তিদের নিজে অ্যাম্বুল্যান্স চালিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিত! তার আগে ফার্স্ট এড দিত। ব্যাণ্ডেজ বাঁধত। লেডী মাউণ্টব্যাটেন তো ওকে ভালোবাসবেনই। তবে ও সব খুলে বলেছে। কেমন করে টেররিস্ট হয়। কেমন করে রিভলভার জোগাড় করে। কেমন করে গুলী চালায়. কিন্তু অনুশীলনের অভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বহু বছর জেলে আটক থাকে। টি বি. সন্দেহ করে সরকার তাকে ভাওয়ালীতে পাঠায় ও পরে ছেড়ে দেয়। তার বাবা যুদ্ধফেরৎ ডাক্তার। তিনিই জামিন হন, সে আর কখনো অমন কাজ করবে না। সন্ত্রাসবাদের উপর থেকে তারও বিশ্বাস উঠে যায়। ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুর সংঘর্ষের বেনিফিসিয়ারি হয় মুসলমান। সে রাজনীতিই ছেড়ে দেয়। বিয়ে করে। বিলেত যায়। সেখানে যুদ্ধের কাজে ইংরেজদের সাহায্য করে। ওদের পুরনো রাগ পড়ে যায়। দেখেশুনে ওর ধারণা জন্মায় যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র সাম্রাজ্য ওরা প্রত্যর্পণ করবে না। তাই ওর নিজের রাগ পড়ে না। ও দেশে ফিরে এসে যাদের সঙ্গে মেশে তারা মিউটিনির চক্রান্ত করছিল। ধরা পড়ে বিলেত চালান যায়। তার পর ওর প্রত্যয় হয় যে মাউণ্টব্যাটেন ভারতে স্বাধীনতা দিতেই আসছেন। সেও তার বরকে ও ছেলেকে নিয়ে ফেরে। ছেলেকে শান্তিনিকেতনে দিয়ে ওরা চলে যায় দিল্লী। সেখানে সুকুমার হয়েছে কংগ্রেস নেতাদের পার্শ্বচর আর মিলি লেডী মাউণ্টব্যাটেনের সহচরী।" জুলি সব খবর রাখে।

মানস বলে, "স্বাধীনতার যোদ্ধারা সবাই আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। বাকী থাকবেন কেন মধুমালতী দত্তবিশ্বাস? ছেলেকে মানুষ করতে হবে না?"

"আমার মেয়েকে আমিও সেই কথা বলি।" জুলির মার উক্তি।

"বাপু বেঁচে থাকতে সৌম্যকে ও কথা ভাবতে হবে না। পরে অবশ্য ভাবতে হবে। তার এখন বাইশ তেইশ বছর বাকী।" জুলি সুনিশ্চিত।

বিশ্বাসে মিলয়ে আয়ু, তর্কে বহুদূর। সবাই মৌন।

গান্ধীজী নোয়াখালী যাবার জন্যে বিষম ব্যগ্র। কথা দিয়েছেন, কথা রাখতে হবে। কিন্তু নোয়াখালী থেকেই হিন্দুরা এসে বলে, "আপনি এখন যাবেন না। আগে কলকাতা শান্ত হোক। এখানে মুসলমান মরলে ওখানে হিন্দু বাঁচবে না।"

শহীদ সুহরাবর্দীও তাঁকে কলকাতা ছাড়তে দেন না। যতক্ষণ কলকাতার মুসলমানদের মনে ত্রাস আছে ততক্ষণ তাঁকে কলকাতায় থেকে তাদের ত্রাণ করতে হবে। কতক্ষণ? তা কেউ বলতে পারে না।

তারপরে সেই গান্ধীই নোয়াখালীতে গিয়ে হিন্দুদেরও ত্রাস থেকে ত্রাণ করবেন। বাকী জীবনটা নাকি তিনি সেইখানেই কাটাবেন, যদি দরকার হয়। হিন্দুও বাঙালী, মুসলমানও বাঙালী। বাঙালীকে বাঙালী না বাঁচালে বাঁচাবে কে? একজন গুজরাটী হিন্দু?

"আবার মজা ছাখ।" স্বপনদা বলেন, "বাঙালী মুসলমানকে ইংরেজের তথা হিন্দুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন কে? এক গুজরাটী মুসলমান। ওরা নাকি একদিন আগে পাকিস্তান পেয়েছে। যদিও পার্লামেন্টের আইন অনুসারে রাত বারোটার পর ভারত তথা পাকিস্তান উভয়ের স্বাধীন সত্তা।"

"আমি যতদূর জানি ওয়াও আমাদেরই মতো চৌদ্দই আগস্টের মাইনে কলকাতার ট্রেজারি থেকেই ড্র করেছে। চৌদ্দই আগস্ট ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিন। মুসলিম রাজত্বের প্রথম দিন নয়।" মানস জানায়।

পরের দিন স্বপনদাকে নিয়ে মানস মীর সাহেবের সন্ধানে বেরয়। পায়ে হাঁটার দূরত্ব। তবু স্বপনদার খাতিরে গাড়ীতেই যেতে হয়। তাঁর পায়ের কাঁপুনি তিনি বাইরে প্রকাশ করতে চান না। সেটা বাড়ীতে বোঝা যায় না। সেখানে তিনি ষোল আনা নিরাপদ।

মীর সাহেব উৎফুল্ল হয়ে অভ্যর্থনা করেন। "আইয়ে হজরত, তশরিফ লাইয়ে। কবে এলেন? কিছুদিন থাকবেন তো?"

"এবার বদলী হয়ে এসেছি, মীর সাহেব। কাছেই বাসা। একদিন আপনাকেও তশরিফ আনতে হবে।" মানস অনুরোধ করে।

"টু বি অর নট টু বি, ছাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। হ্যামলেটের মতো আমারও এই প্রশ্ন। আমি যদি এই ডোমিনিয়নে থাকি তো ঘরের ছেলের মতোই থাকব। পরের ছেলের মতো নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও তো কিঞ্চিৎ কনট্রিবিউশন ছিল। তা হলে স্বাধীনতার পর আমাকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে কেন? আমি ধর্মে মুসলমান। এইজন্যেই কি কোথাও বেরতে পারব না? আপনি যেমন ফ্রী আমি তেমন ফ্রী নই, মল্লিক সাহেব। কী করে আপনার দৌলতখানায় তশরিফ আনব?" তিনি অভিযোগ করেন।

মানসের মাথা কাটা যায়। সত্যিই তো সে যেমন ফ্রী তিনি তেমন নন। টুকটুক বা তার দলের একটি মেয়ে পাহারা দেয়, তা ছাড়া পুলিশের লোক দেখে যায়।

"আপনি যে একজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমান তা কে না জানে? তা সত্ত্বেও এমন ভোগান্তি!" মানস বিস্ময় প্রকাশ করে।

"জাতীয়তাবাদী এই বিশেষণটা ওরা বেমালুম ভুলে গেছে। মনে রেখেছে মুসলমান এই বিশেষ্যটা। কিছুদিন আগে শোনা যেত পলাশীর পরাজয় থেকেই পরাধীনতার সূচনা। এখন পলাশীর বিজেতারা প্রস্থান করেছে, তাই এদেশ স্বাধীন। কিন্তু ইতিমধ্যে থীসিসটা বদলে গেছে। সাতশো বছর আগে থেকেই পরাধীনতার সূচনা। সেদিনকার বিজেতারা তো প্রস্থান করেনি। তাদের যদি না বিদায় করি তবে তো পরাধীনই রয়ে গেলুম। এই যে মীর আবদুল লতিফ ইনিও সেদিনকার বিজেতা বংশধর। অতএব এঁকেও ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হবে। তারপর এঁর গরিবখানা আমাদের। একেবারে নিখরচায়। মাথার উপর সরকার নেই, হাই কোর্ট নেই, আইন নেই, কানুন নেই। একমাত্র যুক্তি মুসলমানদের আদি নিবাস ভারতে নয়, আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ায়। আপাতত পাকিস্তানে। পরে সেখান থেকেও খেদাব। ইংরেজ যখন গেছে তখন মুসলমানই বা না যাবে কেন?" মীর সাহেব বিষাদভরা কণ্ঠে বলেন।

"কুযুক্তি! কাপুরুষের কুযুক্তি!" স্বপনদা চাঙ্গা হয়ে বলেন। "লড়তে হবে। হাইকোর্টে লড়তে হবে। আইনসভায় লড়তে হবে। আর মন্ত্রীপরিষদে তো লড়তে হবেই। আমাদের এই সেকুলার স্টেট আপনাকে নিয়েই সেকুলার। আপনি না থাকলে সেকুলার নয়। আমরা একে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেব না।"

"আপনারা কারা ? আপনারা ক'জন ? আপনারা কি জানেন ওয়ার্কিং কমিটির সরষের ভিতরেই ভূত ? জবাহর ও সরোজিনী ভিন্ন আর কে সেকুলার শুনি ? হ্যাঁ, ছিল বটে সুভাষ। ও যদি থাকত আমার প্রাণে ভরসা থাকত। আমার সহপাঠী ও বন্ধু। আপনিও তাই। কিন্তু আপনার কি নেতাজীর মতো প্রভাব ? আজ আমি পদে পদে ওর অভাব অনুভব করছি। তার মানে কিন্তু এ নয় যে আমি ওর পলিসির সমর্থক।" মীর সাহেব বলেন।

স্বপনদা দুঃখিত হন। চুপ করে থাকেন। মানস জবাব দেয়, "আমরা মাত্র জনা দুই ইনটেলেকচুয়াল হলেও আমাদেরকে খাটো করবেন না। আমরাই এ দেশের রুশো ভলতেয়ার। আপনিও আমাদেরই মতো একজন ইনটেলেকচুয়াল। ধরুন, আপনি এদেশের দিদেরো। আপনার মাথায় চিন্তা আছে, হাতে কলম আছে। চিন্তা ব্যক্ত করার স্বাধীনতা আছে। 'যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।' আপনাকে তো আমরা সাহসী মানুষ বলেই জানতুম। আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে এক পা নড়বেন না। এটা আপনারই সরকার। হাই কমাণ্ডের সদস্য মৌলানা আজাদ এঁদের উপরওয়ালা। আর তিনি আপনার অগ্রজ। কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

এমন সময় টুকটুক এসে হাজির। মানসের সঙ্গে আলাপ হয়। টুকটুক বলে, "মহাত্মাকে আপনার কথা জানিয়ে এলুম। তিনি রাজাজীকে বিশেষ করে বলেছেন কলকাতার প্রত্যেকটি মুসলমানকে অভয় দিতে। ডকটর প্রফুল্ল ঘোষকে বলেছেন প্রত্যেকদিন রিপোর্ট দিতে। কলকাতা অশান্ত হলে পূর্ববঙ্গ তো অশান্ত হবেই, সারা ভারত ও পাকিস্তান অশান্ত হবে। তার জীবিত সাক্ষী হবার জন্যে তিনি বেঁচে থাকবেন না। আবার অনশনের হুমকি দিচ্ছেন। আমি সৌম্যদাকে ট্রাঙ্ককল করতে চাই। কোন ঠিকানায় করব ?

"ক্যাপটেন মুস্তাফীকে কল করলে তিনিই ওকে জানাবেন। হ্যাঁ, সৌম্য এসে ওর বাপুকে নিরস্ত করুক। যদি পারে।" স্বপনদার মনে সংশয়।

মীর সাহেব বলেন, "আসল সমস্যাটা মহাত্মাকে বুঝিয়ে বলতে হলে আমাকেই বেলেঘাটা যেতে হয়। কিন্তু বাড়ীতে আর কোনো পুরুষ নেই। মহিলারা ভয় পাবেন। আমার ছেলে তো, জানেন, পাকিস্তানে চলে গেছে। বৌমা যেতে চাননি, কিন্তু নিরাপত্তার জন্যে যেতে বাধ্য হন। যে কথাটা মহাত্মাকে আমি বুঝিয়ে বলতে চাই সেটা এই যে গুণ্ডা কলকাতায় চিরকাল

ছিল। কিন্তু ইদানীং ওরাই বনেছে সমাজের রক্ষক। সমাজপতিদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক যেন মন্ত্রীদের সঙ্গে পুলিশের। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। বেঁধে আনতে বললে পেটায়। পেটাতে বললে খুন করে। গুণ্ডা বলতে আগেকার দিনে বোঝাত নিকৃষ্ট একটা স্তর। এখন ভদ্রলোকের ছেলেরাও গুণ্ডামি করে বেড়ায়। এত রকম এত হাতিয়ার কোনো কালেই কারো হাতে পড়েনি। আজকাল তো বোমা রিভলভারের লেখাজোখা নেই, পাইপ গান যত্রতত্র, স্টেন গানও বিরল নয়।"

একথা শুনে স্বপনদা থর থর করে কাঁপেন। কেন তা কেউ বুঝতে পারে না। মানস ভাবে তাঁর হাত পায়ের কাঁপুনি ফিরে এসেছে।

"আমি কি তা হলে আবার বেলেঘাটায় গিয়ে মহাত্মাকে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করব, লতিফ চাচা?" টুকটুক সুধায়।

"উনি আমাকে চেনেন। আমার কাছ থেকে একটা সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন। তুমি নির্মল বোসকে বলে একটা ইণ্টারভিউয়ের বন্দোবস্ত করো। গাড়ী আছে আমার। শুধু আর্মড গার্ড দরকার। শহীদ থাকলে ওকেই ফোন করতুম। প্রফুল্লকে আমি চিনি, কিন্তু ততখানি অন্তরঙ্গতা নেই। এই এক সমস্যা। আরেক হচ্ছে আমার বাড়ীতে একজন পুলিশ অফিসার না থাকলে চলবে না। ওৎ পেতে রয়েছে বেদখলকারী দল।" মীর সাহেব চোখের ইশারা করেন।

মানস বলে, "স্পেশাল ব্রাঞ্চে আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁকেই ফোন করে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা উনিই করবেন। কেবল ইণ্টারভিউটা বাদে।"

মীর সাহেব বার বার ধন্যবাদ দেন। টুকটুকও।

বাড়ী ফেরার পথে স্বপনদা বলেন, "আমাকে থর থর করে কাঁপতে দেখে তোমার মনে কানো সন্দেহ হয়নি তো?"

"সন্দেহ কী হবে? তোমার হাত পায়ের কাঁপুনি ফিরে এসেছে। আমার তো মনে হয় পারকিনসন্‌স।" মানস চিন্তিত।

"ওটা তোমার ভুল ধারণা। বড়ো বড়ো ডাক্তার সবাই দেখেছেন। শেষপর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে পারকিনসন্‌স নয়। রাতের মাঝখানে বাড়ীতে দাঙ্গাবাজরা চড়াও হলে আর তোমার বৌ বন্দুক ধরে ওদের শাসালে তোমারও হাত পা কাঁপত। হয়তো হার্টই ফেল করত। তোমার বৌদি বন্দুকে সন্তুষ্ট নন। তাঁর স্টেন গান চাই। অমন একটি দশপ্রহরণধারিণী বধূ থাকলে শিবেরও হাত পা

কাঁপত। কালীর হাতের খাঁড়া দেখে শিব তো বেহুঁশ। গুণ্ডারা কবে একদিন আসবে। এদিকে বৌ যে সব দিন হাতিয়ার নিয়ে বসে আছেন। মাছ কোটার বঁটি নয়। সাক্ষাৎ স্টেন গান। সেটা তিনি আমাকেও বিশ্বাস করে দেখাবেন না। সেটা সত্যি সত্যি কেনা হয়েছে কি না জানিনে। তবে সেটার নাম তিনি রামদীনকে শুনিয়েছেন, রামদীন পাড়ার মুসলমানদের শুনিয়েছে, পাড়াটা প্রায় মুসলিমশূন্য। এখন তো আর কলকাতার জন্যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা নেই। র‍্যাডক্লিফ রায় দিয়েছেন যে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের। তা হলে আর স্টেন গান কেন? যদি সত্যি থাকে। কে জানে কবে কমিউনিস্টরা টের পেয়ে লুট করবে।" স্বপনদা ভীত।

মানস প্রথমে এক দফা হাসে। তারপরে বলে, "কংগ্রেস গভর্নমেণ্টও তো একটা গভর্নমেণ্ট। কোনো গভর্নমেণ্টই স্টেন গানের মতো একটা মারণাস্ত্র প্রাইভেট ব্যক্তির হাতে রাখতে দেয় না। সে ব্যক্তি বিদ্রোহী হলে গোটা মন্ত্রীমণ্ডলীকেই একসঙ্গে সাবাড় করতে পারে। গান্ধীজী এসেছেন, বৌদিকে বোলো তাঁর দর্শন পেতে গিয়ে তাঁর পায়ে ওই স্টেনগান প্রণামী দিতে।"

"আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমার সে সাহস নেই। তুমি কি এ কাজটা করতে পারবে?" স্বপনদা সুধান।

"দেখি। যূথিকার সঙ্গে পরামর্শ করি।" মানসও বেড়ালকে ভয় করে।

ট্রাঙ্ককল পেয়ে সৌম্য ছুটে আসে। কলকাতার হালচাল শুনে তার আশঙ্কা হয় যে-কোনো উপলক্ষে আবার দাঙ্গা বাধবে ও বাপু তা চলতে দেবেন না। কলকাতা জ্বললে নোয়াখালীও জ্বলবে, শুধু নোয়াখালী কেন, সারা পূর্ববঙ্গ। অর্থাৎ সারা পূর্ব পাকিস্তান। সারা পূর্ব পাকিস্তান জ্বললে সারা পশ্চিম পাকিস্তানও জ্বলবে। তার প্রতিক্রিয়ায় সারা ভারত।

না, এ দাবানলকে একদিনের জন্যে জ্বলতে দেওয়া যায় না। সৌম্য তার কংগ্রেসী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বোঝায় যে কলকাতায় মুসলমান মরলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুও মরবে। প্রাণের ভয়ে তারা কলকাতায় এসে জড়ো হবে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ভিড় করবে। তখন স্বাধীনতা উপভোগ করা ঘুচে যাবে। শুধু কলকাতায় নয়, সারা ভারতে ও পাকিস্তানে। যে গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যেই দেশভাগ ও প্রদেশভাগ সেই গৃহযুদ্ধই বিরাট আকারে বাধবে। বাপুকে বাঁচানো যাবে না। কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেশও ছত্রভঙ্গ। বিদেশীরা আবার জয় করবে।

মানসের সঙ্গে দেখা হলে সে বলে, "তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে এইজন্যে যে তুমি অনশন থেকে বাপুকে নিরস্ত করবে।"

"তিনি নিরস্ত হবেন তখনি, যখন শুনবেন যে-গুণ্ডারা নিরস্ত্র হয়েছে। তাঁর শেষ অহিংস অস্ত্র অনশন। সে অস্ত্র তিনি কেমন করে ত্যাগ করবেন, যদি গুণ্ডাদের হাতে প্রভূত মারাত্মক অস্ত্র থাকে? পুলিশের কাজ তাদের নিরস্ত্র করা। পুলিশ যদি তার কর্তব্য করে বাপুকে অনশন করতে হবে না। কিন্তু পুলিশের চেয়ে গুণ্ডাদের প্রেস্টিজই এখন বেশী।" সৌম্য তা দেখে ক্ষুব্ধ।

যেসব পাড়া হিন্দুশূন্য হয়েছিল সেসব পাড়া আবার হিন্দুপূর্ণ হয়েছে, যারা বেদখল করেছিল তারা ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের পাড়ায় ফিরে গিয়ে দেখে বেদখলকারী হিন্দুরা তাদের কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। সেসব পাড়া হিন্দুর পাড়া ও সেসব বাড়ী হিন্দুর বাড়ী বনে গেছে। নতুন সরকার জোর খাটাতে চান না। গান্ধীজীর কানে মুসলমানদের অভিযোগ গেলে তিনি প্রতিকারের জন্যে অস্থির বোধ করেন। গণ্ডগোল ধোঁয়াতে থাকে। দু'পক্ষই নাছোড়বান্দা।

গান্ধীজীকে আরেকবার অনশন থেকে নিরস্ত করতে পারা গেল না। একত্রিশে আগস্টের রাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁর মাথা তাক করে লাঠি ছোঁড়ার পর তাঁর মোহভঙ্গ হয়। কোথায় পনেরোই আগস্টের মিরাক্ল? কলকাতা তেমনি অশান্ত। এ আগুন জলবামাত্র না নেবালে ভারত ও পাকিস্তানময় বিস্তৃত হবে। পয়লা সেপ্টেম্বর তাঁর অনশন শুরু হয়। পরের দিন নোয়াখালী যাত্রার তোড়জোড় চলছিল। সুহরাবর্দী সাহেব ভার নিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন কলকাতার সাফল্যের পর নোয়াখালীর সাফল্য। কিন্তু কোথায় কলকাতায় সাফল্য! সেটা একটা মায়া! হিন্দুরা এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। তারা এখন বন্য। ওয়াইল্ড, ব্রুটাল। মুসলমানের জান বাঁচানোর চেয়ে বড়ো সমস্যা হিন্দুর মনুষ্যত্ব বাঁচানো। "Little man, what now?" নাৎসী জমানার পূর্ব লক্ষণ দেখে প্রশ্ন করেছিলেন হান্স ফালাডা। হিন্দুরাও নাৎসী বনে যাচ্ছে দেখে মানস প্রশ্ন করে মনে মনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে।

॥ বাইশ ॥

স্বপনদা সৌম্যকে ডেকে পাঠান। বলেন, "শাসকের রাজদণ্ড শর্বরী পোহালে দেখা দিল মানদণ্ড রূপে। ইংরেজ এখন বণিক। আবার সেই জোব চার্নক। তোমাদের সংগ্রামী ভূমিকা এখন শেষ। সৈনিকরা চিরকাল যা করে থাকে তোমরাও তাই করবে। তরোয়ালকে লাঙলের ফলা বানাবে। উৎসাদন নয়, উৎপাদন। ভাবার্থে সন্তান উৎপাদন।"

সৌম্য শিউরে ওঠে। "দুটিই যথেষ্ট, স্বপনদা।"

"যা বলেছ। ক্যারামেল আর বইতে পারবে কেন? যা দুষ্টু হয়েছে ওর দুই বাচ্চা। আমাকে দেখলেই তাড়া করে আসে। আমার কোলে পচ করবে, হিজি করবে। আমি তো ভয়ে সাত পা পেছিয়ে যাই।" স্বপনদাও শিউরে ওঠেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বপনদা আবার বলেন, "তোমাকে ডেকে পাঠানোর আসল কারণটা এই। তোমরা এখন লড়াই টড়াই ছেড়ে ঘর সংসার করো, ছেলে মানুষ করো। চাকরি বাকরি একটা জুটিয়ে নাও। তুমি একজন ওয়ার ভেটেরান। তোমাদেরই তো সরকার। চাকরি বাকরি তুমি পাবে না তো পাবে কে?"

"রক্ষে করো, স্বপনদা। আমার যেন তেমন দুর্মতি না হয়।" সৌম্য হাত জোড় করে। "এ জীবনে আমার ছুটি নেই, বাপুকে আমি কথা দিয়েছি স্বরাজের পরেও আমি সমানে কাজ করে যাব, যাতে দেশের দীনতম মানুষটিও স্বরাজের সুফল ভোগ করতে পারে। আমাদের স্বরাজ বড়লোকের স্বরাজ নয়, যাতে গরিবদের কোনো অংশ নেই। তাদের হাতে একটা ভোট ধরিয়ে দিয়ে তার পরে সেই ভোট নানা ছলে চেয়ে নেয় যারা আমরা গান্ধীপন্থীরা তাদের থেকে ভিন্ন। আমরা জনগণের সঙ্গে মিলে মিশে অভিন্ন হয়ে যেতে চাই। ওদের সঙ্গে ওদের মতো জীবন যাপন করব। শ্রমের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি সেই মুক্তিই আমাদের আদর্শ। বারো মাস শ্রম। প্রয়োজন হলে সত্যাগ্রহ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সত্যাগ্রহ করতে করতেই সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর কোনো পন্থা নেই, স্বপনদা। পার্লামেণ্টারি পন্থা গোড়ায়

কিছু ফল দেখালেও পরিশেষে নিষ্ফল। আর কমিউনিস্টদের বাঞ্ছিত প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ তো অন্য একপ্রকার 'মাইট ইজ রাইট'। জনগণের সামনে অমন একটা আদর্শ রাখলে তারা মাইটের ভক্ত হবে, রাইটের ভক্ত নয়। আমরা জনগণকে শেখাব রাইট ইজ মাইট। অহিংসভাবে ফাইট করতে করতে তারা তাদের রাইট বুঝে নেবে।"

স্বপনদা আপসোস করেন। "তোমাকে বিয়ে করতে বলা ঝকমারি হয়েছে। ক্যারামেলকেও তুমি চাষানী কি ধোপানী বানাবে। বাচ্চা দুটোর যে কী ভাগ্য তা কল্পনা করতে কষ্ট হয়। মাটির কাছাকাছি থাকতে গিয়ে ওদের জীবন মাটি হবে। না, কমিউনিস্টরাও এত নিচে নামতে রাজী নয়। চকোলেটদের মাছের ভেড়ি আছে। সে কিন্তু একদিনও মেছুনির কাজ করে না। বিপ্লবের পরেও কি করবে? না, তার দরকার হবে না। মাছগুলো আপনা আপনি ভেড়ি থেকে বাজারে আসবে।"

সৌম্য এর পর তার আশ্রমের কথা পাড়ে। "ওটাও একটা কমিটমেণ্ট। আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা—যেমন মধুমালতীর বাবা ক্যাপ্টেন মুস্তাফী—আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন আশ্রমটাকে ওপার থেকে এপারে উঠিয়ে নিয়ে আসতে। তারপর সপরিবারে আশ্রমিক হতে, যদি তেমন ইচ্ছা হয়। কিন্তু আপাতত আমি অত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত নই। ভাবছি আমার সতীর্থ বঙ্কিমকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এপারে চলে আসব। জুলিকে ওপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। নিজের আপত্তি না থাকলেও ওর মায়ের প্রচণ্ড আপত্তি।

"আমাদেরও। রান্থর আর আমার।" এই বলে স্বপনদা তাঁর ঘরের দেয়ালে ঝুলতে থাকা নতুন এক মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বলেন, "ওই ছাখ র‍্যাডক্লিফের দ্বারা চিহ্নিত সীমান্তরেখা। সীমান্তরেখা তো নয়, গ্রেট ওয়াল অভ্ বেঙ্গল। থুড়ি, গ্রেট ওয়াল অভ্ চায়না। এই প্রাচীরের ওপারে যারা বাস করে তারা এপারের লোকের চোখে হিংস্র বর্বর যবন। তেমনি, প্রাচীরের ওপারে যারা বাস করে তাদের চোখে এপারের লোক হিংস্র বর্বর কাফের। ইংরেজরা যাবার সময় নতুন এক পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট জারি করে গেছে পুরনোটার বদলে। কংগ্রেসের মতে ফাইনাল সেটলমেণ্ট। আমার মতে পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট।"

সৌম্যর খেয়াল ছিল না যে ফাইনাল মানে পারমানেণ্ট। সে কংগ্রেস

নেতাদের দোষ ধরে। বলে, "বাপু এর জন্যে দায়ী নন। বল্লভভাই আর জবাহরলাল দায়ী। গ্রেট ওয়াল অভ্ বেঙ্গল? হাঁ, এক অর্থে তাই বটে। কী দুর্ভাগ্য!"

"শোন, তোমাকে একটা মজার গল্প বলি। সত্যি গল্প।" স্বপনদা সহাস্যে শোনান। আমি যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন সেখানকার এক বোর্ডিং হাউস চালাতেন এক হোয়াইট রাশিয়ান ল্যাণ্ডলেডী। বিপ্লবের দশ বছর পরেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে চাকা উল্টে যাবে। তাই তিনি বলতেন, আমাকেও বলেছেন. 'স্টালিন ডায়, আই গো, এগেন প্রিন্সেস।' হা হা হা হা! স্টালিন আজও বেঁচে। প্রাক্তন প্রিন্সেস বেঁচে আছেন কি না জানিনে, কিন্তু রাশিয়ায় ফেরেননি। প্রিন্স ও প্রিন্সেসরা চিরকালের মতো নির্বাসিত বা নিপাতিত।"

সৌম্য পরিহাস করে, "আমরা তাঁদের তাড়িয়েও দিইনি, প্রাণেও মারিনি। তাঁদের ক্ষমতাশূন্য করে নির্বিষ ও নির্বীজ করেছি। আমাদের পদ্ধতি লিকুইডেশন নয়, স্টেরিলাইজেশন। একদিন আমরা শ্রেষ্ঠীদেরও স্টেরিলাইজ করে ট্রাস্টি বানাব।"

"তোমারও রসবোধ আছে দেখছি। তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ নও। আচ্ছা, শোন। আর একটা গল্প বলি। এটাও সত্যি। মানিকগঞ্জের মহারাজা আমাদের প্রতিবেশী। মেজকুমারও ব্যারিস্টার। সেইসূত্রে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ পাই। এই সেদিন ওঁরা আমাদের দু'দলকে তাঁদের বাড়ীর এক সান্ধ্য পার্টিতে ডেকেছিলেন। মহারানী টুটি ফুটি ইংরেজী বলেন। যুদ্ধের মরসুমে পর্দা থেকে বেরিয়েছেন। যুদ্ধ ব্যাপারটা খারাপ হলেও তার প্রয়োজনে পুরনো সংস্কারের বাঁধ ভেঙে যায়। মহারানী বাইরে এসে ত্রাণ কার্যে যোগ দেন। লঙ্গরখানা চালান। মহীয়সী মহিলা। কিন্তু ভীষণ কমিউনাল। মুসলমানদের যেমন ভয় করেন তেমনি ঘৃণা। দাঙ্গার ভয়ে মানিকগঞ্জে ফেরেননি। কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করায় কী উত্তর দিলেন, জানো? হা হা হা! অবিকল সেই রাশিয়ান রাজবংশীয়ার ভাষায়। 'জিন্না ডায়, আই গো, এগেন মহারানী।' আমি চুপ করে ককটেলে চুমুক দিই। কী দরকার তাঁর মনে আঘাত দেবার? স্টালিন বলো, জিন্না বলো, বল্লভভাই বলো, এঁরা অর্জুনের মতো নিমিত্তমাত্র। নিমিত্তমাত্রো ভব, সব্যসাচী। এইসব প্রিন্স আর প্রিন্সেস, মহারাজা আর মহারানী নামেই রয়েছেন। এঁদের জমিদারি যাবেই। প্রাণ যাবে না, যদি সময়ে পা দিয়ে ভোট দেন।" স্বপনদা বলেন।

সৌম্য চিন্তান্বিত ছিল। গান্ধীজী আবার অনশন শুরু করেছেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু রাজাজীও পারেননি তাঁকে নিবৃত্ত করতে। গুণ্ডাদের সঙ্গে, তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে তিনি বলপরীক্ষায় নামবেন। কলকাতাকে গুণ্ডামিমুক্ত করবেন। ইংরেজ সরকারও যা পারেননি তিনি তা পারবেন। আবার সেই করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। সৌম্য স্বপনদাকে বলে, "আমরা এদিকে হাসাহাসি করছি আর ওদিকে বাপুর জীবনসঙ্কট। হিংসার প্রেস্টিজ এখন আইনের প্রেস্টিজকেও ছাড়িয়ে গেছে। উকীল ব্যারিস্টারও এখন গুণ্ডার উকীল ব্যারিস্টার। পুলিশ যাদের হাজতে পোরে এঁরা তাদের বার করে আনেন, আবার রাস্তায় ছেড়ে দেন। প্রফুল্লদা প্রধানমন্ত্রী হয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তাই বাপুর পণ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

"ওহে আনন্দমঠের সন্ন্যাসী, ওই মানচিত্রের দিকে চেয়ে ভাখ মা যাহা হইয়াছেন।" স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "ছিন্নমস্তা দেবী আজ আপনি আপনার রক্ত পান করছেন। করেঙ্গে বললেই করা যায় না, মরেঙ্গে বললেই মরা যায় না। সময় এসেছে, যখন নির্মমভাবে আত্মসমীক্ষা করতে হবে। অনশনের দ্বারা আত্মহনন হতে পারে, আত্মসমীক্ষা হয় না। তোমরা চেয়েছিলে আনন্দমঠের হিন্দুরাজ্য। তাই পেয়েছ। তার সীমানার বাইরে যবন রাজ্য, তাকে জয় করার সাধ্য নেই। সঙ্কট পুনঃ পুনঃ বাধবেই। গান্ধীজীর তো একটিমাত্র প্রাণ। তোমারও তাই। তিনি কি বার বার প্রাণ দিতে পারবেন? তুমিও কি তা পারবে? হাজার চেষ্টা করলেও তোমরা হাজারটা শহীদ খুঁজে পাবে না। সেইখানেই তোমাদের লিমিটেশন। অথচ সহিংস যুদ্ধে হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ মরণপণ সৈনিক পাওয়া যায়। তারা মরেও যেমন মারেও তেমনি। মারব না, শুধু মরব, এই পণ নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু যাদের বেলা স্বতঃস্ফূর্ত তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তোমরা একটা লেজেণ্ড সৃষ্টি করে যেতে পারো। কিন্তু সেটা ব্যর্থতার লেজেণ্ড।"

"ক্ষতি কী, স্বপনদা, ক্ষতি কী? আমরা বাঁচি আর না বাঁচি কতকগুলি প্রাণ তো বাঁচবে। অহিংসা মানে আর কিছু নয়, প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা। অপরের প্রাণের প্রতি। তেমনি, নিজের প্রাণের মায়া না রাখা। মরতেই তো হবে একদিন। তবে দু'দিন আগে নয় কেন? তাতে যদি অপরের প্রাণ বাঁচে।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"তুমি দেখছি পুরোপুরি আদর্শবাদী। তা হলে তুমি রাজনীতিতে এসেছ

কেন? রাজনীতিতে যারা আসে তারা কেউ অসাধ্যসাধন করতে আসে না। কারণ পারে না। গান্ধীজী চেয়েছিলেন একটা অসাধ্য সাধন করতে। ত্রিভুজকে দ্বিভুজ করতে। ত্রিকোণকে দ্বিকোণ করতে। পারবেন কেন? সেটা যে শিবেরও অসাধ্য। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, ইংরেজ ছিল না। কিন্তু সেটা হলো দু'শো বছর আগেকার রিয়ালিটি। ইংরেজ আসার পর দেখা গেল হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ এই তিনটি ভুজ নিয়ে একটি ত্রিভুজ বা তিনটি কোণ নিয়ে একটি ত্রিকোণ। ইংরেজ আর হিন্দু একজোট হলে মুসলমানের চেয়ে বড়ো। ইংরেজ আর মুসলমান একজোট হলে হিন্দুর চেয়ে বড়ো। হিন্দু আর মুসলমান একজোট হলে ইংরেজের চেয়ে বড়ো। হিন্দু আর মুসলমান একজোট হলে প্রথম মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ রাজকে সিংহাসনচ্যুত করা অসম্ভব ছিল না। তার জন্যে গান্ধীজীর ও তাঁর রণপদ্ধতির আবশ্যক হতো না। কিন্তু যেটা না হলে চলত না সেটা দুই সহযোদ্ধার মধ্যে একটা অগ্রিম বন্দোবস্ত। নয়তো ব্রিটিশ অপসরণের দিন রাজসিংহাসনের দুই দাবীদারের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। মুসলমানের আশঙ্কা হিন্দুর হাতে সে হেরে যেত। তাই যদি হবে তো হিন্দুর স্বার্থে ইংরেজকে হারিয়ে দেওয়া কেন? ইংরেজের হাতে হেরে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কেন? অগ্রিম বন্দোবস্তে হিন্দু নারাজ, সুতরাং হিন্দুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তে মুসলমানও নারাজ। সে লড়বে এককভাবে, যখন দেখবে ইংরেজ চলে যাচ্ছে ও যাবার সময় হিন্দুকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানকেও সংযুক্ত রাষ্ট্রে সমান অংশীদার করতে হবে, নয়তো তাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিক করতে হবে। দুটোর একটা না করা হলে সে পাকিস্তানের জন্যে লড়বে। হিন্দুকে তো মারবেই, ইংরেজকেও ছাড়বে না। আস্ত একটা সম্প্রদায় ক্ষেপে গেলে না করতে পারে হেন দুষ্কর্ম নেই। একই রকম দুষ্কর্ম দিয়ে তাকে হারিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তা যদি হয় তবে তার সঙ্গে কোনোদিনই মিটমাট হবে না। মিটমাট যদি অভীষ্ট হয়ে থাকে তো কালবিলম্ব না করে ইংরেজ থাকতে ইংরেজের মধ্যস্থতায় পার্টিশনের ভিত্তিতে মিটমাট করাই শ্রেয়। এর নাম রিয়ালপলিটিক। বাস্তববাদী হলে তুমিও মানবে যে এটাই আপদ্ধর্ম।" স্বপনদা মনে করেন।

"গান্ধীকে বাদ দিয়ে মিটমাট যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়। বাপুর বুক ভেঙে গেছে, স্বপনদা। কোথায় গান্ধী-

আরউইন চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি, গান্ধীই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি! আর কোথায় এই শিবহীন যজ্ঞ!" সৌম্য বিলাপ করে।

"ভাই সৌম্য", স্বপনদা তার হাতে সস্নেহে চাপ দেন, "তোমার বেদনা আমারও বেদনা। তুমি এই নাটকের অন্যতম অভিনেতা আর আমি এর অন্যতম দর্শক। যেটা কমেডীতে সমাপ্ত হবার কথা সেটা সমাপ্তির পূর্বে ট্র্যাজেডীর দিকে মোড় নিয়েছে। ইংরেজ ছিল বলেই ঐক্য ছিল। ইংরেজ নেই বলেই ঐক্য নেই। আমরা স্বাধীন হতে গিয়ে বিভক্ত হয়েছি। কলকাতার মুসলমানরা এখন ত্রিশঙ্কুর মতো ভারতের আসমানে ঝুলছে। থেকে যেতেও পারে, চলে যেতেও পারে। তার থেকে অনুমান করতে পারি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরও ত্রিশঙ্কু দশা। নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা আছে এর? চুম্বক আর লৌহশলাকা। ট্র্যাজেডীর আকর্ষণ দুর্বার। জার্মানদের দিকে চেয়ে দ্যাখ। আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এবার ক্যাথলিকে প্রটেস্টাণ্টে নয়, কমিউনিস্টে ক্যাপিটালিস্টে। তিনশো বছরেও ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটেনি। কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিস্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটতে দুই শতাব্দী তো লাগবেই। দর্শক আমি। হাহাকার ছাড়া আর কী করতে পারি! নিজের দেশের লোকের একই নিয়তি দেখে হায় হায় করছি।"

সৌম্য সুধায়, "কেন? এ ছাড়া কি আর কিছু হতে পারত না?"

"সেইখানেই তোমাদের মোহ। ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট একই বংশের সন্তান। তাদের ত্রাণকর্তাও এক। ধর্মগ্রন্থও এক। কিন্তু চার্চ এক নয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রস্থল দেশের বাইরে। তার অনুশাসন মানতে প্রত্যেকটি ক্যাথলিক বাধ্য। তার যিনি মহাগুরু তিনি ত্রাণকর্তার পার্থিব প্রতিভূ। তিনি শুধু ধর্মীয় অনুশাসন নয়, রাজনৈতিক অনুশাসনও জারি করেন। রাষ্ট্রের আদেশ বনাম চার্চের অনুশাসন এর কোন্‌টা অগ্রমান্য? একজন জার্মান যদি পোপকে উচ্চতর স্থান দেয় তবে সে রাজার সন্দেহের পাত্র হয়। তেমনি, একজন জার্মান যদি রাজাকে উচ্চতর স্থান দেয় তবে সে পোপের অপ্রীতিভাজন হয়। আনুগত্যের সঙ্গে আনুগত্যের বিরোধ বাধবেই। গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। ত্রিশবছর ধরে জার্মানরা জার্মানদের সঙ্গে লড়ে। মোট জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ মরে। অন্যেরা পালিয়ে বাঁচে। অমনি করে জার্মানীর দুই অংশের মধ্যে একটা লোকবিনিময় ঘটে যায়। একই ব্যাপার চলেছে কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট শাসিত অঞ্চলের মধ্যে। মস্কোই হয়েছে রোম।

স্টালিনই হয়েছেন পোপ। আমাদের আশঙ্কা হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা ক্রমশ প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের বা ক্যাপিটালিস্ট কমিউনিস্টের সম্পর্কের অনুরূপ হতে যাচ্ছে। মুসলমান যেখানেই থাকুক তার কাছে ইসলামিক ব্রাদারহুডই অগ্রগণ্য। মক্কা থেকে যে অনুশাসন আসবে সেই অনুশাসনই তার কাছে শ্রেয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামের দ্বন্দ্ব বাধবে না, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে সেকুলার রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ বাধতে পারে। যেসব মুসলমান ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে থাকা পছন্দ করবে তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারা শক্ত। তেমনি, যেসব হিন্দু পাকিস্তানে থাকা পছন্দ করবে তাদের আনুগত্যও সন্দেহের অতীত নয়। তা হলে কি লোক অপসরণই এই সমস্যার সমাধান? মাস মাইসেশন?" স্বপনদা সুধান।

"জনগণ অবিভাজ্য।" সৌম্য দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। তবে ব্যতিক্রম কারো কারো বেলা হবে। একদিন না একদিন দেশ আবার জুড়ে যাবে, প্রদেশ আবার জুড়ে যাবে। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে জবাহরলাল ও বল্লভভাই জাতির জনককে তাঁর বিজয়ার দিন বিসর্জন দিলেন।"

"তা যদি বলো, যাঁর দৌলতে জার্মানরা হলো এক জাতি, সেই জাতির জনক বিসমার্ককেও জাহাজ থেকে পাইলটের মতো নামিয়ে দিলেন তাঁরই হাতে গড়া কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। এর নাম ড্রপিং দ্য পাইলট। সেই বিখ্যাত কার্টুনটা দেখেছ নিশ্চয়।" স্বপনদা স্মরণ করেন।

"অ্যান ইনগ্লোরিয়াস এণ্ডিং অভ্ আ গ্লোরিয়াস স্ট্রাগল!" গান্ধীজীর উক্তির পুনরুক্তি করে সৌম্য। তার চোখে জল।

স্বপনদা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। "স্ট্রাগল বলতে যদি বোঝায় ওয়ার অভ্ লিবারেশন তবে তার এণ্ডিং গ্লোরিয়াসই হয়েছে, সৌম্য। এ নিয়ে একদিন এপিক উপন্যাস লেখা হবে। আর যদি বোঝায় ওয়ার অভ্ সাকসেসন তবে এর মধ্যে বীরত্বের কতটুকুই বা দেখা গেল? দাঙ্গার পর দাঙ্গা, নরহত্যার পর নরহত্যা, নারীহরণের পর নারীহরণ, অগ্নিকাণ্ডের পর অগ্নিকাণ্ড, ধর্মান্তরীকরণের পর—না, ধর্মান্তরীকরণ নয়। তবে দুই পক্ষেরই ব্রুটালাইজেশন। জয় কোনো পক্ষেরই হতো না, সিংহাসন ভাগ করতেই হতো। সিংহের ভাগটা কংগ্রেসই পেতো, কংগ্রেসই পেয়েছে। বাঘের ভাগটা লীগই পেতো, লীগই পেয়েছে। এটা একপ্রকার ডিভিজন অভ্ স্পয়েলস্। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মতো

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদও একটা এলিমেন্টাল ফোর্স। ফেডারেশন, সাব-ফেডারেশন কোনোটাই তাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারত না। প্যারাডক্স এই যে বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ আছে, বাঙালী মুসলমানদেরও ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু বাঙালী জাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"

চায়ের ট্রে হাতে দীপিকাদির প্রবেশ। তিনি বিষণ্ন স্বরে বলেন, "এইমাত্র রেডিওতে শুনলুম সেই শচীন ছেলেটি বাঁচল না। ওর বৌ অংশুরানী আমার আত্মীয়া। আমার একবার যাওয়া উচিত। কী বলো?"

সৌম্যর দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। সে দুই হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করে। তিনজনেই উঠে দাঁড়ান দু'মিনিট নীরবতা পালন করতে। দীপিকাদির চোখে জল। স্বপনদার চোখ ছলছল।

"কী দরকার ছিল ওর শান্তিমিছিল নিয়ে জাকারিয়া স্ট্রীটে নাখোদা মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার? এ যেন মরণকে বরণ করতে যাওয়া। ওর মুসলমান বন্ধুরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জীবনের আশা ছিল। অকস্মাৎ—" দীপিকাদির কণ্ঠরোধ।

সৌম্য আত্মসংবরণ করে বলে, "আমিও ওকে ভালো দেখে এসেছি কাল সন্ধ্যায়। তবে আঁচ করতে পেরেছি যে ট্র্যাজেডী আসন্ন। এতগুলো আঘাত। শচীন শহীদ হতেই চেয়েছিল। অহিংসাবাদী আর কী ভাবে তার বীরত্ব প্রমাণ করতে পারে? আপসোস এই যে মানুষ শচীনকে ওর আততায়ীরা চিনল না। চিনল কেবল হিন্দু শচীনকে। কাফের শচীনকে। এরাও তো মানুষকে চিনছে না, চিনছে বিধর্মীকে, ম্লেচ্ছকে। মানুষ হিসাবে কত মহৎ ছিল শচীন!"

"তোমার বন্ধু ছিল?" স্বপনদা সুধান।

"আমার গুরুভাই। নিবেদিতপ্রাণ। নির্ভীক। ওর প্রিয় গান ছিল 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।' মাস কয়েক আগে ত্রিপুরা জেলার হৈম চরে বিপন্ন হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে সে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এবার ঝাঁপ দিল বিপন্ন মুসলমানদের বাঁচাতে। বিপন্নকে বাঁচানোই তো ধর্ম। বীরধর্ম। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ! শচীন্দ্রনাথ মিত্রের মতো বীররাই ধরিত্রীর লবণ। ওর সহধর্মিণী অংশুরানীকে আমি এছাড়া আর কী বলে সান্ত্বনা দেব? চলি ওদের ওখানে।" সৌম্য আসন ছেড়ে ওঠে।

"দাঁড়াও, ভাই। আমি কাপড় ছেড়ে আসি।" দীপিকাদিও সঙ্গে যাবেন।

"আমার সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমিও যেতুম। আমার সমবেদনা জানিয়ো। তুমি কিন্তু শচীনের মতো আগুনে ঝাঁপ দিতে যেয়ে না। তোমাকে বাঁচতে হবে, দুটি দুধের বাচ্চাকে বাঁচাতে হবে। এ জগতে এনেছ যখন তাদের দাবীই আগে। দেশের দাবী পরে। স্বাধীনতা অর্জনের পরে তোমার কড়ারই বা কিসের?" স্বপনদা বোঝান।

দীপিকাদি যাবার সময় বলেন, "যাব আর আসব। তুমি ততক্ষণ তোমার এই পরিপাটি খাঁচাটিতে বন্ধ থেকো। চল, সৌম্য। বেচারি অংশু!"

স্বপনদা ওদের এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, "যেমন রাজা ক্যানিউট তেমনি তাঁর পুত্র। সমুদ্রকে হুকুম দেবেন, হট যাও। সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, "আমার পরেই প্লাবন'। আমরা দেখছি ইংরেজের পরেই প্লাবন।"

দীপিকাদির সেদিন ফিরতে বেশী দেরি হয়। কথা বলতে গিয়ে বার বার কণ্ঠরোধ হয়। অতি কষ্টে বলেন, "স্মৃতীশ বলে একটি ছেলে ছিল, সেও বাঁচল না। আর ক'জনকে শহীদ হতে হবে! সৌম্যকে বোঝাতে গিয়েই আমার এত দেরি হলো। যাতে সেও শহীদ না হয়।"

"ভালোই করেছ। আমি জানতুম তুমি অকারণে দেরি করবে না। আমার কথা না ভেবে হোক, এলফের কথা ভেবে। কিন্তু ওই স্মৃতীশ ছেলেটি কে? ঘটনাটার বৃত্তান্ত কী?" স্বপনদা জানতে চান।

"স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার বন্ধু সুশীল দাশগুপ্ত মোটরে করে কোথায় যেন যাচ্ছিল। পথে দেখতে পায় একদল স্কুলের ছাত্রছাত্রী শান্তিমিছিল নিয়ে বেরিয়েছে। তারা একটু এগিয়ে গিয়ে মোটর থেকে নামে ও মিছিলের উপর নজর রাখে। মিছিল লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছে দেখে থামায়। পার্ক সার্কাসের মুসলমান জনতার মুখ দেখে মনে হয় ওরা জোর করে বাধা দেবে। স্মৃতীশ মিছিলকে নিরাপদ রাস্তায় যেতে ইঙ্গিত করে। ছাত্রছাত্রীরা পালায়। জনতা তাড়া করে। স্মৃতীশ ও সুশীল ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে গিয়ে চোট পায়। ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্মৃতীশ বাঁচে না। সুশীল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।" দীপিকাদি বিবরণ দেন। যেমন শুনেছেন।

স্বপনদা উঠে দাঁড়িয়ে ছু'মিনিট নীরবতা পালন করেন। প্রার্থনায় তাঁর বিশ্বাস নেই। দীপিকা একাই প্রার্থনা করেন।

"নিয়তি!" স্বপনদা বলেন, "নিয়তি কেন বাধ্যতে। স্বতীশ মোটরে করে যাচ্ছিল। গেলেই পারত। নামতে গেল কেন?"

"ওই নিরীহ ছেলেমেয়েগুলিকে বাঁচাতে। আমি হলেও তাই করতুম। ওটা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য।" দীপিকাদি বিষণ্ণ স্বরে বলেন।

"এতে কী ফল হবে? দাঙ্গা কি বন্ধ হবে? সৌম্যকে যেমন করে পারো আটকাও।" স্বপনদা বিধান দেন।

"সৌম্যর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। গান্ধীজীকে বাঁচাতে হবে। তা নইলে কেউ বাঁচবে না। এখানকার মুসলমান, ওখানকার হিন্দু। আর গান্ধীজীকে বাঁচাতে হলে গুণ্ডাদের ও তার সমর্থকদের নিরস্ত্র করতে হবে। তারা যদি স্বেচ্ছায় গান্ধীজীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে সরকার তাদের বেআইনী অস্ত্র রাখার জন্যে আদালতে সোপর্দ করবে না। আমি ভাবছি এই আমার সুযোগ। স্টেন গান রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওটা গান্ধীজীর পায়ে সমর্পণ করলে ওঁকে বাঁচানোর পুণ্যও হবে। আইনের হাত থেকে নিজেও বাঁচব।" দীপিকা ফাঁস করেন।

"ব্যাড ইনভেস্টমেণ্ট। বিক্রীও করতে পারবে না, ব্যবহারও করতে পারবে না। লাইসেন্স চাইতে গেলে সরকার কেড়ে নেবে। খেসারৎ যদি দেয় তো নামমাত্র খেসারৎ। তার চেয়ে সমর্পণ করাই ভালো। তবে নাম প্রকাশ করতে দিয়ো না। গান্ধীজী আবার গোপনতা পছন্দ করেন না।" স্বপনদা হুঁশিয়ার করে দেন।

"সৌম্যর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে আরো অনেকে যখন অস্ত্র সমর্পণ করবে তখন আমার স্টেন গানও সেই স্তূপের মধ্যে থাকবে। কোন্‌টা কার তার লেবেল থাকবে না। সরকারও কাউকে নাম প্রকাশ করতে বলবে না। অস্ত্রটা একটা সৎকাজে লাগবে। মহাত্মার প্রাণরক্ষা। তুমি অনুমোদন করো তো?" দীপিকাদি সুধান।

"আমার অনুমোদন চাইলে কি আমি ওই অস্ত্র বাড়ীতে রাখতে দিতুম? কমিউনিস্টরা ওটা প্রথম সুযোগেই হাত করত।" স্বপনদা সন্দেহ করেন।

সে রাতে দীপিকাদি নিজেও ঘুমোননি, স্বপনদাকেও ঘুমোতে দেননি। তাঁকে আকুল করেছিল এই চিন্তা যে রোজ রোজ শচীন ও স্বতীশের মতো

আদর্শবাদী যুবকরা শান্তির জন্যে আত্মদান করবে আর তাদের মায়েরা আর স্ত্রীরা কান্নায় ভেঙে পড়বে। কেন? কেন? কেন? হিন্দু মুসলমানের শরিকী মামলার তো নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তার জের টেনে কার কী লাভ?

"তা নয়।" স্বপনদা বলেন, "হিন্দুদের মতলবটা এখন কলকাতাকে মুসলিম-শূন্য করা ও মুসলমানদের সম্পত্তি গ্রাস করা। ওপারের মুসলমানদেরও সেই একই মতলব। পূর্ববঙ্গকে হিন্দুশূন্য করা ও হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করা। এপারে গান্ধীর কথায় কেউ কান দিচ্ছে না, ওপারে জিন্নার কথায়ও কেউ কান দিচ্ছে না। পাঞ্জাব জুড়ে চলেছে গায়ের জোরে লোকবিনিময়। খবর যা পাচ্ছি তাতে মনে হয় তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ লাখ হিন্দু মুসলিম শিখ পরস্পরের হাতে মরেছে আর ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে প্রায় এক কোটি, দুই বিপরীত অভিমুখে। গান্ধীজী যদি অনশনে মারা যান দুই বাংলায় কী কাণ্ডটা হবে তুমি অনুমান করতে পারো, রানু।"

"না, গান্ধীজীকে মরতে দেওয়া হবে না। সৌম্য আমাকে বুঝিয়েছে ওঁকে নিরস্ত করার একমাত্র উপায় গুণ্ডাদের ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নিরস্ত্র করা। ও জানত না যে আমার কাছে মোক্ষম অস্ত্র রয়েছে। স্টেন গান। কিন্তু দেখলুম ওকে না জানালে চলবে না। ওর সহযোগিতায়ই আমি অস্ত্র সমর্পণ করব। ওকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়। অস্ত্র সমর্পণ করেছি বলে আমি নাম যশ চাইনে। গান্ধীজীকে বাঁচাতে, শচীন স্মৃতীশদের মতো ছেলেদের বাঁচাতে আমি এই ত্যাগ স্বীকার করতে চাই। তুমি যথাকালে জানবে। কাল সকালেই আমি বেরিয়ে পড়ব। এলফকে দেখো। নিজেকেও।" দীপিকাদি বলেন।

"ওটা গঙ্গায় বিসর্জন দিলে হয় না? কাজ কী কাউকে জানিয়ে? সেও তো আর কাউকে জানাবে।" স্বপনদা বলেন।

"না, না, গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলে মরাল এফেক্ট হবে না। গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখুন যে একজন অজানা কেউ স্টেন গান সমর্পণ করেছে। পাবলিকের মধ্যেও এর সুফল ফলবে। শান্তি আসবে।" দীপিকাদি দৃঢ়মতি।

পরের দিন হিন্দু মুসলমানের মিশ্র মিছিল কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। কেউ বাধা দেয় না। ছোরা ছুরি চালায় না। শচীন ও স্মৃতীশের প্রাণদানই পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হাজার জন পুলিশম্যান যা করতে পারত না দু'জন শহীদের আত্মদান তা সম্ভব করে। অবশ্য গান্ধীজীর

অনশনও। লোকের মনে শঙ্কা জাগে মহাত্মাও হয়তো ওই যুবকদের মতো আত্মদান করবেন। তাঁকে বাঁচাতে হলে গুণ্ডাদের নিরস্ত্র করা চাই।

বেলেঘাটার সেই গুণ্ডারা তাঁর কাছে গিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে ও অনুশোচনায় কাঁদে। বলে, "আপনি আমাদের যে শাস্তি দিতে চান সেই শাস্তি দিন।" তিনি বলেন, "আমি তোমাদের এই শাস্তি দিচ্ছি যে তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ীর দখল ফিরিয়ে দেবে ও এখন থেকে তাদের প্রাণরক্ষার ভার নেবে।" তারা রাজী হয়ে যায়। মুসলমানরা ঘরে ফেরে।

এর চেয়েও বড়ো মিরাক্‌ল ঘটে যখন এক ট্রাক-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজীর সামনে হাজির হয়। তাতে ছিল হ্যাণ্ড গ্রেনেড, স্টেন গান, পিস্তল, ছোরা ছুরি প্রভৃতি হরেক রকম হাতিয়ার। সবাই অবাক! অবাক হন না শুধু দীপিকাদি, সৌম্য ও তার বন্ধু পুলিশ অফিসার তপন জোয়ারদার।

দীপিকাদি অনশনভঙ্গ নিরীক্ষণ করে বাড়ী ফিরলে স্বপনদা বলেন, "তা হলে সব ভালো যার শেষ ভালো। রেডিওতে শুনেছি।"

"হ্যা, কলকাতা বেঁচে গেল। তার প্রতিক্রিয়ায় পূব বাংলাও। সৌম্যকে আমি আটক করেছি। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণার মুখে ভাত দিতে হবে। বুদ্ধের অন্নপ্রাশনের পর শিশুর অন্নপ্রাশন।" দীপিকাদি মিষ্টি হাসেন।

চমৎকার একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে এমন সময় জুলিদের বাড়ীর পুরনো বাবুর্চি আবু তালিব মুশকিল বাধায়। বলে, "পাকিস্তান আমার আপনার দেশ। হিন্দুস্থান আমার পরদেশ। এখান থেকে একদিন আমাকে তাড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে আগে থেকেই চলে যাওয়া ভালো। কিন্তু যাব কোন্ পথে? শুনছি দিল্লী হয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। মুসলমান দেখলেই শিখেরা কেটে ফেলছে। হিন্দুরাও দুশমনি করছে। একদল মুসলমান বোম্বাই থেকে জাহাজে করে করাচী যাচ্ছে, সেখান থেকে পাঞ্জাবে যে যার জায়গায় যাবে। আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী। এই তো মওকা। আবার গান্ধী বাবা কবে আসবেন, কলকাতাকে ঠাণ্ডা করবেন! কলকাতা কি বেশীদিন ঠাণ্ডা থাকবে? আমাকে মেহেরবানি করে ছেড়ে দিতে মর্জি হয়, মেমসাহেব। শুধু রাহাখরচাটা দিলেই চলবে।"

এই বাবুর্চিকেই এক বছর আগে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে জবাব দেওয়া হয়েছিল। তার হাতে দেওয়া হয়েছিল রাহা খরচ আর তিনমাসের তলব। পেনসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে একদিন ফিরে আসে।

দেশে তার মন লাগে না। জুলি তাকে লুকিয়ে রাখে। বাইরে বেরতে দেয় না। বাজার করাটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। ওরই নিরাপত্তার খাতিরে। তাতে ওর উপরি রোজগার বন্ধ হয়। সেকথা ও মুখ ফুটে জানাতে পারে না। জুলির মাথায় ঢোকে না। কিন্তু তার মা সব বোঝেন। কী করবেন ? প্রাণরক্ষা ও বাজার করা দুই একসঙ্গে চলে না। তিনি ওর মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেন।

আবু তালিবকে আগের মতো টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। তা হলে বাবুর্চিখানার দায়দায়িত্ব নেবে কে ? দীপিকাদি বলেন, "তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি। আমাদের পুরনো বাবুর্চি জামাল এসে সাধাসাধি করছে তাকে ফিরিয়ে নিতে। তোমার দাদা তো মুসলমান বলতেই অজ্ঞান। বিশেষত সেই মুসলমান যে ফরাসী রান্না শিখেছে। তোমার দাদারই কাছে থাকতে তিনি ওকে চন্দনগরে পাঠিয়ে কয়েকটা পদ শিখিয়ে এনেছিলেন। আমার কিন্তু জামালকে ফিরিয়ে নিতে সাহস হচ্ছে না। তোমার যদি সাহস থাকে তুমিই ওকে আপাতত ছ'মাসের জন্যে ধার নাও। পরে আমরা ওকে ফিরিয়ে নিতে পারি, মুসলমান সম্প্রদায়ের মন ও মেজাজ বুঝে। হিন্দু সম্প্রদায়েরও মন ও মেজাজ বুঝতে হবে। হিন্দুরাই হয়তো একদিন ওকে খতম করবে, ওর নিজের দোষে নয়, ঢাকার বা চাটগার বদলা নিতে। গান্ধীজী পাঞ্জাব না গিয়ে পূর্ববঙ্গে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু পাঞ্জাব যাবার জন্যে দিল্লী থেকে জরুরি ডাক এসেছিল। নেহরু, পাটেল, মাউণ্টব্যাটেন হৈ হৈ করে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ করে এখন হালে পানি পাচ্ছেন না। ডাক গান্ধীকে। যিনি পই পই করে বারণ করেছিলেন। গান্ধী না হলে এ আগুন নেবাবে কে ? যেমন বাংলাদেশে তেমনি পাঞ্জাবে।" দীপিকাদি অন্নপ্রাশনের সব ঠিক করেন।

জামাল এসে রান্না করার ভার নেয়। বাজার করারও। ওকে লুকিয়ে রাখতে হয় না। ইতিমধ্যে ও দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দেখতে হিন্দুর মতো হয়েছে। কিন্তু পায়জামার বদলে ধরেছে প্যাণ্ট। হিন্দু সাজাও বিপজ্জনক। সাহেবের মার নেই।

॥ তেইশ ॥

অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে মীর সাহেবের সঙ্গে দেখা। "কেমন আছেন, মীর সাহেব?" মানস সুধায়।

"জান আছে। মান গেছে।" মীর সাহেব আক্ষেপ করেন। "আমি বাংলাদেশের সন্তান। বাংলাভাষার লেখক। দেশবন্ধুর আমলের জাতীয়তাবাদী মুসলমান। আমাকে বলে কিনা, আপনি এদেশে আছেন কেন? আপনি কি পাকিস্তানের পঞ্চমবাহিনী? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ী খালি করে দিন। নয়তো আপনাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে। টেলিফোন করতে গিয়ে দেখি লাইন কাটা। মোটরে উঠতে গিয়ে দেখি টায়ার ফুটো। ঘরে বসে ভাবছি কী করা যায় এমন সময় মা টুকটুক এসে হাজির। ওরা তর্ক করে। বলে, এটা হিন্দুস্থান। এখানে মুসলমানদের থাকা চলবে না। টুকটুক বলে, এটা ইণ্ডিয়া। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান সকলেরই থাকার অধিকার। কাউকে বহিষ্কার করতে হলে সরকার করবেন আইন অনুসারে। আপনারা কি সরকারের পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন? ওরা শাসায়। সাপকে মারতে লাঠি লাগে। আইন লাগে না। টুকটুক তখন তার দলবল ডেকে নিয়ে আসে। পালা করে পাহারা দেয়। পুলিশ এসে পড়ে।"

"আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন?" মানস বলে, 'আপনি একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। আপনার উপর এমন উৎপাত!"

"যারা গান্ধীজীর মাথা তাক করে লাঠি ছুঁড়তে পারে, ইট ছুঁড়তে পারে তাদেরই তো রাজত্ব। রুল অভ্ ল বলে কিছু আছে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গেছে, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ এসেছে। মহাত্মারও সাধ্য নেই যে এইসব হামলাকারীদের আইন দিয়ে রুখবেন। তিনি অনশন দিয়ে হৃদয় জয় করেছেন কতক লোকের কতক সময়ের জন্যে। কিন্তু গুণ্ডারা এখন সমাজে জলচল হয়েছে। পার্টিতে আমল পেয়েছে। কংগ্রেস কি আর সেই কংগ্রেস আছে? পুলিশেও গুণ্ডাদের লোক ঢুকেছে। কলকাতার চেয়ে দিল্লী তো আরো ভয়ানক। সরকার সামলাতে পারছেন না, গান্ধীজীকে ডেকে নিয়ে গেছেন।

তাঁর মন্ত্র করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। মরেঙ্গের আশঙ্কাই বেশী।" মীর সাহেব শিউরে ওঠেন।

"না, না, তা কখনো হতে পারে না। মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো দিল্লীও কলকাতার মতো শান্ত হবে।" মানস অভয় দেয়।

"হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা লাখে লাখে জুটেছে। মুসলমানদের তারা তিষ্ঠতে দেবে না। তাদের বাড়ী বেদখল করবে, মসজিদ বেদখল করবে, কবরস্থান বেদখল করবে। এর নাম নাকি লোকবিনিময়। জিন্না যখন লোকবিনিময়ের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন তখন সকলেই একবাক্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু এখন প্রতিবাদকারীদের মুখেও সেই বাক্য শোনা যাচ্ছে। দুই নেশনতত্ত্ব ছিল সকলের নিন্দনীয়। এখন বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জাবে। যাঁরা এটা সমর্থন করছেন তাঁরা কি ভবিষ্যতে কী আসছে তা দেখতে পাচ্ছেন না? একদিন হিন্দু ও শিখ হবে দুই নেশন। দেখবেন কী করে? হিন্দু সাম্রাজ্যবাদই তাঁদের চোখে চিরন্তন সত্য। তাঁরা আপাতত মুসলমানদের এদেশ থেকে খেদাবেন। পরে আরো বলবান হলে পাকিস্তান জয় করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করবেন। তখন মুসলমানরা হবে হিন্দুদের কৃপার পাত্র। যদি না বিতাড়িত হয়। ফিরবে তো সেই আরবে, ইরানে, মধ্য এশিয়ায়।" মীর সাহেব আবেগের সঙ্গে বলেন।

মীর সাহেব যে মর্মাহত হয়েছেন তা উপলব্ধি করেন স্বপনদা। বলেন, "ওটা অশুভ চিন্তা, মীর সাহেব। কংগ্রেসের এত বল নেই যে সাম্রাজ্য বিস্তার করবে। পাকিস্তানকে গ্রাস করার জন্যে ভারত যদি যুদ্ধে নামে করাচীর দিক থেকে ছুটে আসবে আমেরিকা আর খাইবারের দিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়া। পাকিস্তান তো ভাগ হয়ে যাবেই, ভারতও ভাগ হয়ে যেতে পারে আবার। হিন্দু সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ওটা একটা বস্তাপচা মামুলী মতবাদ। বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মুসলমানরা যার যেখানে খুশি সেখানে বাস করবে। হিন্দুরাও যার যেখানে খুশি সেখানে। রাষ্ট্র ভাগ হয়েছে বলে অধিবাসীদেরও ভাগ করতে হবে এটা বিংশ শতাব্দীতে অচল। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ। যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। পাকিস্তান চিরকাল মধ্যযুগে পড়ে থাকবে না।"

মানস বলে স্বপনদাকে, 'তোমার ওকথা পূর্ব পাকিস্তানের বেলা খাটতে

পারে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান হচ্ছে আর একটা আফগানিস্থান। ওর ভৌগোলিক অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে আর ঐতিহাসিক অবস্থান মধ্যযুগে। আফগানিস্থানও এককালে অন্য নামে ভারতের সামিল মিল। সেটা মিল হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেশ। ইসলাম গ্রহণ করার পরও ভারতের সামিল থেকে যায়। কিন্তু দু'শো বছর আগে নাদির শাহ্ তাকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তখন থেকেই সে বিচ্ছিন্ন। একই কাজ করলেন পাকিস্তানের বেলা মহম্মদ আলী জিন্না। দু'শো বছর পরে যারা জন্মাবে তাদের চোখেও পাকিস্তান আফগানিস্থানের মতো মুসলমানদের দেশ, যেখানে একদা হিন্দু ও শিখ বাস করত। তফাতের মধ্যে এই যে ভাষাগত কিছু মিল আছে।"

"ভাষাগত মিল আফগানিস্থানের সঙ্গেও আছে, মল্লিক সাহেব। পশ্‌তু কি একটি আর্যভাষা নয়? তা সত্ত্বেও আফগানরা ভারতীয় মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। দু'শো বছর আলাদা থাকার ফল। পাকিস্তানী মুসলমানদের সঙ্গেও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের বিয়ে সাদী বন্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন হলে ইসলামও তাকে জোড়া দিতে পারে না। তুর্ক ও আরবদের দিকে তাকান। ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানী মুসলমানদের সামাজিক বিচ্ছেদ অনিবার্য। ইংরেজরাও যেটা করতে পারেনি লীগ সেটা করল।" মীর সাহেব খেদোক্তি করেন।

"আপনি কি মনে করেন পাশপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তিত হবে? যেমন হয়েছে আফগানিস্থানের সঙ্গে।" মানস সুধায়।

"অবশ্যম্ভাবী। কোনো রাষ্ট্রই লোক চলাচল অব্যাহত রাখে না। সীমান্ত খোলা রাখলে মাল পাচার হবে।" মীর সাহেব বলেন।

"বাংলাদেশ যে দুই দেশ হবে এটা আমি ভাবতেই পারিনি, মীর সাহেব। এত মিল আমাদের মধ্যে। অমিল কতটুকু?" মানস বলে।

"কেউ ভাবতে পারেনি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আর নোয়াখালীর হাঙ্গামার থেকে এর সূচনা। মুসলিম লীগের ভুল চাল থেকেই এই বিচ্ছেদ। এখন আর পেছনে ফেরা চলবে না। সেবার কাটা বাংলা জোড়া লেগেছিল। এবার আর জুড়ে যাবে না। এখন শুধু দেখতে হবে লোকবিনিময় যাতে না হয়। তা যদি হয় তবে হিন্দুশূন্য পূর্ববঙ্গ তৃতীয় এক আফগানিস্থানই হবে। আর মুসলিমশূন্য পশ্চিমবঙ্গ সেকুলার স্টেটের অঙ্গ থাকতে পারবে না। নেপালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" মীর সাহেব আশঙ্কা করেন।

মানস বলে, "হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের ব্যর্থতার নিদর্শন এই দেশভাগ ও প্রদেশভাগ। এর উপর যদি কেউ বলেন লোকভাগ করলেই এ সমস্যা চিরকালের মতো মিটে যাবে তা হলে আমি বলব, তাই হোক। কিন্তু তাতেও কি মিটবে? তখন এঁরাই বলবেন যুদ্ধ বাধাতে। হিন্দুস্থানে পাকিস্থানে যুদ্ধ। আমি বলব, বেশ, তাই হোক। কিন্তু তাতেও কি মিটবে? শেষপর্যন্ত এক তৃতীয় পক্ষকে খাল কেটে ডেকে আনা হবে। আবার পরাধীনতা। সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পরাধীনতায় অভ্যস্ত। তারা সেটা সহজেই মেনে নেবে। মানবে না তারাই যারা স্বাধীন দেশে বাস করেছে, স্বাধীনতার স্বরূপ দেখেছে, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু আরো একবার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করার মতো বল বয়স তাঁদেরও নেই। তাই মাউণ্টব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফের সহায়তায় এই দেশভাগ ও প্রদেশভাগ। এটা আদর্শ সমাধান নয়। এটা বাস্তবের কাছে নতিস্বীকার। যারা নতিস্বীকারে নারাজ হয়েছে তারা ঘরবাড়ী জায়গা জমি ছেড়ে পূর্ব পাঞ্জাবে বা পশ্চিম পাঞ্জাবে সদলবলে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাড়ি দিয়েছে। মারামারি করে মরেছেও বিস্তর। এধারেও তেমন কিছু হতে পারত। কিন্তু এখনপর্যন্ত হয়নি। যাতে না হয় তার জন্যেই উভয় সম্প্রদায়ের শুভার্থীরা সচেষ্ট। কিন্তু মানুষের দুর্মতিরও তো সীমা নেই। সে তার দুর্মতি দিয়ে দুর্গতি ঘটাবে আর বিপাকে ফেলবে তার প্রতিপক্ষকে। গান্ধীকে, জবাহরলালকে, কংগ্রেসকে। যেহেতু সরকার এখন এঁদের হাতে। পশ্চিম প্রান্তে যাই হোক না কেন পূর্বপ্রান্তে লোকবিনিময় একটা কৃত্রিম প্রয়াস। একে প্রতিহত করা কর্তব্য। বাংলাদেশ যেন পাঞ্জাব না হয়।"

"কথাটা সত্যি। কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে এক হাতে তালি বাজে না। বিস্তর বিহারী মুসলমান পূর্ববঙ্গে গিয়ে জুটেছে। বাঙালী হিন্দুকে তারা মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে। শিকড়হারা বাঙালী হিন্দু যদি শিকড়ের সন্ধানে পশ্চিমমুখী হয় তবে সেটা নিতান্ত নাচার হয়েই। সেরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বাধানোর প্রস্তাব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ম্যাও ধরবে কে? জবাহরলাল নন। গান্ধী তো ননই। যুদ্ধ যদি না বাধে কিংবা বাধলেও সফল না হয় তবে লোকসমাগম পশ্চিমবঙ্গকে বাসের অযোগ্য করবে। বদলা নিতে গেলে পূর্ববঙ্গও বিহারীতে ভরে যাবে, বাঙালী সংখ্যানুপাত কমে যাবে। ওখানেও জীবনযাত্রা দুর্বহ হবে, মল্লিক সাহেব।" মীর সাহেব বলেন।

স্বপনদা বলেন, "অমনি করেই শিক্ষা হবে কে নিকটতর আত্মীয়। বাঙালী হিন্দু না বিহারী মুসলমান। কে আরো আপন। বাঙালী মুসলমান না অসমীয়া হিন্দু। ধর্মের মতো ভাষাও এক প্রবল শক্তি। ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের পরে ভাষাভিত্তিক দ্বন্দ্ব এসেছে। নেশন বলতে এখন বোঝায় সাধারণত ভাষাভিত্তিক নেশন। তিন শতাব্দী পূর্বে জার্মান প্রটেস্টান্টরা যেত ফরাসী প্রটেস্টান্টদের হয়ে লড়তে। আর ফরাসী ক্যাথলিকরা যেত জার্মান ক্যাথলিকদের হয়ে লড়তে। চাকা ঘুরে গেছে। আর সে রকম হয় না। এখন জার্মান প্রটেস্টান্ট ও জার্মান ক্যাথলিক লড়ে জার্মান জাতির হয়ে ফরাসী ক্যাথলিক ও ফরাসী প্রটেস্টান্টের সঙ্গে। জাতি এখন ভাষাভিত্তিক। কয়েক শতক পরে এ দেশেও তাই হবে। রাজনীতিতে শেষকথা বলে কিছু নেই। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ, লোক ভাগ, গৃহযুদ্ধ কোনোটাই না। ব্রিটিশ আমল এখন একটা বিস্মৃত অধ্যায়। হিন্দু মুসলিম বিরোধও আরেকটা বিস্মৃত অধ্যায় হবে। নতুন অধ্যায় হবে ক্যাপিটাল বনাম লেবার। দেশ আবার দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে। ইস্ট জার্মানী, ওয়েস্ট জার্মানী।"

সৌম্যর বিয়েতে তার গুরুজনরা কেউ যোগ দেননি। কিন্তু তার ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে তার ছোটকাকা আপনা হতে এসে অগ্রণী হন। কথা ছিল স্বপনদা মুখে ভাত দেবেন ছেলের আর মানস মেয়ের। কিন্তু ছোটকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকেই সে ভার দেওয়া হয়। তবে নামকরণটা তাঁকে দিয়ে হবে না। তিনি ভাবছিলেন ছেলের নাম হবে হরিনারায়ণ আর মেয়ের নাম কাত্যায়নী। সৌম্য তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাম রাখে মোহন ও নিবেদিতা। যে দু'জনকে সে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করে।

দীপিকাদি ক্ষুণ্ণ হন। "কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা কী দোষ করল?"

"নন্দন আর নন্দিনী কেন খারিজ হলো?" যূথিকাও ক্ষুব্ধ।

জুলি তাঁদের মান ভঞ্জন করে। "তোমরা তোমাদের দেওয়া নামেই ডেকো। গোলাপকে যে নামেই ডাকবে সে তেমনি সৌরভ বিতরণ করবে। কিন্তু সৌম্যর কাছে মোহনদাস গান্ধীই আদর্শ পুরুষ আর ভগিনী নিবেদিতাই আদর্শ নারী। ওর দিক থেকে ও ঠিকই করেছে। আমার উপর ছেড়ে দিলে আমি আমার মেয়েকে জোন অভ্ আর্কের আদর্শেই মানুষ করতুম। নামটাও তার কাছাকাছি হতো। জীয়ন।"

"জীয়ন ?" দীপিকা ও যূথিকা দু'জনেই মাথা নাড়েন। কিন্তু বাবলী তা শুনে বলে, "জীয়ন হবে এই মরা দেশের জীয়ন কাঠি। আহা, কী মধুর নাম। কোথায় পেলি রে তুই এ নাম ?"

"আর ছেলের নাম কী রাখতে ?" দীপিকাদি সুধান।

"আমার ছেলে হবে ওর বাপের মতো ঋষিকল্প পুরুষ। ওর বাপ দায়ে পড়ে রাজনীতি করছে, কিন্তু রাজনীতি ওর প্রকৃতিগত নয়। আমার ছেলের বেলা সে রকম কোনো দায় থাকবে না। সে গীতা কিংবা উপনিষদ্ লিখবে। এমন কিছু দিয়ে যাবে যা হাজার বছর পরেও লোকে পড়বে। অত্রি নামটি কেমন ? ও কী ? হাসছ যে ?" জুলি অপ্রস্তুত হয়।

"প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন বৃথা। উপনিষদ্ ওই একবারই হয়েছে, গীতাও একবার। আড়াই হাজার বছরেও যা আর হয়নি তা আর হবার নয়, জুলি।" দীপিকাদি বলেন।

কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না। ও প্রসঙ্গ চাপা পড়ে।

টুকটুক বলে, "আমার হস্‌পিস আর চালাতে পারছিনে। ভাবছি ওটা আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমার হাতে তুলে দেব। যার কর্ম তারে সাজে। আমার কর্ম নাচ গান অভিনয়। এ বয়সে আর পেশাদার হতে পারব না। কিন্তু এ্যামেচার তো হতে পারি। কিন্তু হিন্দু আর মুসলিম মেয়েদের ভাগ্য খ্রীস্টানদের হাতে সঁপে দেওয়া কি ঠিক হবে ? ওদের যদি আপত্তি থাকে ? বাচ্চাও হয়েছে দুটি মেয়ের। একটি হিন্দু, একটি মুসলিম। হিন্দুদের তো হরেক প্রতিষ্ঠান আছে। ওরা নিয়ে গেলে পারে। তেমনি, মুসলমানদেরও তো প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। তারাই বা নিয়ে যায় না কেন ? হ্যাঁ, দুটিই মেয়ে। মেয়েদের কেউ নেবে না। এক বেশ্যা ছাড়া। ওদের যখন অন্য গার্জেন নেই, আমিই গার্জেন, তখন আমি যা করব তাই হবে। কেবল হস্‌পিসবাসিনীদের সম্মতি চাই।"

"হিন্দু মুসলমানের জ্ঞাতিবিবাদের ফলে রোমান ক্যাথলিকদের প্রভাব বৃদ্ধি। কিন্তু আমি, ভাই, এ দায় বইতে পারব না।" দীপিকাদি বলেন।

"আমিও না। আমার হাত জোড়া।" জুলি অমত জানায়।

টুকটুক যূথিকার দিকে তাকায়। যূথিকা বলে, "আমাদের তো বদলীর চাকরি। ইচ্ছে থাকলেও আপনার হস্‌পিসের দায়িত্ব নিতে পারিনে। যে কোনো দিন বদলীর হুকুম আসবে আর আমাদের তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।"

এবার বাবলীর পালা। সে বলে, "খুশি হয়েই এ ভার নিতুম। যত সব সাম্রাজ্যবাদী খ্রীস্টান কনভেন্ট খুলে ইস্কুল খুলে হাসপাতাল খুলে এদেশে জমিয়ে বসেছে। কিন্তু প্রথম কাজটা প্রথমে। প্রথম কাজ হলো সমাজবিপ্লব। শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক বলতে কৃষকও বোঝায়। বিপ্লবের পরে দেখবে মিশনারীদের কাজ আমরাই চালাব।"

"ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না, দিদি। যে কাজ আমার নয় সে কাজে একটা বছর দিয়েছি। আর নয়। আওয়ার লেডী অভ্ ফাতিমার হাতেই আমার হস্‌পিস সঁপে দেব।" টুকটুক জানায়।

দীপিকাদি বলেন, "ধীরে, টুকলি ধীরে। এ চ্যালেঞ্জ এখন কলকাতায় বা নোয়াখালীতে নিবদ্ধ নয়। সুকুমার দিল্লী থেকে লিখেছে পাঞ্জাবে যা হয়েছে তা এর শত গুণ কি সহস্র গুণ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ তিন সম্প্রদায়ের কুমারী, সধবা, বিধবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষদের কবলে পড়েছে। মুসলমানরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে সাদী করেছে। শিখরাও শিখ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বিয়ে করেছে। হিন্দুরা কিন্তু হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিয়ে জাতে তুলতে পারে না। তাই বধ করে।"

"কী করে? কী করে? কী করে?" টুকটুক জুলি, বাবলী চেঁচিয়ে ওঠে।

"আমাকে জেরা করে কী হবে? সুকুমার স্বপনকে যা লিখেছে আমি তাই বলেছি। হিন্দুরা মুসলিম কন্যাদের বিয়ে না করে বধ করে। বাঁচিয়ে রাখলে পাছে ধরা পড়ে।" দাপিকাদির কণ্ঠে ক্রোধ।

"না, না, এটা কখনো সত্য হতে পারে না। আর কী লিখেছে সুকুমারদা?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"লিখেছে সব সম্প্রদায়ের নারী উদ্ধারের জন্যে মহিলারা একটা টীম গঠন করেছেন। মৃদুলা সরাভাইয়ের নেতৃত্বে। মিলিও জুটে গেছে তাঁর সঙ্গে। তাঁরই মতো পুরুষালি জীন্‌স পরে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। জীপে চড়ে বিপজ্জনক জায়গায় যায়। পকেটে রিভলভার। পাকিস্তান গভর্নমেণ্টও তাঁদের এলাকায় ঢুকতে দেন। কারণ কাজটা তো মুসলিমদের স্বার্থে। মোট ক'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলতে পারা যাচ্ছে না। গোপন রাখতে হচ্ছে। তবে কলকাতার চেয়ে নোয়াখালীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। তাদের আপনজনদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। কিন্তু আপনজনদেরই অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বা পাওয়া যায় হিন্দুরা সাধারণত অনিচ্ছুক। বড়ো ঘরের হয়ে থাকলে

শিখ ও মুসলমানরাও তাই। বড়ো ঘরের মেয়েদের ছোট ঘরে বিয়ে দেওয়াই বোধহয় সমীচীন। কিন্তু তেমন এক সমাজবিপ্লবের জন্যে কোনো সমাজই প্রস্তুত নয়। তা হলে কি উদ্ধার আশ্রমই তাদের স্থায়ী আবাস? তার ভার কে নেবে? গান্ধীজীকে তো লোকে প্রোফেট বলে। যেমন বুদ্ধকে আর যীশুকে। তা হলে তাঁর শিষ্যদেরই কর্তব্য এই নিগৃহিতা নারীদের জন্যে বিহার বা কনভেণ্ট স্থাপন করা। এঁদের শিশুদের জন্যেও, যদি সন্তান হয়। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এর মুখোমুখি হতে হবে। মিশনারীদের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। যদিও তারা আগ্রহী।" দীপিকাদি ধর্মান্তরীকরণকে ভয় করেন।

"সমুদ্রমন্থনে অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠেছিল। এখন দেখছি সকলি গরল ভেল। কে এত গরল কণ্ঠে ধারণ করবে? বেচারা বাপু!" যূথিকা দুঃখ করে।

ওদিকে সৌম্য ব্যস্ত ছিল ওর খুড়োকে নিয়ে। তিনি বলেন, "আর বিদেশে পড়ে থাকা কেন? পূর্ববঙ্গ এখন পূর্ব পাকিস্তান। দেশে ফিরে চল, সবাই দেখতে চাইছে বৌমাকে আর নাতিনাতনীদের। আহা, ছেলে নয় তো, সোনার চাঁদ, মেয়ে নয় তো, হীরের টুকরো। সমাজ কে? সে তো আমি।"

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই যেমন বলেছিলেন, "রাষ্ট্র কে? সে তো আমি।"

খুড়োই যে গ্রামের সমাজ এতদিন এটা সৌম্যর মালুম ছিল না। সে বলে, "একে বিধবাবিবাহ, তার উপর অসবর্ণ। অসধর্মও বটে। ওঁরা ব্রাহ্ম। তোমার সমাজ নেবে?"

"নেবে না তো কী? কানু গান্ধী আর আভা গান্ধী কি সবর্ণ? বেনে আর ব্রাহ্মণ। এখন স্বরাজ এসেছে। তার সঙ্গে নতুন জোয়ার এসেছে। মন্ত্রীরা তো আমাদেরই লোক। একজনকে ধরে নিয়ে আসব। বৌমা পরিবেশন করবেন। কেমন না খায় দেখব। মস্ত বড়ো ভোজ দেব। সব জাতের মানুষ একসঙ্গে বসে খাবে। তবে মুসলমান সম্বন্ধে একটু খুঁত খুঁত করবে। ওরা গোরু খায় কিনা। ওটুকু তোমাকে সহ্য করতে হবে, বাবাজী।" ছোটকাকা অনুরোধ করেন।

"ওইটুকু তো আসল। ওর জন্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল, প্রদেশ ভাগ হয়ে গেল। বাপু বেলেঘাটায় মুসলমানের বাড়ীতে অতিথি হন। ওরাই রেঁধে খাওয়ায়। কিন্তু এমন কিছু খাওয়ায় না যা তাঁর ধর্মবিরুদ্ধ। মুসলমানের বাড়ীতে অতিথি হলে আমিও ওদের হাতে খাই। তবে নিষিদ্ধ মাংস খাইনে।

থাক, ছোটকাকা, এযাত্রা থাক। বাচ্চা দুটো রেলের ধকল সইতে পারলেও গোরুর গাড়ীর ধকল পোহাতে পারবে না। ওরা আর একটু বড়ো সড়ো হোক। ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে আসুক।" সৌম্য বোঝায়।

খুড়ো আহত হন। বলেন, "তোমাকে সংসারী দেখব আশা করিনি কোনোদিন। দেশকে স্বাধীন দেখব তাও আশা করিনি। তুমি বিবাহ করেছ, আমাদের বংশরক্ষা হয়েছে। কত বড়ো আনন্দের কথা! কিন্তু আরো এক দফা অন্নপ্রাশনে তুমি এমন একটা শর্ত আরোপ করছ কেন? হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি। সেটা কি চারটিখানি কথা? আগে তো গোহত্যা বন্ধ হোক।"

"আজ তুমি যাঁর সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খেলে তিনি কে, জানো? মীর আবদুল লতিফ, ব্যারিস্টার।" সৌম্য বোমা ফাটায়।

"সর্বনাশ! মুসলমান! লোকে টের পেলে আমাকে একঘরে করবে। শেষে কি পিরিলী বামুন হব?" খুড়োর খেদ।

"ওই যে দেখছ যশোধরা রায় ও পিরিলী বামুনের মেয়ে। ওর এক বিয়ে মুসলমানের সঙ্গে, আরেক বিয়ে আমেরিকানের সঙ্গে।" সৌম্য হাসে।

"হাসির কথা নয়, বাবাজী। আমি বজ্রাহত!" খুড়ো হতভম্ব।

"আর রান্না করেছে কে, শুনবে? শেখ জামাল। স্বপনদা বলেন, শেফ জামাল। অবশ্য একা নয়। বাড়ীর মেয়েরা সাহায্য করেছেন।" সৌম্য জুড়ে দেয়।

"কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং। রাম রাঘব পাহি মাং।" মথুরানাথ বাবু জপ করেন। "এখন এক চুমুক গঙ্গাজল পাই কোথায়?"

পাশের বাড়ী থেকে গঙ্গাজল আনিয়ে নেওয়া হয়। খুড়ো শান্ত হন।

দেশে ফেরার সময় তিনি বলেন, "ছাখ, সোমু, গান্ধী মহারাজের সব ভালো, কিন্তু ওই এক দোষ। যুধিষ্ঠির মহারাজের যেমন জুয়াখেলা, গান্ধী মহাত্মার তেমনি মুসলমানপ্রীতি। তুমিও তাঁর চেলা। সবাই যদি মুসলমানের হাতে খায় তো সবাই যে কালক্রমে মুসলমান হয়ে যাবে! তার বেলা?"

এর পরে মীর সাহেবও এক পাল্টা ভোজ দেন। ক্যালকাটা ক্লাবে মধ্যাহ্ন-ভোজন। বাড়ীতে বিষম অব্যবস্থা। অপমান সহ্য করতে না পেরে বেগম সাহেবা চলে গেছেন পাবনা জেলার ভদ্রাসনে। সঙ্গে কন্যা রাবেয়া। পুত্র ও পুত্রবধূ তো স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী নাগরিক হয়ে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

মীর সাহেবই কথাবার্তা শুরু করেন। "মহাত্মাজী পরামর্শ দেন পাকিস্তানে গিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে লীগকে ভিতর থেকে সংশোধন করতে। কিন্তু মিথ্যাকে দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা যায় না। আমার কালচার বিশুদ্ধ ইসলামিক নয়, কম্পোজিট ইণ্ডিয়ান। আমার হেরিটেজ বিশুদ্ধ সারাসেনিক নয়, কম্বাইণ্ড ইণ্ডো-সারাসেনিক। ইণ্ডিয়ান বলে আজন্ম নিজেকে ভাবার পর এই প্রৌঢ় বয়সে নন-ইণ্ডিয়ান বলে ভাবতে পারিনে। ভাবতে গেলে আমার মনের মধ্যে দারুণ এক ডিস্‌কন্টিনিউইটি হবে। সেটা যেন মানসিক পার্টিশন। এপারে থাকলেই বরং আমি মনের দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন থাকব। ওপারের জন্যে মন কেমন করবে, কিন্তু সেইপর্যন্ত, তার বেশী নয়।"

মানস অভিভূত হয়। সামলে নিয়ে বলে, "মন কেমন তো আমারও করবে, মীর সাহেব। আমাদের সকলেরই করবে। আমাদের কালচার, আমাদের হেরিটেজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার বছর এক খাতে বইবার পরে। আদিতে এটা ছিল আর্যপূর্ব কালচার, আর্যপূর্ব হেরিটেজ। আর্যরা বা আর্যভাষীরা এসে এর সঙ্গে তাদের ধারা মেশায়। সেই মিশ্র ধারাই হয় হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দু উত্তরাধিকার। হিন্দু একটা ধর্মের নাম ছিল না, ছিল একটা দেশের অধিবাসীদের নাম। যেমন ইরানী, যেমন আরব। ইরানী ও আরবদের মুখে যেটা হিন্দ্‌ গ্রীকদের মুখে সেটা ইণ্ড্‌। ইণ্ডিয়া থেকে ইণ্ডিয়ানরা সাগরপারে গিয়ে বাণিজ্য করে, বসতি করে, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার করে। সেই থেকে ইণ্ডোনেশিয়া, ইণ্ডো-চায়না। একটা স্রোত যেমন বাইরে থেকে ভিতরে এসেছে তেমনি আরেকটা স্রোত গেছে ভিতর থেকে বাইরে। ইণ্ডিয়া হচ্ছে সেই লিঙ্ক যা গ্রীস রোমকে গেঁথেছিল ইণ্ডোনেশিয়া ইণ্ডো-চায়নার সঙ্গে। এর পরে আসে ইসলাম নিয়ে আরব, তুর্ক, মোগল। এক কথায়, মধ্য প্রাচ্য। কয়েক শতাব্দী যেতে না যেতে পর্টুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ। এরা যত না খ্রীস্টান তার চেয়ে বেশী বিভিন্ন নেশন। এদেরই সংশ্রবে এসে আমরাও নেশন হয়ে উঠতে চাই। কিন্তু সেই যে সেকালের হিন্দু তার সঙ্গে পরবর্তীকালের সারাসেনিক ঠিক খাপ খায় না। কারণ ধর্মসূত্রে তা এক বিস্তীর্ণ ইসলামিক জগতের অঙ্গ। জন্মসূত্রে সুবিশাল ইণ্ডিয়ান জগতের অঙ্গ নয়। প্রথমে ইণ্ডিয়ান না প্রথমে মুসলিম এই দোটানার এখনো কোনো সমাধান হয়নি। যারা প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতীয়, তাঁরা ভারতকে অস্বীকার করে

ইসলামকেই একান্ত করেছেন। তাঁদের চিন্তানায়ক মহাকবি ইকবাল। পাকিস্তান তাঁরই কল্পরাজ্য। ইণ্ডোনেশিয়ায় তবু ইণ্ডিয়া আছে, পাকিস্তানে ইণ্ডিয়া নেই।"

উর্দুভাষী ব্যারিস্টার সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম খান্ চৌধুরী বলেন, "মরক্কো থেকে ইণ্ডোনেশিয়া অবধি বিস্তৃত যে ধর্মীয় শৃঙ্খল বা চেন হিন্দুস্থান ছিল তার একটি মিসিং লিঙ্ক। দারুল হারব। পাকিস্তান পয়দা হওয়ায় একটা নয়া লিঙ্ক তৈয়ার হলো। দারুল ইসলাম। এতে ইসলামের দিক থেকে লাভ, কিন্তু খণ্ডিত হিন্দুস্থানে যে চার কোটি মুসলমান থেকে যাচ্ছে তাদের দিক থেকে লোকসান। আমরা চলে গেলে এদের সংখ্যা ও সংখ্যানুপাত আরো কমবে। এরা হজম হয়ে যাবে। শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে উর্দু ছেড়ে হিন্দী বলবে। কী আপসোস!"

"আপনি তা হলে পাকিস্তানে যাচ্ছেন না?" স্বপনদা সুধান।

"যেতুম, যদি মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে পড়ত। র‍্যাডক্লিফের উল্টো বিচার। তিনি পাকিস্তানকে খুলনা দিয়ে ভারতকে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ আমার পূর্বপুরুষের গৌরব। তাঁদের প্রতি আনুগত্য আমার কাছে ফরজ।" তিনি উত্তর দেন।

"সময় এসেছে যখন আপনারা পূর্বপুরুষের গৌরবের কথা না ভেবে উত্তর-পুরুষের প্রগতির কথা ভাববেন। অতীতের পুনরাবর্তনই মানব সভ্যতার শেষ কথা নয়। যাদের অতীত ছাড়া আর কিছু নেই তাদের ভবিষ্যৎ বলেও বিশেষ কিছু নেই। সেকালের সেইসব দিগ্বিজয়ী আরবরা ও তুর্করা আজ কোথায়? ইতিহাসের মঞ্চে তাদের স্থান নিয়েছেন দিগ্বিজয়ী মার্কিন আর রুশ। অমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ, যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, কোথায় তারা আজ? গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কত বড়ো বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, রুশ বিপ্লব। হিন্দুরা তবু পা মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। মুসলমানরা কি এক পাও এগোবে না? বরং কয়েক পা পেছোবে? আপনার পাকিস্তানেই যাওয়া উচিত। সেখানে গিয়ে লীডারশিপ দেওয়া উচিত। ব্যারিস্টার লীডার না হলে কি ভারত স্বাধীন হতো, পাকিস্তান পয়দা হতো? পার্টিশন হবার ছিল, হয়েছে। পদ্মার এক পাড় না ভাঙলে আরেক পাড় গড়ে ওঠে না। ভাঙনের জন্যে শোক করা বৃথা। গড়নের জন্যেই আনন্দ করতে হয়। আসুন, আমরা সব আগে কায়েদে

আজম জিন্নাহের স্বাস্থ্যপান করি। লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আই প্রপোজ দ্য ঘোস্ট অভ্ দ্য মেকার অভ্ পাকিস্তান —"

"তোমার কি মাথা খারাপ?" দীপিকাদি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "মীর সাহেবের পার্টিতে এসে জিন্না সাহেবের স্বাস্থ্যপান! মেকার অভ্ পাকিস্তান না ব্রেকার অভ্ ইণ্ডিয়া! যাঁর জন্যে পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রাণ গেল, কোটিখানেক লোক নিরাশ্রয় হলো! তার চেয়ে বরং সার সীরিল র‍্যাডক্লিফের টোস্ট প্রপোজ করো। যিনি আমাদের কলকাতা দিয়ে, কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে, গঙ্গার পূর্বকূল দিয়ে নিষ্কণ্টক করেছেন।"

গ্লাস হাতে তাই করেন স্বপনদা। দীপিকাদি টেবল চাপড়ান।

মীর সাহেব গুম হয়ে বসে থাকেন। মানস পীড়াপীড়ি করলে বলেন, "কলকাতা একদিক থেকে নিষ্কণ্টক, আরেক দিক থেকে নয়। দিল্লীতে আর. এস. এস. নিরঙ্কুশ হয়েছে। আশ্চর্য হব না, যদি কলকাতাতেও বর্গীর হাঙ্গামা হয়।"

বাবলী একগাল হেসে বলে, "ওদের রোষটা আসলে মুসলমানদের উপরে নয়, কমিউনিস্টদের উপরে। ওরা জানে আমরাই ইংরেজের শূন্য স্থান পূরণ করতে আফগানিস্থান দিয়ে নেমে আসছি। পশ্চিম পাকিস্তানই প্রথমে লাল হবে। তার সাযুজ্যে ও প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানও হবে দ্বিতীয়ত লাল। শেষে ভারতও লাল। অখণ্ড লালিমা।"

জুলি উদ্বেগের সঙ্গে বলে, "না, ভাই, ওদের রোষটা আসলে গান্ধীর উপরে। অহিংসার উপরে। অস্পৃশ্যদের উপরে। নারীদের উপরে।"

টুকটুক ফোঁস করে ওঠে। "এ নারী সে নারী নয়। এ লড়তে জানে। একে পরাস্ত করা সহজ হবে না। এ ঘর জ্বালিয়ে দেবে।"

যূথিকা তাকে ঠাণ্ডা করে। "ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া নয়, নারীর কাজ ঘর বাঁধা। ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তার পরে বাইরের কর্তব্য করা। গঠনের দিকটা জুলির মতো মেয়েরা দেখবে। সংগ্রামের দিকটা সৌম্যদার মতো ছেলেরা। সব কাজ সকলের জন্যে নয়। যার কর্ম তার সাজে।"

"যূথিকাদি, তোমাকে এখন থেকে আমি ঠানদি বলে ডাকব।" টুকটুক রাগ করে।

॥ চব্বিশ ॥

সৌম্য পূর্ববঙ্গে ফিরে যাবার আগে একবার বিহার ও দিল্লী ঘুরে আসে। লক্ষ করে ব্রিটিশ সরকারের মতো কংগ্রেস সরকারও সৈন্য ও পুলিশ ব্যবহার করছেন। কোনো তফাৎ নেই। কালো ইংরেজরা গোরা ইংরেজের আইন মোতাবেক কাজ করছেন। গান্ধীর দেওয়া অহিংস অস্ত্র শিকেয় তোলা রয়েছে। তার উপর কেউ নির্ভর করতে চান না। না মন্ত্রী, না অফিসার। ব্রিটিশ বেয়োনেটের স্থানে এখন ইণ্ডিয়ান বেয়োনেট। কার্যত হিন্দু-শিখ বেয়োনেট। কত বড়ো গর্ব!

হিন্দু পুলিশ ও হিন্দু সৈন্যের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ঢুকেছে। তারা মুসলমানকে বাঁচাবার জন্যে হিন্দু বা শিখকে মারবে না। মরুক বেটা মুসলমান, নয়তো পালাক পাকিস্তানে। কে তাকে এদেশে থাকতে বলছে? সে নিজেই তো পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

দিল্লীর একটা মহল্লায় কৃপাসিন্ধু মিশ্র নামে একজন আই. সি. এস. অফিসারের উপর মুসলিম রক্ষার ভার ছিল। তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁরই পরিচালনাধীন এক হিন্দু সৈনিক তাঁকে গুলী করে মারে। আর একটা মহল্লায় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষার জন্যে সৈন্য বা পুলিশ কেউ যাচ্ছে না দেখে জবাহরলাল মাদ্রাজী সৈন্য পাঠান। তারা চেনে না কে হিন্দু কে মুসলমান। কিংবা চিনলেও গ্রাহ্য করে না। হামলাকারীদের মেরে হটায়। মরে হিন্দুরাই। শোরগোল ওঠে।

কংগ্রেসের বুনিয়াদটা কি হিন্দু বুনিয়াদ না ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় বুনিয়াদ? এটাই হলো প্রশ্ন। এর উত্তরে নেহরুর সমালোচকরা বলেন, "পাকিস্তানের বুনিয়াদটা যদি মুসলিম বুনিয়াদ হয় তো হিন্দুস্থানের বুনিয়াদও হিন্দু বুনিয়াদ হবে।" তাঁরা ভুলে যান যে এ রাষ্ট্রের নাম হিন্দুস্থান নয়, ইউনিয়ন অভ্ ইণ্ডিয়া। এ যদি হিন্দুস্থান হয় তো আসামের খ্রীস্টান উপজাতিরাও বিচ্ছিন্নতার দাবী তুলবে। নাগারা ইতিমধ্যেই তুলেছে। ভারত আরো এক দিক থেকে ভাঙবে।

বাপুকে দেখে মনে হলো তিনি যারপর নাই অসুখী। যাঁরা তাঁর নির্দেশ

অমান্য করে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ করেছেন তাঁরা এখন লোকভাগের জন্যেও প্রস্তুত। তা করতে গেলে কিন্তু কংগ্রেস ভাগ হয়ে যাবে। জবাহরলাল কংগ্রেস ছাড়বেন, যদি তাঁর সেকুলার পলিসি অমান্য করা হয়, কংগ্রেসের স্বরূপ যদি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল না হয়ে হিন্দু কমিউনাল হয়। কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে সামনের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ধ্রুব। এই শঙ্কা জবাহরলালের সমালোচকদের আয়ত্তের মধ্যে রেখেছে।

ওপারে রব উঠেছে 'হস্‌কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' এপারেও পাল্টা রব "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। পাকিস্তান যে পথে চলেছে তা সংঘর্ষের পথ। গান্ধীজী পর্যন্ত চেতাবনী দিয়েছেন যে যুদ্ধ বাধতে পারে। যুদ্ধের জন্যে ভারত সরকার তৈরি হচ্ছেন। ওদিকে পাকিস্তান সরকারও। মাউণ্ট-ব্যাটেন থাকতে কেউ ততদূর যাবেন না। সেইজন্যে তাঁকে গভর্নর জেনারেল পদে মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর পেছনে ব্রিটিশ বেয়োনেট নেই। গোরা সৈন্য তল্পিতল্পা গোটাতে ব্যস্ত তাদের অস্ত্র ধরা বারণ।

সৌম্যকে নানা দিক থেকে চিন্তা করতে হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ যদি বেধে যায় তবে দুই যুধ্যমান রাষ্ট্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্তির জন্যে আত্মদান করতে কি সে প্রস্তুত? না, সে প্রস্তুত নয়। নিজেকে প্রতারণা করা অন্যায়। তা হলে সে কী করবে? পাকিস্তানে থেকে ভারতের জয় কামনা করবে? না, সেটাও অন্যায়। গান্ধীজীর সমস্যা আর তার সমস্যা একই সমস্যা নয়। তিনি তো ইচ্ছা করলে নোয়াখালী ত্যাগ করতে পারবেন। সৌম্য কি ইচ্ছা করলে আশ্রম ত্যাগ করতে পারবে? তা যদি করতে হয় তো এখন থেকে করাই শ্রেয়। সোজা কৈফিয়ং সে এপারের নাগরিক, তার শিকড় এপারের মাটিতে। তার স্ত্রীরও তাই।

"তোমার মনে থাকতে পারে," সৌম্য বলে মানসকে, "আমার আদি আদর্শ ছিল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। সস্ত্রীক ধর্মাচরণ। দেশে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে আমি সন্ন্যাসীর আদর্শ গ্রহণ করি। এখন সে সংগ্রাম শেষ হয়েছে। আমিও বিবাহ করেছি। এখন থেকে আমি হব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে। আশ্রমের দায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে ভালো হয়। আমার বন্ধু বঙ্কিম যদি সে ভার নিতে রাজী হয় তা হলে মসৃণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। নইলে আশ্রমটাই উঠে যাবে। বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গ থেকে বিদায় নিতে হবে। আমি

সেখানকার বাসিন্দা নই। আমার তেমন কোনো নাড়ীর টান নেই। হিন্দু মুসলমানের যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যেই সেখানে যাওয়া। হিন্দুরা যদি স্থানত্যাগ করে তা হলে যৌথ প্রতিষ্ঠানের অর্থ কী?"

"হিন্দুরা যাতে স্থান ত্যাগ না করে সেটার জন্যেও তোমাকে ওপারে থাকতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে যে, এপারেতে সব সুখ নয়। এপারকে ভারাক্রান্ত করলে যেটুকু সুখ আছে সেটুকুও থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গ যেন ছোট একটি নৌকা। বোঝা ভারী হলে গঙ্গায় ডুববে।" মানস উপমা দেয়।

"আমি নিজে হয়তো থাকতুম, কিন্তু জুলি একেবারেই নারাজ। শিশু দুটির স্বার্থেই ওকে আপাতত কলকাতায় বাস করতে হবে। যেতে রাজী হতো, যদি মুস্তাফীরা ওখানে থাকতেন। ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু অভিজিত বম্বেতে, মিলি দিল্লীতে, রণ শান্তিনিকেতনে, মাঝখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত, যে-কোনো দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এইসব কারণে তাঁরা চলে আসতে চান।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

সৌম্য এক রাষ্ট্রে, জুলিরা আরেক রাষ্ট্রে, এ ব্যবস্থা সাময়িক হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী হতে পারে না। জুলি এখন 'হোম' গড়ে তুলতে চায়। আশ্রম গড়ে তোলা তার কাছে আশা করা যায় না।

মানস বলে, "বেশ, মুস্তাফীরা যদি চলে আসেন তুমিও চলে আসবে। বঙ্কিমবাবু যদি চালাতে পারেন তো আশ্রম চলবে। হিন্দুরা যদি থাকে তবে যৌথ প্রতিষ্ঠান হবে। না থাকলেও মুসলমানদের নিয়ে গান্ধীনির্দিষ্ট পন্থায় কাজ চলবে। অবশ্য মুসলিম লীগ যদি চলতে দেয়। গান্ধী বলতে তারা হিন্দু বোঝে, তার বেশী কিছু বোঝে না। আর হিন্দু হলেই তাকে মুসলিম-বিদ্বেষী হতেই হবে, মুসলিমদরদী হতে মানা। হিন্দু ও মুসলমান যেন শীত আর গ্রীষ্মের মতো পরস্পরবিরোধী। দক্ষিণ ও বাম বাহুর মতো পরস্পরের পরিপূরক নয়।"

সৌম্য গভীর বিষাদের সঙ্গে বলে, "বাপুর দিন খারাপ যাচ্ছে, ভাই। পাকিস্তানের হিন্দুরাও বলছে পার্টিশনের জন্যে তিনিই দায়ী। দিল্লীর হিন্দুরা তো তাঁকে হিমালয়ে পাঠাতে চায়। তিনি আছেন বলেই জবাহরলালের জোর আছে। জবাহরলালের জোর আছে বলেই মুসলমানের অস্তিত্ব আছে। অথচ পাকিস্তান যে এর জন্যে বাপুর কাছে বা জবাহরলালের কাছে কৃতজ্ঞ তা

নয়। লীগ নেতারা বিশ্বাসই করেন না যে মাউণ্টব্যাটেনকে সালিশ মেনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের এটা একটা ফাইনাল সেটলমেণ্ট। যথারীতি জিন্না সাহেবের আস্তিনে আরো কয়েকটা তাস ছিল। সেসব খেলা হলো না। গান্ধীর কথা অনুসারে কাজ হয়নি, তবু যত দোষ গান্ধী ঘোষ।"

মানস হেসে ওঠে। "যাকে বলে স্কেপগোট।"

সৌম্য শিউরে ওঠে। স্কেপগোটকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হতো।

"তোমার ভূমিকা তা হলে আর কাসাবিয়াঙ্কার হবে না?" মানস সুধায়।

"কী দরকার? বাপুর কলকাতা মিশন সফল হয়েছে। ফলে পূর্ববঙ্গ শান্ত। তাঁর দিল্লী মিশন যদি সফল হয় সারা ভারত-পাকিস্তান শান্ত হবে। কিন্তু দূর দিগন্তে এক বিঘৎ পরিমাণ একটা কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। সেই কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যেতে পারে। কাশ্মীর। পাকিস্তানের 'ক'। কাশ্মীর না পেলে পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ হবে না। অথচ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা নাকি তিন চার হাজার বছর ধরে সেই উপত্যকার অধিবাসী। জবাহরলাল চান কাশ্মীর ভারতের হোক। এ দ্বন্দ্ব মেটাবে কে? কারও সাধ্য নয়। না বাপুর, না মাউণ্টব্যাটেনের। বাংলাদেশের মতো একটা পার্টিশনও সম্ভবপর নয়। দু'পক্ষেরই লক্ষ্য শ্রীনগর। পাহাড় পর্বত নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট নয়। রাজ্যটা মুসলিমপ্রধান বটে, কিন্তু মুসলমানদের বেশীর ভাগ শেখ আবদুল্লার দলে আর শেখ আবদুল্লার দল যেন সেখানকার কংগ্রেস-মুসলিম। তাঁর দলে বহু হিন্দু। জবাহরলালের সঙ্গে আবদুল্লার দীর্ঘকালের মৈত্রী। শেখের হাতে পড়লে সেটা হবে সেকুলার স্টেট। চড়া স্টেকের খেলা। কাজেই সশস্ত্র যুদ্ধের আকার নিতে পারে। কাসাবিয়াঙ্কা যদি কেউ হয় তো সে আমি নই। কোনো একজন কাশ্মীরী মুসলমান কি হিন্দু।" সৌম্যর মনে হয়।

"দিল্লী নিয়ে যারা লড়ল না, কলকাতা নিয়ে যারা লড়ল না, শ্রীনগর নিয়ে লড়বে? তেমনি লাহোর নিয়ে যারা লড়ল না, পেশাওয়ার নিয়ে যারা লড়ল না তারা শ্রীনগর নিয়ে লড়বে? বিশ্বাস হয় না। মিটমাট একটা হয়ে যাবে। ওই মাউণ্টব্যাটেনই করবেন।" মানস ভাবে।

"তখন কোনো পক্ষের নিজস্ব সৈন্য ছিল না। তা যদি থাকত তবে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ বাধত। সেটা ছিল আভ্যন্তরিক বিরোধ সেটা হবে আন্তর্জাতিক বিরোধ। এখন ওদের হাতে অস্ত্র এসেছে, সৈন্য এসেছে, যুদ্ধ

চালাবার অর্থ এসেছে, কেই বা ওদের যুদ্ধ করতে বাধা দিচ্ছে ? মহাত্মার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কেননা অহিংস অস্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনিও এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। তিনি যা বলেন তা নেতাদের এক কানে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। শ্রদ্ধা করেন সবাই, ভালোবাসেন সবাই, এমন কী মাউন্টব্যাটেন পরিবারও। কিন্তু মানছেন কে ? দিল্লীর পরিস্থিতি যদি আরো খারাপের দিকে যায় তবে বাপুকে বোধ হয় আরো একবার অনশন করতে হবে। এতদিনে তাঁর নোয়াখালীতে ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লীর কাজ না সেরে যাবেনই বা কী করে ? আশা করি কাশ্মীর নিয়ে লড়াই বাধবে না। বাধলে অবস্থা আরো জটিল হবে।" সৌম্য দুর্ভাবনা প্রকাশ করে।

"সুকুমার আর মিলির খবর কী ?" মানস জানতে চায়।

"সুকুমার একটা চাকরি জোগাড় করেছে। বিদেশী ডিপ্লোমাটদের রিসিভ করা, ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা। আর মিলি তো মৃদুলাবেনের সহকর্মী। দু'জনেরই ঘোরাফেরার কাজ। একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখাসাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। আচ্ছা, তুমি ক্যাপ্টেন ল'কে চিনতে ? সিভিল সার্জন ছিলেন। এখন দিল্লীতে ব্রিগেডিয়ার ল'। হেলথ ডিপার্টমেণ্টে উচ্চপদস্থ। তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণকলির সঙ্গেও আলাপ হলো। তোমার আর যূথিকার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ডাকনাম ঝরনা বললে মনে পড়বে। ওয়াকিতে যোগ দেন। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ! আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিমা !" সৌম্য জানায়।

"যূথিকা শুনে খুব খুশি হবে।" মানস যূথিকাকে ডেকে শোনায়।

সে তখন জুলির সঙ্গে অন্য ঘরে গল্প করছিল আর তার বাচ্চাদের আদর। সুখবর শুনে সেও কৌতুক করে। "ঝরনা, আমার ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী !"

হাসাহাসির পর যূথিকা জানতে চায় বাপু আবার কবে কলকাতা আসবেন। সে তাঁকে দর্শন করতে চায়। এখনো করেনি।

"আসবার জন্যে ব্যাকুল। নোয়াখালীর কাজ সমাপ্ত না করে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। প্রত্যেকদিন এক্সারসাইজ বুক নিয়ে বাংলা হাতের লেখা মক্স করেন। ছোট ছেলেদের মতো। এবার থেকে তিনি বাংলায় কথা বলবেন : যাতে সাধারণ হিন্দু মুসলমানের অন্তর স্পর্শ করতে পারেন।" সৌম্য বলে।

"উদ্দেশ্য মহৎ। উপায়ও মহৎ।" মানস মন্তব্য করে. "কিন্তু, সৌম্যদা, তিনি যদি না বুঝে থাকেন তোমাদেরই কর্তব্য তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যে নোয়াখালীর সমস্যাটা পুরোপুরি হিন্দু মুসলিম সমস্যা নয়। তার আধখানাই হচ্ছে শোষক শোষিত সমস্যা। বঞ্চক বঞ্চিত সমস্যা। মুসলমান চাষীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের মুখের অন্ন জোগায়, কিন্তু নিজেরা আধপেটা খেয়ে থাকে। এই যে মুসলমান চাষী এরা কারা? এরা তাদের সন্ততি যাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু থাকতে ধোপানাপিত পায়নি, মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধোপানাপিত পায়। এতে তাদের মর্যাদা বাড়ে, তাদের কেউ নিম্ন বর্ণ বলে অপমান করতে সাহস পায় না। কিন্তু ম্লেচ্ছ বলে, যবন বলে। সেটা তারা মুখ বুজে সহ্য করে। যেটা তারা সইতে পারে না সেটা হলো অর্থনৈতিক অবিচার। ইসলাম গ্রহণ করেও তো তার থেকে পরিত্রাণ নেই। তোমরা কি চাও যে এরা দলে দলে মার্কসবাদ গ্রহণ করে কমিউনিস্ট বনে যায়? সেটাও তো একপ্রকার নামান্তর। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আমি অফিসার হিসাবে কিছু কম দশ বছর কাটিয়েছি। নোয়াখালীর সমস্যা অন্যান্য জেলারও সমস্যা। তুমি কি মনে করো অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস ছাড়া এর কোনো স্থায়ী প্রতিকার আছে? মুসলিম লীগের পন্থা অবশ্য ভ্রান্ত পন্থা। হিন্দুমাত্রেই শোষক নয়, মুসলমান মাত্রই শোষিত নয়। অত্যাচার যাদের উপর হয়েছে তাদের অর্ধেক ভাগই শোষিত শ্রেণীর হিন্দু। মুসলিম লীগের স্লোগান তো ওই ইসলাম বিপন্ন। তেমনি হিন্দুমহাসভার স্লোগান হয়েছে হিন্দুত্ব বিপন্ন। তার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে দুই শিবিরে বিভক্ত। ভেবে দেখছি অর্থনৈতিক অবিচার অব্যাহত থাকলে অধিকাংশ মুসলমান কমিউনিস্ট বনে যেত। পূর্ববঙ্গ হতো তাদের ইয়েনান। আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি, নোয়াখালীর অতিরঞ্জিত বিবরণ শুনে ব্যালান্স হারিয়েছি। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছি যে মানুষকে যদি মুসলমান না ভেবে চাষী বা ক্ষেত মজুর ভাবি তবে এর অর্থ অতি পরিষ্কার। এটা ধর্মের নাম করে শ্রেণী সংগ্রাম। জমিদার, মহাজন, জোতদার বা পুলিশ যদি প্রধানত হিন্দু না হতো এটা হতো মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের সংগ্রাম। হিন্দুরা যদি সবাই দেশান্তরী হয় বা মুসলমান বনে যায় তবে মুসলমানে মুসলমানে বেধে যাবে। কিন্তু কেউ দেশান্তরী হবেই বা কেন? গান্ধীজীর হিতোপদেশ শুনে ট্রাস্টী হলেই পারে। যাদের সম্পত্তি আছে তারা শোষণ বন্ধ করুক। শোষণ বন্ধ হলে হিংসা বন্ধ

হবে। ধর্ম এক না হলেও মানুষ একই গ্রামে বা শহরে মিলে মিশে থাকতে পারে। যদি না মোল্লা ও পুরোহিতরা হিংসার প্ররোচনা দেয়।"

"সব সত্যি। কিন্তু প্রথম কাজটি প্রথমে। আপাতত আমাদের লক্ষ্য হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্ট বৃত্ত ছেদ। নোয়াখালীতে, বিহারে, দিল্লীতে, পাঞ্জাবে। অহিংস উপায়েই লক্ষ্যভেদ করতে হবে। শহীদ হতে হবে, যদি দরকার হয়।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

"না, সৌম্যদা।" যূথিকা আর্ত স্বরে বলে, "তুমি শহীদ হবে না। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৈনিকের ভূমিকা সাঙ্গ হয়েছে। আর তার জের টানতে যেয়ো না। এক জীবনে একটা যুদ্ধই যথেষ্ট। তরোয়ালকে ভেঙে লাঙলের ফলা বানাও।"

"অহিংসাকে দেশের লোক ভুলে যেতে বসেছে। এর পর আসছে সত্যের পালা। সত্যকেও যদি লোকে ভুলে যায় তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পর্যবসিত হবে হিন্দু জাতীয়তাবাদে। তখন এপারের মুসলমানদের সবাইকে ওপারে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে। আর ওপারের হিন্দুদের সবাইকে এপারে পালিয়ে আসতে প্ররোচনা দেওয়া হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যদি হিন্দু জাতীয়তাবাদের ছদ্মনাম হয়ে থাকে তবে কাশ্মীর পাবার নৈতিক অধিকার কি তার থাকবে? পেলেও কি সে রাখতে পারবে? না সেটাও হবে নৈতিকতা-বর্জিত রিয়ালপলিটিক?" সৌম্য বলে কাতর কণ্ঠে।

মানস তার সঙ্গে একমত হয়। তবু সতর্ক করে দেয়, "পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা সমুদ্রের ঢেউ আসছে। বাপু যদি রাজা ক্যানিউটের মতো আদেশ দেন, 'সমুদ্র হট যাও' তবে সমুদ্র তো হটবেই না, উল্টে বাপুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হিন্দুর স্রোত তোমরা রোধ করতে পারবে না, সৌম্যদা। কিন্তু মুসলমানের পাল্টা স্রোত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে রোধ করতে পারো। তার দ্বারাই প্রমাণ হবে এটা ভারতীয় রাষ্ট্র, না হিন্দু রাষ্ট্র। তোমাদের জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ না হিন্দু জাতীয়তাবাদ?"

বাপুই ভেসে যেতে পারেন শুনে সৌম্য মর্মাহত হয়। 'বাপু কি তা হলে বাঁচবেন? তিনি যদি না বাঁচেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাবে কে?"

"হিন্দু মুসলমানের শুভবুদ্ধি।" যূথিকা অভয় দেয়।

সৌম্য আশ্রমে ফিরে গিয়ে লক্ষ করে লোকের মধ্যে একটা স্বদেশী বিদেশী

মনোভাব এসে গেছে। ওরা একটা স্বদেশ চেয়েছিল, একটা স্বদেশ পেয়ে গেছে। হিন্দুতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিদেশী হিন্দুতে আপত্তি। তারা কলকাতা কেড়ে নিয়ে বেইমানি করেছে। সৌম্যও তাদের একজন। বেইমান সেও। হিন্দুরাও তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে ডরায়। পাছে তাদেরও সন্দেহ করা হয়। সৌম্য তাদের একটু বাজিয়ে দেখে তারা থাকবে কি থাকবে না এই নিয়ে হ্যামলেটের মতো দোলায়মান। কায়িক কোনো অত্যাচার হচ্ছে না। কিন্তু কাউকে যদি 'জিম্মি' বলা হয় সেটাও তো একপ্রকার মানসিক অত্যাচার। ইসলামের আদিপর্বে ইহুদী তথা খ্রীস্টান আরবদের জিম্মি বলা হতো। তারা প্রতিমাপূজক ছিল না। যারা প্রতিমাপূজক তারা কিন্তু জিম্মি হওয়ারও যোগ্য ছিল না। তাদের কর্তব্য ছিল তিনটির একটি—হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় রাজ্যত্যাগ, নয় মৃত্যুবরণ। অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে ধনপ্রাণ রক্ষা করে। যারা পালিয়ে বাঁচে তারা সম্পত্তি ও বাস্তুভিটা হারায়। কতক লোক পালায় না, পূর্বপুরুষের ধর্ম ছাড়েও না। প্রাণ হারায়। পূর্ব পাকিস্তানের খ্রীস্টানরা জিম্মি হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধরা জিম্মি হবে কোন্ নজীরে? ইসলামের ইতিহাসে তারা কি হবে একমাত্র ব্যতিক্রম? সুলতানী আমলে বা মোগল আমলে এ সমস্যার উদয় হয়নি, কারণ মুসলিম শাসিত হলেও হিন্দুস্থান ছিল দারুল হারব। দারুল ইসলাম নয়। পাকিস্তান হচ্ছে দারুল ইসলাম।

সৌম্য বঙ্কিম করকে ডেকে পাঠায়। আশ্রমের ভার নিতে বলে। "ভাই বঙ্কিম, দাড়ি কামিয়ে আমি মস্ত ভুল করেছি। আমার মুসলিম সহকর্মীরাও আমাকে পর ভাবছে। ওরা এখন নতুন আত্মীয় পেয়েছে। পাঞ্জাবী মুসলমান। বুঝি সবই, তবু আমার কান্না থামতে চায় না। আমি বিদেশী! সারাজীবন স্বদেশীর সাধনা করেও আমার স্বদেশেই আজ আমি বিদেশী। কলকাতা কেড়ে নিয়ে বেইমানি করেছি! আমি বেইমান! বুঝি সবই, তবু আমার কান্না থামছে না।"

"কী বোঝ, সৌম্যদা?" বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসু।

"রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। সাত শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। সাত শতাব্দী ধরে এর আয়োজন চলেছিল। আমরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছোটজাত বা ছোটলোক বলে যাদের ছায়া লাগলে স্নান করেছি, যাদের ঘৃণা করেছি, যাদের জল অচল

করেছি তারা মুসলিম সমাজে আশ্রয় নিয়ে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সামাজিক স্তরে উন্নত হলেও অর্থনৈতিক স্তরে শোষিত হয়েছে। আমরা জমিদার হয়ে তাদের ভূমিহীন করেছি, মহাজন হয়ে তাদের সম্পত্তিহীন করেছি। ধর্মান্তরও তাদের শোষণমুক্ত করতে পারেনি। মরীয়া হয়ে তারা কমিউনিস্ট হতে পারত, কমিউনিস্ট হয়ে বিপ্লব করতে পারত। তা না করে তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে, দাঙ্গা বাধিয়ে পাকিস্তান হাসিল করেছে। এ তোমার, এ আমার পাপ। সামাজিক যথা অর্থনৈতিক অন্যায়ের পাপ। বুঝি সবই, তবু আমার কান্না থামে না। আমি বিদেশী! আমার আপন দেশে আমি বিদেশী। যেমন ইংরেজ, যেমন জাপানী, তেমনি আমি। হৈ হৈ করে বিদেশী কাপড় পুড়িয়েছি যাদের মুখ চেয়ে তারাই এবার বিদেশী কাপড় বলে আহমদাবাদের কাপড় পোড়াবে। সোদপুরের খাদিও। একই উদ্দেশ্য নিয়ে। নিজেদের শিল্পের সংরক্ষণ।" সৌম্য কাতর স্বরে বলে।

বঙ্কিমবাবু তাকে প্রবোধ দেন। "মিটমাট হয়ে যাবে। দুই দেশ পরস্পরের প্রত্যঙ্গ হবে। দুই সম্প্রদায়ও পরস্পরের প্রত্যঙ্গ হবে।"

"হলে তো বাঁচি। যাই হোক, তুমি আশ্রমের ভার নাও। আমাকে কন্যাদায় থেকে বাঁচাও।" সৌম্য হাসির ভাণ করে।

"যেসব অঞ্চল ছিল আর্যদের কাছে অপবিত্র সেই সব অঞ্চলকে মুসলমানরা বলছে পাকিস্তান বা পবিত্র স্থান। ইতিহাস এইভাবে ন্যায়কে ফিরিয়ে আনে। ভাই সৌম্যদা, তুমি যে আমাকে এই গুরু দায়িত্বের জন্যে নির্বাচন করেছ এর জন্যে আমি গর্বিত। কিন্তু আমি কি এর যোগ্য? তোমার মাপে তুমি যে আলখাল্লা তৈরি করিয়েছ আমার মাপে সেটাকে কাটছাঁট করতে হবে। সে অনুমতি কি তুমি দিচ্ছ? এতগুলো বিভাগ চালাবার জন্যে এতজন কর্মী দরকার। কিন্তু হিন্দু কর্মীরা তো এপারে থাকার চেয়ে ওপারে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। আমাকে বলছে আশ্রমটাই ওপারে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। সেটা তো তুমি অনুমোদন করবে না। তা ছাড়া আশ্রমকর্মীদের সুস্পষ্ট একটা লক্ষ্য থাকা চাই। তারা ভারত সেবাশ্রমের সেবাকর্মী নয়। তারা এতদিন ছিল গান্ধীজীর ননভায়োলেণ্ট আর্মি। লক্ষ্য স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার। দেশ এখন স্বাধীন, যদিও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত। এখন এই আর্মির নতুন লক্ষ্যটা কী? অহিংস মতে সমাজবিপ্লব? যার অন্য নাম সর্বোদয়? এ কাজে

মার্কসবাদীরা তো বাদ সাধবেই, বাধা দেবে কট্টর শরিয়ৎপন্থীরাও। পার্টিশন আমাদের খুবই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। যাদের জন্যে সমাজবিপ্লব তারাই আমাদের সন্দেহ করবে। সরকার তো হাতকড়া পরাবেই। যেখানে লক্ষ্য সুস্পষ্ট নয় কিংবা লক্ষ্য সুস্পষ্ট হলেও লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এ জীবনে হবার নয় সেখানে আমাদের প্রগতি সুদূরপরাহত। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি পূর্ববঙ্গের সামনে দুটিমাত্র মার্গ। একটি তাকে নিয়ে যাবে মস্কোয়, আরেকটি মক্কায়। মস্কো আর মক্কার দ্বন্দ্বে মক্কারই জিৎ হবে।" বঙ্কিমবাবু অনুমান করেন।

"তোমার বিশ্লেষণটাই বোধহয় ঠিক। তা হলেও আমাদের কাজ তৃতীয় একটা পন্থার ইশারা দেওয়া। বলা বাহুল্য, আমাদের তৃতীয়পন্থী অহিংসক শিবিরে মুসলমান সৈনিকও থাকবে। নয়তো আমাদের শিবির গুটিয়ে নেওয়াই শ্রেয়। না, ওপারে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। ওপারে শিকড় লাগবে না। ওপারে আরো অনেক আশ্রম আছে। স্বয়ং মহাত্মা রয়েছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার প্রবণতা ভালো নয়। আমরা এতে প্রশ্রয় দিতে পারিনে। যার যেখানে শিকড় তার সেখানে স্থিতি। ঝড় কেটে যাবে।" সৌম্য বলে প্রতীতির সঙ্গে।

বঙ্কিমবাবু গান্ধীজীর সংবাদ জানতে চাইলে সৌম্য জানায়, 'বাপুর বিশ্বাস কলকাতা শান্ত হলে সারা বাংলাদেশ শান্ত হবে। পূর্ব তথা পশ্চিম বঙ্গ। কলকাতাকে শান্ত করে সারা বাংলাদেশকে তিনি শান্ত করে গেলেন। এখন তাঁর বিশ্বাস দিল্লী শান্ত হলে সারা ভারতবর্ষ শান্ত হবে। ভারত তথা পাকিস্তান। কিন্তু এত চেষ্টা করেও দিল্লী শান্ত হচ্ছে কই? পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা দলে দলে এসে তাদের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে শোনাচ্ছে। আর দিল্লীর হিন্দুরা উত্তেজনায় টগবগ করছে। তার সুযোগ নিচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। প্রধানত মারাঠাদের শিবির। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে হেরে যাবার পর থেকে মারাঠাদের স্বপ্ন আবার কবে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ বাধবে, তারা মুসলমানদের হারিয়ে দিয়ে তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে। এবার দিল্লীতে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে বলপরীক্ষা করবে। সেইজন্যে দিল্লীকে শান্ত করা কলকাতাকে শান্ত করার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন। বাপুরও তেমনি জেদ, তিনি ব্যর্থ হয়ে দিল্লী থেকে ফিরবেন না। নইলে তাঁর তো এতদিনে নোয়াখালী ফিরে আসার

কথা। তাঁর হৃদয় পড়ে আছে নোয়াখালীতে। দেহ দিল্লীতে। চড়া পণের খেলা। জিতলে বিরাট জয়। হারলে বিরাট পরাজয়। সারা দুনিয়া সে খেলা দেখছে। তিনি তাঁর জীবন পণ রেখেছেন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। তাই আমরা ভয়ে ভয়ে আছি।" সৌম্য উদ্বিগ্ন।

"সৌম্যদা," বঙ্কিমবাবু উদ্বেগের স্বরে বলেন, "বাপুর সংগ্রাম এবার ইংরেজের সঙ্গে নয়. মুসলমানের সঙ্গেও নয়, হিন্দুর সঙ্গে। এটাই সব চেয়ে দুঃখের, সব চেয়ে বেদনার, সব চেয়ে বিপদের। বেশীর ভাগ হিন্দুর সহানুভূতি তিনি পাবেন না। উল্টে পাবেন বিরাগ। ক্ষমতার আসনে বসে কংগ্রেস নেতাদেরও আর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন নেই। তিনি এখন একক সত্যাগ্রহী। তাঁর সত্যাগ্রহের এখন চরম পরীক্ষা। জয়ী তিনি হবেনই, কিন্তু তাঁর জয়টাই হবে প্রতিপক্ষের উষ্মার কারণ। ওরা কি তাঁকে বাঁচতে দেবে? স্বপক্ষও কি তাঁকে বাঁচাবে? কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরালে পাজী।"

বঙ্কিম করকে নিয়ে সৌম্য ক্যাপ্টেন মুস্তাফীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। তিনি বলেন, "মিলির কাণ্ড শুনেছ? পাঞ্জাবের গ্রামে গঞ্জে মৃদুলার সঙ্গে ও নারী উদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। আমিও একসময় পাঞ্জাবে ছিলুম। আর্মির সঙ্গে যুক্ত। জুলির বাবা ক্যাপটেন সিন্‌হাও ছিলেন। সেইসূত্রে ওদের দু'জনের ভাব। মাঝে মাঝে আড়িও হতো। সেই জুলি এখন মা হয়েছে। একসঙ্গে দুই যমজ সন্তানের। শুনে দ্বিগুণ আনন্দ বোধ করছি। ওদের আপাতত না এনে তুমি ভালোই করেছ, সৌম্য। ধীরে সুস্থে এনো। আমার যাওয়া এখন অনিশ্চিত ব্যাপার। এ তো আর সিভিল সার্জনের বদলী নয় যে একমাস নোটিসই যথেষ্ট। সেবাপ্রতিষ্ঠানের যথাবিহিত না করে আমি যাচ্ছি কী করে? 'ট্রাস্ট' গঠন করতে চাই, কিন্তু ট্রাস্ট করব কাকে? সরকারকে দান করতে চাই, কিন্তু সরকারের মূলমন্ত্র 'সব মুসলিম হো জায়েগা'। মুসলিম ডাক্তার তবু মেলে, কিন্তু মুসলিম নার্স কোথায়? ফিমেল নার্সের কথা বলছি। মেল নার্স অবশ্য মেলে। প্রতিষ্ঠানের চরিত্রই বদলে যাবে। এদিকে আমার নার্সরাও পশ্চিমবঙ্গে পালাবার তালে আছে। স্তোক দিচ্ছি, আমি থাকতে তোমাদের ভয় কী? এক গুজরাটী মুসলমান ব্যবসাদার আমার প্রতিষ্ঠান কিনে নিতে চান। তার মায়ের নামে চালাবেন। বম্বে থেকে ফিমেল নার্স আনিয়ে নেবেন। মুসলিম মেয়ে। তা শুনে আমার মুসলিম বন্ধুরা তটস্থ। 'ওরা আমাদের ভাষা বুঝবে না, আমরা ওদের ভাষা বুঝব না। কোন্ রোগের কী

দাওয়াই খাওয়াবে? শেষে কি মারা যাব?' প্রতিদিন মফঃস্বল থেকে দলে দলে লোক আসছে দরবার করতে। আমি যেন ওদের ফেলে চলে না যাই। আমার যে এত ভক্ত আছে তা আমার জানা ছিল না। তাদের মুখে চোখে কী ভালোবাসা! ভালোবাসার জাত ধর্ম নেই। আমিও তো ওদের ভালোবাসি। কী করে ওদের পরের হাতে তুলে দিয়ে যাই? তোমাকে অনুরোধ, তুমিও থেকে যাও। তোমারও তো অনেক ভক্ত আছে। মায়া কাটাবে কেমন করে? মুসলমানরা তো কেউ তোমার কাজে বাধা দিচ্ছে না।"

সৌম্য বলে, "না, ওরা বাধা দিচ্ছে না। তবু আমাকে যেতে হবে। আমি একরাত্রেই বিদেশী বনে গেছি। ওপারে স্বদেশী হওয়া মানে এপারে বিদেশী হওয়া। এপারে যদি থেকে যাই ওপারে বিদেশী বনে যাব। অন্তত আইনের চোখে। জুলিকে আর বাচ্চাদের আমি এই ভজকটের মধ্যে টানতে চাইনে। আর ওদের টান এড়াতে না পেরে আমিও ওদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। আপনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার আশ্রমের তুলনা হয় না। আমার আশ্রম তো সরকারের কৃপায় চার বছর বন্ধ ছিল। আপনার প্রতিষ্ঠান একটা দিনের জন্যেও বন্ধ থাকেনি। বড়দিনের আগেই আমি কলকাতা ফিরছি। তারপর মনঃস্থির করব কোথায় আস্তানা গাড়ব। আপাতত আমার কাজ লোকভাগ রোধ করা। পার্টিশন পলিটিকাল লেভেলে হয়েছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে হয়েছে। মাস লেভেলে হয়নি। না হওয়াই ভালো।"

মুস্তাফী সমর্থন করেন। "ইংরেজরা চলে গেছে বলে হিন্দুরাও চলে যাবে কেন? মুসলমানরাই বা চলে আসবে কেন? তা হলে তো প্রমাণ হয়ে যাবে যে ইংরেজদের থাকার জন্যেই আমরা একসঙ্গে ছিলুম। যাকে বলে পর্বতের আড়ালে থাকা।"

সৌম্য হেসে বলে, "আমার শাশুড়ী ঠাকরুনও তাই বলতেন। পরম রাজভক্ত। শ্বশুর মশায় শুনেছি তার বিপরীত।"

"জালিয়ানওয়ালাবাগ তাঁর মনে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। সেখানে যারা মারা যায় তাদের কেউ কেউ তাঁর চেনা লোক।" মুস্তাফী বলেন।

"এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে, যে কংগ্রেসের আড়ালও হিমালয়ের আড়াল। লীগও আমাদের দেখে শিখবে।" সৌম্য বিশ্বাস করে।

মোহিনীবাবু সৌম্যকে দেখে খুশি হন। "তোমাকে একটা খবর দেবার

ছিল, সৌম্য। জিন্না সাহেবকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। ভেনি, ভিডি, ভিসি। জুলিয়াস সীজারের পর একথা বলতে পারেন কে? একমাত্র কায়দে আজম জিন্না। আইলাম, চাইলাম, পাইলাম। পাকিস্তান সাত বছরের মধ্যে হাসিল! তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। বলেন, 'ধর, আপনি তো জানেন আমি কারো তাঁবেদার হইনি। না কংগ্রেসের, না ইংরেজের। ওরা যোগসাজস করে আমাকে এই পোকায় কাটা ছিন্নভিন্ন পাকিস্তান ধরিয়ে দিয়েছে। এ আমার স্বাধীনচিত্ততার জন্যে সাজা। এখন এর জন্যে একটা শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। আপনি তো জানেন আমি অ্যান্টি-হিন্দু নই, আমি থাকতে পূর্ব পাকিস্তানে আপনাদের ভয়ের কী আছে? তবে আমি চলে গেলে কী হবে বলা যায় না। সেইজন্যে আমি যে শাসনতন্ত্র তৈরি করে যেতে চাই তাতে আপনাদের জন্যে যথেষ্ট সেফগার্ড থাকবে। আমি চাই যে আপনিও তাতে হাত লাগান।' আমি রাজী হই। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান যতদিন থাকবে তার নিশানও ততদিন থাকবে। সে নিশানের এক-তৃতীয়াংশ শাদা। হিন্দুদেরই খাতিরে। পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হলে তার কী সার্থকতা? ধর, আমি অ্যান্টিকংগ্রেসও ছিলুম না। আমি চেয়েছিলুম দ্বিতীয় এক কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট। সেটার জন্যে আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি। কিন্তু ওঁরা চেয়েছিলেন দ্বিতীয় এক গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। আমাকে বিফল করেছেন, নিজেরাও বিফল হয়েছেন। কিন্তু আমাকে সব চেয়ে অবাক করেছে বাঙালীরা। আমার ধারণা ছিল ওরা পেট্রিয়ট।' জিন্না শেষ করতে ব্যথা পান।"

বাসুদেব হালদার ইতিমধ্যে রায় বাহাদুর খেতাব ও উকীল সরকার পদ ছেড়েছেন। সৌম্যকে তার বাগান দেখাতে নিয়ে যান। বলেন, "এই যে দেখছ বট আর অশ্বত্থ এরা দুই যমজ ভাই। কে যে কবে এদের বীজ বুনেছিল বা চারা লাগিয়েছিল তা আমারও অজানা। কারণ আমি এ বাগান জন্মসূত্রে পাই। জন্মে অবধি আমি দেখে আসছি এরা জড়াজড়ি করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে বিরাট হয়েছে। এদের পাতা একরকম নয়, ফল একরকম নয়, বেড় একরকম নয়। আমি যদি বলি, 'বট অশ্বত্থ, এক হো', এরা এক হবে না। আমি যদি বলি, 'বট অশ্বত্থ, তফাৎ রহো', এরা তফাৎ রইবে না। এই বট অশ্বত্থ সমস্যার কি কোনো সমাধান আছে? নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল মীট। নেভার দ্য টোয়েন শ্যাল পার্ট। গান্ধীজী বট অশ্বত্থকে এক করতে পারেননি।

জিন্না সাহেব বট অশ্বথকে তফাৎ রাখতে পারবেন না। দুটোর একটাকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারলে সব সমস্যা মিটে যেত, কিন্তু একের সঙ্গে অপরের শিকড় এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে একটাকে ওপড়াতে গেলে অন্যটাও উপড়ে আসবে। লোকবিনিময় একটা তুঘলকী পরিকল্পনা। স্বাধীনতা না হলে পার্টিশন হতো না, পার্টিশন না হলে স্বাধীনতা হতো না। এই পর্যন্ত ঠিক। পার্টিশন হয়েছে বলে লোকবিনিময় হবে এটা কিন্তু বেঠিক। আমি থাকছি।"

অধ্যাপক মাহমুদ শরীফের সঙ্গেও দেখা করে সৌম্য। তিনি বলেন, "দেশকে আপনারা মাতা বলেন। সেই মাতাকে বন্দনা করেন। তা হলে কোন্ প্রাণে সেই মাতাকে কেটে দু'খানা করলেন? 'বন্দে মাতরম্' এর পর আপনাদের কণ্ঠে মানাবে? সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার প্রায় সবটাই তো পড়ল আমাদের ভাগে। ওপারে এমন কী আছে যে আপনাদের কণ্ঠে ঠিক সুরটি বাজবে? চৌধুরীজী, আমি জানি আপনি আমাদের দোষ দেবেন। মানছি আমরাই ভারতের একভাগ চেয়ে বাংলার একভাগ হারিয়েছি। কিন্তু আপনারা তো দেশগত প্রাণ, আপনারা রাজী হতে গেলেন কেন? অনশন করলেন না কেন? প্রাণ দিলেন না কেন? এমন একটা কানা খোঁড়া পাকিস্তান নিয়ে কী করব আমরা?"

সৌম্য স্বীকার করে, "হ্যাঁ, প্রাণ দেওয়াই উচিত ছিল। তা হলে কিন্তু আপনারা আপনাদের হোমল্যাণ্ড থেকে বঞ্চিত হতেন। আপনাদের বঞ্চিত করে কি আপনাদের হৃদয় জয় করা সম্ভব? তা বলে আমরাই বা আমাদের মায়ের কোল থেকে বঞ্চিত হব কেন? তাই এই পরিণতি।"

"চৌধুরীজী", অধ্যাপক সাহেব বলেন, "একটা কথা মনে রাখবেন। পাকিস্তান বলতে বোঝায় পবিত্র মানুষদের স্থান। আর পবিত্র মানুষ বলতে আপনাদেরও বোঝায়। 'পাক' শব্দটি এসেছে প্রাচীন পারসিক 'পাবক' শব্দটির থেকে। সংস্কৃত পাবকের মতো তারও অর্থ অগ্নি। অগ্নিই পবিত্র করে। যেমন প্রাচীন ভারতে তেমনি প্রাচীন পারস্যে বা ইরানে। আমরা অগ্নিপূজক না হলেও অগ্নি বা পাবকের মহিমা মানি। কালক্রমে পাবক হয়েছে পাক। আর্যভাষীরা যেসব অঞ্চলকে অপবিত্র জ্ঞান করতেন—যেমন পাঞ্জাবকে ও বাংলাদেশকে—সেই সব অঞ্চলকে নিয়েই পাকিস্তান। এখন সেইসব স্থানই পবিত্র হয়েছে। ইতিহাস এতকাল পরে ন্যায়বিচার করেছে।

পাকিস্তানের উৎপত্তির মূলে হিস্টরিকাল জাস্টিস। এ রায় আপনারা মেনে নিন, চৌধুরীজী। এদেশেই থেকে যান আপনারা।"

"হ্যাঁ, এই ঐতিহাসিক রায়টা মেনে নিতে হবে আমাদের। তবে আমি ওপারের লোক, ওপারেই ফিরে যাব।" সৌম্যর মন স্থির।

সে এর পরে যায় তার অসহযোগ আমলের সহবন্দী মৌলানা ইসমাইল হোসেন জালালাবাদীর সকাশে। তিনি তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বেশ কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করেন। বলেন, "আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না, সৌম্য ভাই। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক সাতশো বছরের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কিনা একটা বছরের মধ্যেই ছিন্ন হলো! কোথাও এতটুকু যোগসূত্র রইল না! ওদিকে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র দুই শতকের। সে সম্পর্ক কিন্তু পুরোপুরি ছিন্ন হলো না। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান দুই স্থানই থেকে গেল কমনওয়েলথে। হিন্দু মুসলমান কেউ কারো আপন নয়, ইংরেজরাই উভয়ের আপন। এই পরোক্ষ সম্পর্কটুকু না থাকলে ফল আরো শোচনীয় হতো। তা হলে এটাও কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঙ্গ? হিন্দুস্থানে মুসলমান না থাকলেও চলবে, পাকিস্তানে হিন্দু না থাকলেও চলবে, কিন্তু দুই রাষ্ট্রের মাথার উপরে ইংরেজ রাজা না থাকলে চলবে না। যুদ্ধ বেধে যাবে। একেই কি বলে স্বাধীনতা?"

'দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী নয়নে জল ঝরে অনিবার।'

॥ পঁচিশ ॥

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে সৌম্যকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই আশ্রমকে গুটিয়ে নিতে হবে। এর দেনা শোধ ও পাওনা আদায়ের পর এর সম্পত্তি যা থাকবে তা দান করতে হবে নতুন এক আশ্রমকে। সেটি শুধু হরিজনদের জন্যে। বঙ্কিমবাবু তার ভার নেবেন। প্রধান ট্রাস্টী মোহিনীবাবু। তিনি থাকতে অর্থাভাব হবে না। তেমন আশ্বাস তিনি দিয়েছেন।

এইসব করতে গিয়ে বড়দিন পেরিয়ে যায়। সৌম্য আরো একমাস সময় নেয়। জুলিকে সেই মর্মে চিঠি লেখে। হঠাৎ বারোই জানুয়ারি সন্ধ্যায়

রেডিওতে খবর পায় যে তেরোই থেকে গান্ধীজীর অনশন। অনির্দিষ্টকালের জন্যে। তার বুকটা ছঁ্যাৎ করে ওঠে। আটাত্তর বছর বয়সে আবার অনশন। এ যে মরণের সঙ্গে খেলা। সৌম্য তিষ্ঠতে পারে না। সেই রাত্রেই কলকাতা রওনা হয়। বঙ্কিমবাবুকে বলতে পারে না কবে ফিরবে।

কলকাতায় শুধু দিল্লীর ট্রেন ধরার জন্যেই অপেক্ষা। জুলি কাতর হয়ে বলে, "বাপু যদি না বাঁচেন তা হলে কী হবে, সৌম্য ?"

"ভগবানকে ডাকো।" সৌম্যও তেমনি কাতর স্বরে বলে।

বাচ্চা দুটোকে আদর করে সৌম্য বাপুর কথা ভুলতে চেষ্টা করে। বাপকে দেখে ওরা দু'জনেই খুব খুশি। বিদায় নেবার সময় দু'জনেরই মুখ আঁধার। জুলির প্রশ্নের উত্তরে সৌম্য বলতে পারে না কবে ফিরবে। সব নির্ভর করছে বাপুর অবস্থার উপর। "ভগবানকে ডাকো।" এই বলে বিদায় নেয়।

টেলিগ্রাম পেয়ে সুকুমার এসেছিল স্টেশনে। সঙ্গে মিলি। তার পরণে স্ল্যাকস্। চুল খাটো করে ছাঁটা। দারুণ কর্মচঞ্চল। কিন্তু বিষাদের প্রতিমা।

"বাপু কেমন আছেন ?" সৌম্যর প্রথম উক্তি।

"ইউরিনে অ্যাসিটোন বডি দেখা গেছে। ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন। তুমি যাও, ওঁকে যেমন করে পারো থামাও। আমরা কী অপরাধ করেছি ? আমাদের সুদ্ধ কেন কষ্ট দিচ্ছেন ? রাত্রে ঘুম আসবে না। কখন শুনব তিনি আর নেই। চৌধুরী, তুমি আমাদের ওখানেই উঠছ।" সুকুমার উত্তর দেয়।

"আমি আগে বিড়লা হাউসে যাব। তার পর তোমাদের ওখানে। বাপুর কাছেই থেকে যেতে পারি, যদি অবস্থা গুরুতর বুঝি।" সৌম্যর তর সয় না।

মিলিই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যায়। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে, "জুলি কেমন আছে ? বাচ্চারা আছে কেমন ?"

সৌম্য অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, "ভগবান যেমন রেখেছেন।"

সেখানে সোনাদির সঙ্গে দেখা। খবর শুনে তিনি সেবাগ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন। আরো অনেকের মতো। বলতে গেলে সারা ভারতের গান্ধী পরিবারের মতো।

"সোনাদি," সৌম্য সুধায়, "কেন এই বিনা মেঘে বজ্রপাত ?"

"বিনা মেঘে নয়। যে গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য বাপু দেশভাগে সায় দেন

সেই গৃহযুদ্ধ আসন্ন, যদি পাকিস্তানকে তার পাওনা পঞ্চান্ন কোটি টাকা না দেওয়া হয়। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধও গৃহযুদ্ধ। সে যুদ্ধ বাপু বেঁচে থাকতে নয়। তাই এ অনশন। অনশন ভঙ্গ করতে আমিও অনুনয় করেছি। এ বয়সে অনশন মরণকে আমন্ত্রণ। জৈন মুনিরাও তো অনশনে দেহত্যাগ করেন। উনি জৈন নন, বৈষ্ণব, তবু গুজরাটে জৈন প্রভাবে মানুষ হয়েছেন। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মও বরণ করেছিলেন। এটাও যেন ভীষ্মের শরশয্যা। ডাক্তাররাও ভীত।" সোনাদিও সন্ত্রস্ত।

"আমি রাত জাগতে তৈরি হয়ে এসেছি। যদি দরকার হয়।" সৌম্য বলে।

"আপাতত দরকার হবে না। তুমি যাও, বিশ্রাম করো।" তাঁর অনুজ্ঞা।

রাত আড়াইটের সময় হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গরম জলের গামলায় গা ডুবিয়ে গান্ধীজী প্যারেলালজীকে ডেকে পাঠান। বলেন, "লিখে নাও।" ভারত সরকারকে তিনি পরামর্শ দেন পাকিস্তানের পাওনা অ্যাসেটসের ভাগ পঞ্চান্ন কোটি টাকা অপৌণে মিটিয়ে দিতে। কাশ্মীর নিয়ে বিবাদ বেধেছে, টাকাটা পেলে পাকিস্তান যুদ্ধের জন্যে খরচ করবে এই অজুহাতে পরের পাওনা আটক করা হচ্ছে সত্যভঙ্গ। তা ছাড়া এটা আন্তর্জাতিক সদাচারবিরুদ্ধ।

ভারত সরকার সে পরামর্শ মান্য করেন, অনশন তবু চলতে থাকে। সৌম্য সোনাদিকে সুধায়, "কেন?" তিনি বলেন, "আরো নিগূঢ় কারণ আছে, ভাই। বাপু একমাসের মধ্যে কলকাতাকে শান্ত করতে পারলেন, অথচ চারমাস অক্লান্ত সাধনা সত্ত্বেও দিল্লীকে শান্ত করতে পারেননি। মুসলমানদের ঘরবাড়ী মসজিদ কবরস্থান হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরাও বেদখল করে ভোগ করছে। আর মুসলমানরা এই শীতে হি হি করে কাঁপছে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, তাদের বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের জন্যে ভোট দিয়ে হিন্দুস্থানে পড়ে আছো কেন? ওদিক থেকে কাতারে কাতারে হিন্দু ও শিখ আসছে। এদিক থেকে কাতারে কাতারে মুসলমান না গেলে ওদের ঠাঁই হবে কোথায়? ওরা যদি ভালোয় ভালোয় না যায় তবে ওদের মেরে খেদাও। ইংরেজরাও যবন। মুসলমানরাও যবন। ওদেরও খেদিয়েছি। এদেরও খেদাব। কলকাতায় এ সমস্যা ছিল না, দিল্লীতে আছে ও বাড়ছে। সেখানে কংগ্রেসের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, এখানে আছে ও বাড়ছে। ক্যাবিনেটের ভিতরেই দ্বিমত।

একভাগ স্পষ্ট বলছেন, 'একটু ভয় দেখাতে হয়। ভীতমে প্রীত হোতা হ্যায়। মুসলমানকে খেদালে হিন্দু খেদানো বন্ধ হবে। পাকিস্তানের যে রীতি ভারতেরও সেই রীতি। ভারতের ভদ্রতাকে পাকিস্তান মনে করছে হিন্দুদের মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা আর দুর্বল নই। আমরা সশস্ত্র।' বুঝতেই পারছ ভাই, বাপু কেমন নিঃসঙ্গ। রাজনীতিকে তিনি নীতির স্তরে তুলতে চান। নিজের দেশের নাগরিকদের বিনাদোষে বলপূর্বক বিতাড়ন অন্যায় ও অধর্ম। পাকিস্তান যদি তেমন কাজ করে ভারত তার অনুকরণ করবে না। ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অক্ষুণ্ণ রাখবে। এটা বিবেকের নির্দেশ।"

সৌম্য বলে, "যথার্থ। পূর্ববঙ্গে সওয়া কোটি হিন্দুর বাস। ভারতের মুসলমানদের খেদালে তারা পূর্ববঙ্গে গিয়ে সেখানকার হিন্দুদেরও খেদাবে। হিন্দু খেদা আন্দোলন শুরু হবে। নোয়াখালীতে বাপুর কাজ পণ্ড হবে। বাপু কেন সহ্য করবেন?"

"তার চেয়ে বড়ো কথা দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ হলেও জাতি ভাগ হয়নি। ভূমি বণ্টন হয়েছে, লোক বণ্টন হয়নি। আমরা হিন্দু মুসলমান যেখানেই থাকি না কেন একই জাতি। কিন্তু বলপূর্বক লোকবিনিময় করলে জাতি ভাগ হয়ে যাবে। বাপু তার জীবন্ত সাক্ষী হবেন না।" সোনাদি আক্ষেপ করেন।

সাত শতাব্দী ধরে দিল্লী ছিল মুসলিমশাসিত বা মুসলিমপ্রধান মহানগরী! এখন তাকে রাতারাতি হিন্দুশাসিত তথা হিন্দুপ্রধান মহানগরীতে পরিণত করতে হলে লোকবিনিময়ই লক্ষ্য। বলপ্রয়োগই লক্ষ্যভেদের মোক্ষম উপায়। কলকাতায় এ সমস্যা ছিল না। সেখানে হিন্দু এমনিতেই সংখ্যাগুরু। তাকে সংখ্যাগুরুতে পরিণত করার জন্যে দিল্লীর মতো তাগিদ ছিল না। দিল্লীকে হিন্দুপ্রধান করতে মহাসভাপন্থীরা কৃতসংকল্প। সোনাদি বোঝান!

সৌম্য শান্তি মিছিলে যোগ দিয়ে মহল্লায় মহল্লায় ঘোরে। সুকুমার তার সঙ্গে যায় না, মিলি যায়। মিছিলে সবাই সবাইকার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। মিলিও সৌম্যর সঙ্গে। কারো মুখে হাসি নেই। কথা নেই। শুধু "মহাত্মা গান্ধীকী জয়।"

পাণ্টা মিছিলও বেরোয়। উদ্দেশ্য মুসলমানদের মনোবল নষ্ট করা। যারা পাকিস্তানকে হাত দিয়ে ভোট দিয়েছে তারা এখন পা দিয়ে ভোট দিক। গান্ধী বাধা দিচ্ছেন, তাই সে মিছিলের কণ্ঠে "পাপাত্মা গান্ধী মুর্দাবাদ।" তিনি হিন্দুর শত্রু, মুসলমানের মিত্র।

সৌম্য পীড়া বোধ করে। এ যেন বিষ্ণুদূতের সঙ্গে যমদূতের টাগ অভ্ ওয়ার। বাপুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সংখ্যায় যত কমই হোক ভারতের মাটিতে এমন মানুষও যে জন্মেছে এটাই তার কাছে এক প্রহেলিকা।

"তুমি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথাসাধ্য করবে না? শুনেছি কলকাতায় তুমি গুণ্ডাদের নিরস্ত্র করতে গেছলে।" মিলি তার কানে কানে বলে।

"তুমি যাদের কথা বলছ তারা কেউ গুণ্ডা নয়। তারা একদল অন্ধ জাতীয়তাবাদী। জাতি বলতে তারা বোঝে হিন্দু জাতি। যেমন লীগপন্থীরা বোঝে মুসলিম জাতি। লীগপন্থীরা সফল হয়েছে। মহাসভাপন্থীরা সফল হয়নি। এইখানে তাদের মনের ক্ষত। এর জন্যে তাদের বিশ্বাস বাপুই দায়ী। কেন তিনি পার্টিশনের বিরুদ্ধে অনশন করলেন না? কেন তিনি সায় দিলেন? কী করে ওদের বোঝাব যে পার্টিশন হয়েছে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছায়, তারাই অধিকাংশ ভারতীয়ের প্রতিনিধি। তথা অধিকাংশ হিন্দুরও। বাপুর পেছনে লোকবল থাকলে কি তিনি সায় দিতেন? যেটা নেই সেটা আছে মনে করাটা অবাস্তব। আমার চেয়ে পার্টিশন বিরোধী কে? আমিও ক্রমে ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করেছি যে বাপুর মতো আমিও একটি ক্ষুদ্র মাইনরিটির একজন। আমরা কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করিনে, লগ্ন উপযুক্ত বুঝলে করি। লগ্ন উপযুক্ত ছিল না বলে বাপু অনশন করেননি। তা ছাড়া পার্টিশনের পেছনে কোনো মরাল ইস্যু ছিল না। দ্বন্দ্বটা শুভ আর অশুভের দ্বন্দ্ব নয়। কিন্তু প্রবলের দ্বারা দুর্বলের উচ্ছেদ নিঃসন্দেহ অশুভ। তাই এই অনশন। এই অনশন ব্যর্থ হলে নিশ্চিত মরণ।" সৌম্য শঙ্কিত।

গান্ধীজীর অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যায়। মিছিলে মিছিলে দিল্লী ছয়লাপ। শুধু দিল্লী কেন, ভারতের প্রত্যেকটি শহর। দেশের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে, বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শত শত তারবার্তা আসে। একই বয়ান: 'গান্ধীজী, আপনি আপনার অনশন ভঙ্গ করুন।' তিনি কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় অনড়। তাঁর শর্ত দিল্লীর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই। হিন্দুমুসলমান পরস্পরের সঙ্গে নির্ভয়ে বসবাস করবে, পুলিশের উপর নির্ভর করবে না। সমস্যাটা হচ্ছে কেমন করে একসঙ্গে থাকতে হয়। একসঙ্গে বাঁচতে হয়। সমাধান পরস্পরের উপর বিশ্বাস। মুসলমানদের ঘরবাড়ী, মসজিদ ইত্যাদি খালি করে দিতে হবে। তাদের মহল্লাগুলিতে তারা অবাধে চলাফেরা

করতে পারবে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও খাজা সাহেবের দরগায় মেলা বসবে। এইরকম প্রায় সাতটি শর্ত পূরণ করলেই তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন। মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে চলবে না। লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দেবেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকরা।

আর সকলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেও হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা শেষমুহূর্তে বেঁকে বসেন। তা শুনে গান্ধীজীও তাঁর সঙ্কল্পে দৃঢ় হন। অনশন যদি আরো একটা কি দুটো দিন গড়ায় তবে আরো অনেকরকম উপসর্গ দেখা দেবে। এযাত্রা বেঁচে গেলেও তিনি মারাত্মক অসুখে ভুগবেন। শরীরযন্ত্রেরও স্থায়ী ক্ষতি হবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁর সহকর্মীরা স্বাক্ষরবিমুখদের কাছে বিস্তর সাধ্যসাধনা করেন। অবশেষে জনমতের চাপে তাঁরাও স্বাক্ষর দেন। শান্তির নিশ্চিতি পেয়ে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন।

সকলের মতো সৌম্যও নিশ্চিন্ত হয়।

এর পরে মিলি বলে, "সৌম্যদা, অনশনের বার্তা পেয়ে আমিও মৃদুলাবেনের সঙ্গে পাঞ্জাব ছেড়ে এসেছি। আমরা আবার ফিরে যাব বলে কথা দিয়েছি। নারী উদ্ধারের কাজ নিয়েই আমরা ব্যাপৃত। নইলে তোমার সঙ্গে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে মসজিদ উদ্ধারের কাজ দেখতুম।"

"এখানেও কি নারী উদ্ধারের কাজ করতে হচ্ছে না?" সৌম্য সুধায়।

"না, এখানে সে রকম কোনো কেস নেই। তবে যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হচ্ছে। করছেন মৃদুলাবোন। রাজকুমারী অমৃত কওর খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ওদের বাপ মায়ের ঠিকানা থাকলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যারা বিবাহিতা তাদের শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গেও। তাঁরা ফিরিয়ে নিতে রাজী হলে সে-ই সব চেয়ে ভালো। নয়তো সরকারী বা বেসরকারী হোমই ভরসা। তবে ওরা চায় নিজস্ব হোম। তার মানে বিয়ে। বিবাহিতা হয়ে থাকলে সেটা কেমন করে সম্ভব? বিবাহবিচ্ছেদ তো হিন্দুধর্মে বারণ। মহা ঝামেলা।" মিলি উত্তর দেয়।

"মুসলমান মেয়েদের নিয়ে কী করছ?" সৌম্য জিজ্ঞাসু।

"শিখরা তাদের কনভার্ট করে বিয়ে করে ফেলে। ডিভোর্সের জন্যে কেয়ার করে না। হিন্দুরা না পারে কনভার্ট করতে, না পারে ডিভোর্স করিয়ে নিতে। ওদের নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে—" মিলি থেমে যায়।

"কী করে ?" সৌম্য মিলির মুখ দেখে ভয় পায়।

"বলব না। তুমি মূর্চ্ছা যাবে।" মিলি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"বল না, লক্ষ্মিটি। শুনলে হয়তো একটা কিছু কিনারা করতে পারি। আর কিছু না হোক ওদের সমাজপতিদের জিম্মা দিতে পারি।" সৌম্য ভরসা দেয়।

"আহা, বেঁচে থাকলে তো ?" মিলি দুঃখের সঙ্গে বলে।

"বল কী ! ওরা কি আত্মহত্যা করে ?" সৌম্য শঙ্কিত।

"ওই আত্ম শব্দটা বাদ দাও।" মিলি থর থর করে কাঁপে।

জুলির সঙ্গে কথাবার্তা ফী রাত্রেই হয়। জুলিই ট্রাঙ্ক কল করে। জানতে চায় বাপু কেমন আছেন। বিপদ কেটে গেছে কি না। সৌম্য নিজে কেমন আছে। কবে ফিরবে। জানায় বাচ্চারা ভালো আছে, খুব দুষ্টুমি করছে। আকারে ইঙ্গিতে বাবাকে চাইছে। বাপুর অনশনভঙ্গের পর সে যেন একটা দিনও দেরি না করে।

অনশনভঙ্গ তো হলো। তবে দেরি কেন ? কিন্তু বাপুর সঙ্গে একবার দেখা না করে তো সে ফিরতে পারে না। পূর্ববঙ্গের অবস্থাটা তিনি জানবেন কী করে, যদি সে না জানায় ? তিনি কি চান যে সৌম্য সেখানে আশ্রম নিয়ে পড়ে থাকে ? হিন্দুদের সাহস দিতে ? না তার নতুন করে জীবন শুরু করা উচিত পশ্চিমবঙ্গের কোনো এক জেলায় সেখানকার মুসলমানদের সাহস দিতে ? তারাও তো বিপন্ন।

এই নিয়ে সোনাদির সঙ্গে কথা। তিনি বলেন, "বাপুর অনশনভঙ্গে সকলে সুখী হয়নি। হিন্দু মহাসভা ও আর. এস. এস. যে হবে না সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরেই গুঞ্জন উঠছে যে বাপু থাকতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারা যাবে না। অহিংসার যুগ গেছে। তবে আর অহিংসার পরীক্ষা কেন ? তাঁর হিমালয়ে প্রস্থান করাই শ্রেয়। এই যে মুসলিম সম্প্রদায় এর মধ্যে লয়াল মুসলিম আর ক'জন ? সবাই তো মনে মনে পাকিস্তানী। ডিসলয়াল অফিসারদের মতো এদেরও পাকিস্তানে চালান দেওয়া উচিত। পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই বাধলে এরা হবে দুর্গের ভিতরে ট্রোজান হর্স। ভারত হেরে যাবে। ওদিক থেকে যারা আসবে তারা লয়াল হিন্দু ও শিখ। তাদের আসতে দেওয়া সমীচীন। যা করবার তা এই ধাক্কাতেই করা সঙ্গত। লোহা ডগডগে লাল যখন থাকে তখনি তার উপর হাতুড়ি পিটতে হয়। এই যেমন

একপক্ষের যুক্তি তেমনি অপর পক্ষের যুক্তি হলো, কাশ্মীর রাখতে হলে মুসলমানদের অভয় দিতে হবে। কেবল কাশ্মীরে নয়, ভারতের সর্ব প্রান্তে। নইলে কাশ্মীরী মুসলমানরা বিদ্রোহী হবে, হিন্দুদের মেরে তাড়াবে, তাদের রক্ষার জন্যে আরো সৈন্য পাঠাতে হবে। গোটা ইণ্ডিয়ান আর্মিটাই কাশ্মীরে মোতায়েন করতে হবে। এর পাল্টা যুক্তি, কাশ্মীরের এমন কী গুরুত্ব যে তাকে যক্ষের ধনের মতো পাহারা দিতে হবে? তার মুসলিমপ্রধান অংশটা ছেড়ে দিলেই হয়। হিন্দুরা শ্রীনগর অঞ্চল থেকে জম্মু অঞ্চলে চলে আসবে ও মুসলমানরা সেখান থেকে সরে যাবে। জবাহর কিন্তু একথা শুনলে লাল হয়ে যান। কাশ্মীর উপত্যকা তাঁর পূর্বপুরুষের তিন চার হাজার বছরের জন্মভূমি। তার জন্যে তিনি শেষ ভারতীয় সৈন্যটি পর্যন্ত লড়বেন। শেষ রক্তবিন্দুটি পাত করবেন। কাশ্মীরী মুসলমানরা তাঁর বন্ধু। শেখ আবদুল্লার কাছে তিনি দায়বদ্ধ। আর কোনো কারণ না থাকলেও কাশ্মীরী মুসলমানদের খাতিরে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা করবেন। সেই সুবাদে কাশ্মীরী হিন্দুরাও রক্ষা পাবে। বাপুর এখন উভয়সঙ্কট! তিনি কোন পক্ষ নেবেন?"

সৌম্য বিষম আঘাত পায়। সরষের ভিতরেই ভূত। কংগ্রেসের ভিতরেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তবে তাকে লবণাক্ত করবে কে? তাকে ফেলে দিতে হয়। দেশের বিবেককে নির্মল রাখতে হবে। এটা বিবেকের সঙ্কট। সৌম্য সোনাদির কাছে শোনে যে বাপু কংগ্রেসকে গুটিয়ে নেবার কথাই ভাবছেন। দেশের স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের আর কী দরকার?

আঠারো তারিখে অনশনভঙ্গ। বিশ তারিখে প্রার্থনাসভায় বিস্ফোরণ। বাপু বুঝতে পারেন না কিসের আওয়াজ। বিচলিত হন না। সৌম্যও না। মিলি এসে তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, "হাঁ করে কী দেখছ? ওটা যে বোমা!"

"বোমা! বাপুর উপরে বোমা!" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"বোমা নয়তো কী? বোমা কী জিনিস আমি যত জানি আর কে তত জানে? যুদ্ধের সময় বিলেতে ছিলুম না? বাপুও যেতেন, তুমিও যেতে। অত কাছাকাছি বসতে যাও কেন? দূরে দূরেই বোসো! জুলিকে এত কথা জানতে দিয়ো না।" মিলি বলে।

সোনাদি পাগলের মতো ছুটে আসেন। "অনশন তাঁকে মারতে পারেনি।

বোমা তাঁকে মারতে পারেনি। তিনি প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদকে জল্লাদ মারতে পারে না।"

মিলি যায় মদনলালকে দেখতে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে চালান দেয়।

মুঙ্গের থেকে এসেছেন ফুলনপ্রসাদ সিন্‌হা, কলকাতা থেকে বিনয়গোপাল দত্ত, মেদিনীপুর থেকে মধুসূদন শাঁতরা। যত সব কট্টর গান্ধীপন্থী জেলবার্ড। সৌম্য সকালবেলাটা তাঁদের সঙ্গে কাটায়। বাপু বেঁচে গেছেন বলে তাঁরা সবাই খুশি। তবে মদনলালের জন্যে দুঃখিত। বিশ বছর মাত্র বয়স। গৃহহারা শরণার্থী। বাপু ক্ষমা করেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ফুলনভাই বলেন, "বাপুর স্বস্তি কোথায়? গভর্নমেণ্টের ভিতরেই যা অশান্তি চলছে বাইরের অশান্তির চেয়ে কিসে কম? টীম ওয়ার্ক সম্ভব হয় না বলে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট ভেঙে যায়। এখন ফের সেই একই ব্যাপার।"

সৌম্য অত কথা জানত না। বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়। ফুলনভাই বলেন, 'বাপু আলমিটোন দিয়েছেন। একজনকে ক্যাবিনেট ছাড়তে হবে। ক্যাবিনেট ক্রাইসিস। কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ এখন তুঙ্গে। বল্লভভাইয়ের বক্তব্য হলো পার্টি হাইকমাণ্ডের নির্দেশ সবাইকে মানতে হবে। জবাহরলালকেও। অপর পক্ষে জবাহরলালের যুক্তি হলো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পার্টি হাই কমাণ্ডের উর্ধ্বে। ক্যাবিনেটকে তাঁরই নির্দেশ মানতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বেলাও একই রীতি অনুসরণ করতে হবে। বাপুর তো ওই পুরনো প্রেসক্রিপশন। অ্যাবডিকেশন। দু'জনের একজনকে অ্যবডিকেট করতে হবে। কাকে?"

পরের দিন তিরিশে জানুয়ারি ফুলনভাই একগাল হেসে বলেন, "সৌম্য ভাই, সঙ্কট কেটে গেছে। দু'জনেই থাকবেন। জাতীয় স্বার্থে। পণ্ডিতজী ও সর্দারজী দু'জনেই অত্যাবশ্যক। মাউণ্টব্যাটেনও সেই কথা বুঝিয়েছেন।"

তা শুনে সৌম্যর মনের উপর থেকে ছায়া সরে যায়। সে উল্লসিত হয়। বলে, "মর্নিং শোজ দ্য ডে। আজ বড়ো শুভদিন। দিনটি শান্তিতে কাটবে।"

সেদিন প্রার্থনাসভায় বাপুর আসতে দেরি দেখে সোনাদি বলেন, "এ কী অঘটন! বাপুর তো কখনো একটা মিনিটও দেরি হয় না। বল্লভভাইয়ের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী এমন কথাবার্তা হচ্ছে? তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা।"

"পাঁচটা বেজে দশ। দশ মিনিট দেরি।" উত্তর দেয় সৌম্য। চিন্তিত মুখে।

একটু পরে কলরব ওঠে। "আ রহে হ্যায়।" "কামিং।" সৌম্য পেছনের সারি থেকে দেখতে পায় নাতনী মনু আর নাতবৌ আভার কাঁধে হাত রেখে ভিড়ের ভিতর রাস্তা করে নিয়ে প্রার্থনা সভার দিকে ক্ষিপ্র পদে ছুটে আসছেন বাপু।

মুহূর্তের মধ্যে কী যে ঘটে গেল! ফুলনভাই চেঁচিয়ে ওঠেন, "সত্যানাশ হো গয়া।" সৌম্যর কানে আসে গুলীর আওয়াজ আর বাপুর কণ্ঠের "হে রাম!" তার চোখে আঁধার নেমে আসে। তার পা অবশ হয়ে যায়। লোকজন "হাঁ, হাঁ" করে দৌড়িয়ে যাবার সময় তাকেও টেনে নিয়ে যায়। তার পর "হায়, হায়" করে ওঠে। বাপুকে ধরাধরি করে বিড়লা ভবনে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

সকলের নজর বাপুর উপরেই। কেবল একজনের নয়। সে বিড়লাদের বাগানের মালী রঘু। উৎকলীয়। সে এক খাকী পোশাক পরা পিস্তলধারী বলিষ্ঠ যুবাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে। রঘু যদি বাধা না দিত ভক্তরা সেদিন ওই পিতৃহন্তাকে লীঞ্চ করত। ফুলনভাইয়ের মতো অহিংসাবাদীর চোখেও হিংসার আগুন।

বল্লভভাই এসে বাপুর নাড়ী টিপে দেখেন। বলেন, "একটু যেন ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।" ঘটনার দশ মিনিট বাদে ডাক্তার ভার্গব এসে পরীক্ষা করে বলেন, "দশ মিনিট আগেই হয়ে গেছে।" তখন কান্নার রোল ওঠে। মেয়েরা মেজেতে লুটিয়ে পড়ে। কে একজন রামধুন ধরিয়ে দেয়। অমনি সবাই গায়, "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।"

জবাহরলাল হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাপুর শয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বলেন, "এখনো উষ্ণ।" মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারা একে একে আসেন ও চোখে রুমাল চাপা দেন। বড়লাট একটু আগেই মাদ্রাজ থেকে ফিরেছেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন। আততায়ী মুসলমান ভেবে মারমুখো হিন্দু জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা কি জানেন না যে আততায়ী হিন্দু?" যদিও নিজেই জানতেন না সে কে ও কী। তাঁর উপর জনতার অসীম আস্থা। তিনিই পরিস্থিতি হাতে নেন।

সৌম্য তো একেবারে পাথর। কান্না তার বুক ঠেলে ওঠে, তবু সে কাঁদে না। কাঁদতে পারে না। ভাবে, শহীদ হওয়ার অধিকার কি সকলের আছে?

বুকভরা প্রেম, বুক পেতে গুলী, মুখে ইষ্টনাম, দুই হাত জোড় করে বিদায় নমস্কার। মৃত্যুর পরে পরমা শান্তি, পরমা তৃপ্তি। জগন্মাতার কোলে ঘুমিয়ে পড়া শিশু। মৃত্যু, কোথায় তোমার জয়? শ্মশান, কোথায় তোমার জ্বালা! এ যেন ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ। সৌম্য একটু দূর থেকে বাপুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সোনাদি ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, "ভাই, এমন দৃশ্য দু' হাজার বছরে একবার দেখতে পাওয়া যায়। ক্রুসিফিকশন। এবারেও সেই শুক্রবার। আমরা ধন্য। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী।"

ফুলনভাই খবর নিয়ে আসেন আততায়ীর নাম নাথুরাম গোড়সে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। সাবরকর শিষ্য। সোনাদি তা শুনে বলেন, "ওমা, তাই নাকি। এই সেই জমাদার, বাপুর পেছনে যে লেগেছে সাত আট বছর ধরে! বাপু খারাপ! অহিংসা খারাপ! ভালো কিনা হিংসা আর শাঠ্য!"

সুকুমার আর মিলি নীরবে এসে সৌম্যর দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। তাদের মোটরে তোলে। মিলিই চালায়। বাসায় নিয়ে গিয়ে মুখে কিছু দিতে অনুরোধ উপরোধ করে। সৌম্য শুধু এক গ্লাস জল চেয়ে নেয়। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শোয় না। চেয়ারে হেলান দিয়ে রাত জাগে। আজ তার শিবরাত্রির জাগরণ।

রাত দুপুরে খোঁজ নিতে এসে মিলি সুধায়, "কী, দাদা? ঘুম আসছে না?"

"না, বোন। আসবেও না।" সৌম্য থেমে থেমে বলে, "কত কথাই না মনে পড়ছে! প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা। সালটা বোধহয় ১৯০৯। বাপু তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লণ্ডনে গেছেন ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। কাজের ফাঁকে তিনি সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও আলাপ করেন। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন ওঠে। একদিন এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় সাবরকরের সঙ্গে কথোপকথন। সাবরকর বলেন, 'গান্ধী, মনে করুন এক বিষধর সর্প আপনার দিকে তেড়ে আসছে। আপনার হাতে একখানা লাঠি। আপনি কি সেই লাঠি দিয়ে সাপটাকে মারবেন না?' বাপু উত্তর দেন, 'লাঠিখানা আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেব, পাছে সাপটাকে মারতে প্রলুব্ধ হই।' তখন সাবরকর বলেন, 'গান্ধী, আপনি আমার আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক গুরু কদাচ নয়।' সেই সময় থেকেই তাঁরা উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু।"

মিলি বলে সমবেদনার স্বরে, "আমরা বিপ্লবীরাও তো উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। তা বলে আমরা কি কখনো তাঁর মৃত্যু কামনা করেছি? ধিক, ধিক, শত ধিক অমন রাজনীতিকে যা জনগণের অভিশাপ ডেকে আনে।"

সৌম্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পরে আবার থেমে থেমে বলে, "ভগবান আমাকে এ কী পরীক্ষায় ফেলেছেন! কোথায় আমার অহিংসা? আমি যে ওই মূঢ়টাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনে। বাপু বেঁচে থাকলে ক্ষমা করতেন, জানি। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারছিনে ওই যমদূতটা আমার সামনেই আমার বাপকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমি অপদার্থের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। নিজেকেও আমি ক্ষমা করতে পারছিনে। ভাবতে আরো খারাপ লাগছে যে হিন্দুই হিন্দুর পরম শত্রু। হাজার বছর পরে হিন্দুকে যিনি স্বাধীন করে দিলেন, অথচ আপনি রাজা হলেন না, হিন্দুর হাতেই তাঁর নিধন হলো। মুসলমান ও ইংরেজও যা করেনি হিন্দু তা করেছে। মহাগুরু নিপাত!"

"আ গ্লোরিয়াস এণ্ডিং।" মিলি তাকে প্রবোধ দেয়।

মিলি চলে গেলে সৌম্য তার নির্জন কক্ষে অঝোর ধারায় কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে রাত পোহায়। তাতেই সে কতটকা শান্তি পায়।

শেষ রাত্রে মিলি আবার আসে খোঁজ নিতে। "ও কী, দাদা, তুমি এখনো জেগে। রাত যে ভোর হয়ে এল।"

সৌম্য তখন আকাশের দিকে চেয়ে। বাপু এতক্ষণে তারা হয়ে ফুটেছেন। আর একটি ধ্রুবতারা। সারা পৃথিবীর লোক এর উপর দৃষ্টি রেখে পথ চলবে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। হিন্দুর হৃদয় মুসলমানের হবে। মুসলমানের হৃদয় হিন্দুর হবে। উভয়ের মিলিত হৃদয় ভারত পাকিস্তানের হবে। কিন্তু বাপু আর ফিরবেন না। ও হো হো!" সে আকুল হয়ে কাঁদে।

আলো ফুটলে ওরা তিনজনে খালি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। বিড়লা ভবনের সামনে অসংখ্য পদযাত্রীর সমাবেশ। ওরাও লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে অন্তিমযাত্রার আয়োজনের ভার দেওয়া হয়েছে প্রধান সেনাপতি সার রয় বুচারকে। সামরিক পদ্ধতিতে ফিউনারল মার্চ। যেমন যুদ্ধে নিহত মহারথীদের বেলা হয়। শুরু হতে এগারোটা বাজে। সব আগে চারটে সাঁজোয়া গাড়ী। তার পরে বড়লাটের সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী। তার পরে আড়াইশো জন নাবিক, সৈনিক, বৈমানিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা সবাই পদাতিক। সকলের হাতে রথের দড়ির মতো

ওয়েপন-ক্যারিয়ারের গায়ে বাঁধা শিকল। তার ইঞ্জিনটাকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই রথের উপর শায়িত গান্ধীজীর মরদেহ। দুই পাশে উপবিষ্ট নেহরু ও পাটেল। পশ্চাতে জনসমুদ্র। রাজপথের দুইধারেও তাই। চার পাঁচ হাজার সৈনিকও পদযাত্রীদের সামিল।

"হা ভগবান!" সৌম্য কপালে হাত দেয়। "সমরবিরোধী সত্যাগ্রহের অদ্বিতীয় পথিকৃৎ যিনি তাঁর কিনা সামরিক ঠাটে শেষযাত্রা!"

"চৌধুরী", সুকুমার নিচু গলায় বলে, "দেশের রাজাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেইভাবেই করা হচ্ছে গান্ধী মহারাজকেও। দশ লক্ষ লোকের জনতাকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাড়ে পাঁচ মাইল মার্চ করিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কি আর কারো আছে?"

"দাদা", মিলি ফিস ফিস করে বলে, "এই সামরিক ব্যবস্থা হচ্ছে অহিংসার প্রতি হিংসার নজরানা। হিংসা যেন বলতে চায়, অহিংসা, তুমিই শ্রেষ্ঠ। তোমার কাছে আমি মাথা নত করি।" সৌম্যর কাছে মিলিও মাথা নোয়ায়।

"বোন", সৌম্য বলে ধরা গলায়, "মৃত্যুরও সান্ত্বনা আছে। কিন্তু স্বজন-পরিত্যক্ততার সান্ত্বনা কোথায়? বাপুকে আজ সাড়ম্বরে ও ষোড়শ উপাচারে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র সান্ত্বনা ইংরেজরাও আমাদের সহযাত্রী। আমরা উপেক্ষিত শিষ্যরা যদি ডাক পেতুম তো বাপুর চারপাইতে পালা করে কাঁধ দিয়ে আমরাই সাড়ে পাঁচ মাইল রাম নাম করে বয়ে নিয়ে যেতে পারতুম।"

যমুনাতীরে রাজঘাটে অপেক্ষা করছিল আরো দশ লক্ষ লোকের জনতা। চিতায় অগ্নিসংযোগের সময় বিউগলে রণিত হয় 'লাস্ট মার্চ'। ধ্বনিত হয় 'লাস্ট স্যালিউট', কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ। অভ্র ভেদ করে বিশ লক্ষ কণ্ঠের সমবেত আকিঞ্চন "মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়েঁ।" চিতার পাশে চলতে থাকে বৈদিক মন্ত্রপাঠ।

"Greater love hath no man than this, that he lay down his life for his friends", বলে ওঠেন পার্শ্ববর্তিনী এক মার্কিন মহিলা।

"তোমার একটু অংশ আমাকে দিয়ে যাও, বাপু। আমিও যেন তোমার মতো বাঁচতে ও তোমার মতো মরতে পারি।" সৌম্য প্রার্থনা করে অস্ফুট স্বরে।

॥ চতুর্থ পর্ব সমাপ্ত ॥